ছন্দহারা

(দ্বিতীয় পর্ব)

চার্ব্বাক

দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী
১ বি কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা—১২

প্রকাশক—সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ
দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী
১ বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৭

মূল্য—চার টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
৫৯সি, বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মা—তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে শরৎ চাটুয্যের উপন্যাস প'ড়তে এই খবরটা ঠাকুরমার কানে পৌঁছে দিই—ফলে, অনাবশ্যক কেরোসিন পোড়ানোর খরচ ঠাকুরমা বন্ধ ক'রে দেন। হায়—তখন কি জানতুম, তোমার মত বাংলার কুল-বধূরা লুকিয়ে লুকিয়ে আমার বই প'ড়লে খুশী হব।

দুঃখীর পাশে দাঁড়াতে তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে, তাই তোমার হাত দিয়ে বাংলা দেশের বঞ্চিত ভাই-বোনদের 'ছন্দহারা'র দ্বিতীয় পর্ব তুলে দিলাম—

"একটী অখণ্ড জীবনের ইতিহাস রচনা করা যায় না। একটি জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলি একত্র জোড়া লাগাইয়া যে জীবনী রচনা করা যায় তাহাতে দেখা যায় যাহার জীবন রচনা করিলাম তাহাতে এবং সেই ব্যক্তিতে অনেক তফাৎ। খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলী লইয়াই ত জীবন, অথচ তাহার একত্র সমাবেশ কি অদ্ভূত ভাবেই না পৃথক, এমন কি, বিভিন্ন রূপেই না প্রতীয়মান হয়! আমার ধারণা লেখনীর সাহায্যে পৃথিবীর সব কিছুকেই রূপ দেওয়া যায়, যায়না কেবল মানব চরিত্রের। আজ পর্যন্ত যত মানব চরিত্র রচিত হইয়াছে সেই সকল ব্যক্তি লিখিত রচনার নায়ক নহে। এমন কী সম্পূর্ণ অন্য লোক হইতেও পারে। যে সব ঘটনাবলীর সমাবেশে আজ আমি আমার জীবন কাহিনী অঙ্কিত করিব তাহার নায়ক হয়ত আমি নাও হইতে পারি তাই বলিয়া এই ঘটনাও মিথ্যা নহে এবং এই জীবনীও মিথ্যা নহে।—"

ছন্দহারা প্রথম পর্ব—চার্বাক

ডাঃ অতীন্দ্র নাথ বসু. এম এ, পি আর এস, পি এইচ ডি

লিখিত ভূমিকা

ছন্দহারার প্রথম খণ্ড পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম—যেখানে সরল ও সংযত আবেগের মধ্য দিয়ে ছন্দময় হয়ে উঠেছে হারানো ছন্দের কাহিনী। তাই দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লেখার অনুরোধ এড়ানো গেল না। উপন্যাস বা এ ধরণের আধা-উপন্যাস নিজের পরিচয় নিয়েই আসে—ভূমিকা লিখে তাকে পরিচিত করবার দরকার হয় না—এবং সে রেওয়াজও নেই। তবে চার্বাক বা আমি কেউই কথাশিল্পী নই বলেই বোধ হয় প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করতে সাহস করছি। কথা যথেষ্ট সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে না পারলে হয়ত তা শিল্পের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় না; কিন্তু এলোমেলো কথার কাহিনীও যে একটা উজ্জ্বল জীবনদৃষ্টি বা জীবনের একটা অলক্ষিত বেদনাময় রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে, তার আবেদনের পরিধি খুব বিস্তৃত না হলেও তার সাহিত্যিক মূল্য যে কম নয়, তার প্রমাণ চার্বাকের ছন্দহারা।

উপন্যাসের নায়ক মাণিক মোটেই হিরো নয়, বরং সে দুর্বলচিত্ত, একটু ভীরুও। তার দুরদৃষ্ট যে তার দুর্বল বুকে সে পুষেছে এক দুরায়ত্ত আদর্শ, আদর্শকে বহন করতে গিয়ে নিজে ভেঙে পড়েছে, আদর্শকে তিলমাত্র সার্থকতা দিতে পারে নি, কিন্তু আদর্শের অপমানও করেনি কখনো। যদি তার বুকে আরো সাহস ও বাহুতে বল থাকতো, যদি থাকতো কল্পনার সঙ্গে বাস্তব বিচারবুদ্ধি, তাহলে সে হতে পারতো বরণীয় নেতা। যদি আঘাত পেয়ে সে পিছিয়ে আসতে পারতো, ত্যাগ করতে পারতো আদর্শের নেশা তাহলে সে হতে পারতো আর পাঁচজন সাধারণ সভ্যভব্য মানুষের একজন। সে কোনটাই পারে নি—তাই মূল্য দিয়েছে জীবনের ছন্দ হারিয়ে!

বাংলার মধ্যবিত্ত ঘরে এই শতকার্ধের অঘটনবহুল জীবনাবর্তে এমন কতো ট্রাজডি ঘটে গেছে কে তার হিসেব রাখে আর কোন দরদী শিল্পরসিকই বা তাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন? 'খোকার বাবা'র বিসর্পিত কালো ছায়ার আড়ালে কতো আলোর স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেলো। স্থিতস্বার্থের কুটিল চক্রান্তে কতো সাধের সাধনার অকালসমাধি হোল, ইতিহাস তার কথা লিখবে কি না জানি না—দুঃখ হয় এমন শিল্পীও একজন আমাদের নেই যিনি এই ব্যথার গুম্‌রানি কান পেতে শুনেছেন।

চার্বাকের সাহিত্য-প্রতিভার বিচার করতে আমি বসি নি। হতে পারে যে উপন্যাসের টেক্‌নিকের দিক দিয়ে কিছু গলদ রয়ে গেছে, হয়ত কথায় ভাষাগত দুর্বলতা বা রসের দৈন্য আছে কোথাও কোথাও। কিন্তু আর কোথায় পেয়েছি গোবরা, মাণিক, বৌদি, খোকার বাবা এদের মত বাস্তব চরিত্র? সত্যের এমন রূঢ় নির্দয় রূপ কে উন্মোচন করেছে? দারিদ্র্য, রোগ, মৃত্যু, প্রিয়বিচ্ছেদ সৈনিকের কাছে এসব আঘাত কিছুই নয় যদি সে তার আদর্শকে সঞ্জীবিত রাখতে পারে। সেই রূপরসসিক্ত আদর্শ ছন্দময় করে রাখে জীবনকে। কিন্তু যখন আদর্শ ছলনার আবরণে ম্রিয়মান হয়ে যায় তখন থাকে সামনে অন্ধকার আর পিছনে বঞ্চনা। জীবন ছন্দ হারিয়ে ফেলে—দহনান্তে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিপ্লবীর পরিবর্তে দেখতে পাই বিফল ভস্মাবশেষ।

এই মর্মান্তিক আত্মাহুতির নীরব ক্রন্দন এতদিন ভাষা খুঁজে ফিরেছে। ছন্দহারার এ বিলাপ দেশজননীর বিলাপ। যদি পাঠকের অন্তরে এ কান্না প্রবেশ না করে তবে দুর্ভাগ্য চার্বাকের নয়, আমাদের সকলের,—দেশের, জাতির।

—অতীন্দ্রনাথ বসু

২৭ শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৯, ৬, ৫০

ং বাজারে ফিরি করি। অর্থাৎ তিনি আনন্দবাজারের আমি হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডের হকার।

।ককে একটা উপদেশ দেওয়ার ছিল যে, শান্তিনিকেতনটা 'ছন্দহা' নয় বাংলা দেশও নয় এমন কী বীরভূমও নয় এই কথা মনে করা হয়। দি তিনি কলম ধরেন তবে আমার মত উঁচুদরের সাহিত্যিক তিনি লিখতে তে হতেও পারেন।

লেখা সাহিত্যেক হবার জন্য যাঁরা প্রেরণা দিয়েছেন (ডাঃ বসুর নাম হ' ার করছি না কারন তিনি মুখবন্ধে গৌরচন্দ্রিকা করেছেন। রাজনৈতিক স দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ও আমি ভিন্ন গোত্রীয় অর্থাৎ তিনি (অগ্রগামী (Forward) এবং আমি স্থবির (Block) তবু মিল আছে এক জায়গায় সেটা হচ্ছে মানুষের বেদনার ভূমিতে। এখানে আমরা কেউ বেঁটে কেউ লম্বা নই) তাদের আমার কৃতজ্ঞতা জানান কর্তব্য বলে মনে করছি। তাই বারণপুর আগমনী সাহিত্য সঙ্ঘের আমার বন্ধু অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তার বন্ধুদের আমি স্মরণ করছি। রাজনীতির উষর মরুভূমি হতে তাঁরাই আমাকে পথ দেখিয়ে দেয় সাহিত্যের মরুউদ্যানে।

এরপর আমাকে যিনি সাহায্য করেছেন তিনি হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়। আমার বই প'ড়ে তিনি খুশী হ'য়ে ক্ষান্ত হন নাই দ্বিতীয় পর্ব যন্ত্রস্থ করবার জন্য স্বেচ্ছায় আংশিক আর্থিক সাহায্য করেছেন। তার সাহায্য না পেলে বই বের হতে আরও বাধা পেতে হ'ত।

এরপর আমার বন্ধু জগদীশ পাণ্ডে যে ভাবে সাহায্য করেছেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ অর্থাৎ দুইবারই তিনি বই ছাপাতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং আর্থিক সাহায্য করবেন ব'লে সে কথা রাখতে পারেন নাই। তাতে

আমি চ'টে যাওয়ায় তিনি হেসে জবাব দেন। "হামরা বেকুবিসে তোমরা ভালাই তো গিয়া—হাম ধোকা নাহি দেনে সে কভি তোম কেতাব ছাপাতা।" খাঁটি কথা বলেছেন। তাই তাকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি।

আর একজনের নাম করে এবং আর অনেকের নাম না করে (যাদের নিকট সাহায্য পেয়েছি) ঋণ স্বীকার শেষ করছি—ইনি হ'লেন আমার পরম বন্ধু জনাব আবদুর রহিম খাঁ। আমাকে হিন্দু মনে ক'রে তিনি বর্তমানে পাকিস্থানে গা ঢাকা দিয়েছেন। প্রথম পর্ব ছাপাবার সময় তার পকেট মেরে খানিকটা কার্য সিদ্ধি করি। দ্বিতীয় পর্বে অনুরূপভাবে সাহায্য করেছেন কালিকা টাইপ ফাউণ্ড্রীর শ্রীসুশীল চক্রবর্তী মহাশায়। পকেট সম্বন্ধে তিনি বরাবরই সচেতন। বাধ্য হয়ে প্রকাশ্যে সাহায্য চাইতে হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ এক প্রেসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে শুধু ক্ষান্ত হলেন না তাদিকে বুঝিয়ে দিলেন ধারে বই ছাপার মত লাভজনক কারবার আর নাই। এই লাভজনক কারবার পাছে হাত ছাড়া হ'য়ে যায় তাই আমার ছাপাখানার বন্ধুরা (যাদের নাম অন্যত্র পাবেন) একমাসের মধ্যে বই বার করে দিলেন।

এমনি করে সকলের তিল তিল সাহায্যে আমি আজ তিলোত্তমা।

কে কি ব'লেছেন প্রথম পর্ব প'ড়ে

সবাই বাহাবা দিয়েছেন। প্রবাসীতে রস-সাহিত্যিক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব'লেছেন। "চার্বাক ঋণ ক'রে ঘি খায় এ কথা জানা কিন্তু আমাদের চার্বাক ঋণ করে,—ঘি খায় অন্যে।" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানেন ব'লেই একথা লিখেছেন বোধ হয়। কেন যে তিনি একথা লিখলেন না যে অন্যে শুধু ঘি খায় না এমন কী ভাঁড়টী পর্যন্ত ফেরৎ না দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, বসুমতি,

দেশ এরাও প্রশংসা ক'রেছেন। না ক'রে উপায় নাই কারণ আমার বইয়ের মতো এত ভাল বই তাঁরা পড়েন নাই। যুগান্তর ও আনন্দবাজারের সার্টিফিকেট অন্যত্র দিচ্ছি। কারণ এ দুটো বাঘা কাগজ পূজো না দিলে চটে যেতে পারেন। আর অনেকের দিতে পারলুম না কারণ ফর্মার মাপের বহর ক'মে আসছে। তাই তাদের নাম উল্লেখ করলুম মাত্র।

আনন্দবাজার সমালোচনা ক'রেছেন—এই গ্রন্থের নায়ক লেখক নিজে। দারুণ কথা। দোহাই বলছি একদম মিথ্যে কথা তাঁরা বোধ হয় জানেন না, যে আমি পরিবার ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি।

শান্তিনিকেতনের জনৈক অধ্যাপক বন্ধু বই প'ড়ে ব'লেছেন— "প্রথম পর্বের এতগুলি মেয়ে নিয়ে দ্বিতীয় পর্বে সামলাবেন কী ক'রে? তাঁকে জানাচ্ছি, মেয়েদের সামলাতে পারলে ছন্দহারা লিখি—? তাদিকে পথে বসিয়ে দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত ক'রেছি আর পাঁচজন বাংলা দেশের ছেলের মত।

আবার ডাঃ বসুকে স্মরণ করছি তিনি প্রথম পর্বে সমালোচনা ক'রেছেন। 'মাণিক একের পর একজনকে ভালবাসছে কিন্তু কোথাও দানা বাঁধছে না মাণিক যেন ব্রহ্মচারীর বাড়া।" মাণিক সেদিকে কাপুরুষ হ'তে পারে, তবে চার্বাকের ধারণা ব্রহ্মচর্য বজায় রেখেও একাধিক মেয়েকে ভালবাসা যায়।

অনেকে প্রশ্ন ক'রেছেন (আনন্দবাজারে খোলাখুলি লিখেছেন) চার্বাকই মাণিক। আরে ছিঃ ছিঃ সত্যিকথা নিয়ে কেউ উপন্যাস লেখে—তবে উপন্যাসে সত্যিকথা থাকে।

সর্বসত্ত্ব দান

এই গ্রন্থের সর্বসত্ব আমায় একমাত্র প্রণয়িনী শ্রীমতী রেণুকা ঘোষকে দিলুম—ভবিষ্যতে তিনি এ দিয়ে উনোন ধরাতে পারবেন। ইতি—

'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে,

১৩৫৭ সাল চার্বাক।

১৮।এ রাজা লেন, কলিকাতা—৯

১

দীর্ঘ ছয় মাস পরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে বাহির হইলাম। ইংরাজীতে একটী প্রবচন আছে মানুষ ভাবে এক বিধি ঘটায় অন্য। সত্য কথা বলিতে গেলে আমি বৌদির উপর সেদিন যতই না রাগ করিয়া থাকি তাই বলিয়া জেল যাইবার মত মহৎ কাজ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া পথে বাহির হই নাই। বরং সেদিন মনের নিভৃত কোণে এই কথাই উঁকি মারিতেছিল যে বৌদির কাছে ফিরিয়া যাইয়া আমি যে মস্তবড় একটা ইন্দ্রজয়ী পুরুষ সেই কথাই জাহির করিয়া তাহাকে কাবু করিয়া আরও আসন জারী করিয়া বসিব। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তাহা নহে তাই সেদিন বৌদির কাছে না ফিরিয়া সোজা জেলে যাইতে হইয়াছিল। জেলে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম 'এ বড় বিষম ঠাঁই।' বৌদির কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। মনে হইল অতখানি বাড়াবাড়ি না করিয়া চোখ মুজিয়া বৌদির ব্যবহার বরদাস্ত করিলে আর যাই হোক জেলের প্রহরী বাবাজীদের সাদর সম্ভাষণ হইতে রেহাই পাইতাম। উত্তরকালে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘুরিয়াছি কত বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের সহিত মিশিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই—কিন্তু এমন বাছাই করা কর্কশভাষী জেলওয়ার্ডার সরকার বাহাদুর আমদানী করে কোথা হইতে বুঝিতে পারি না। গয়া বা গাজীয়াবাদের লোক জেলের বা পুলিশের কাজ লইলে কিরূপ দ্বিতীয় যমের বাহন রূপে রূপান্তরিত হয় তাহা যে জেল না গিয়াছে সে কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না।

আমি ছাড়া যে কয়জন যুবক জেলে গিয়াছিলাম তাহারা দেশ স্বাধীন করিবার জন্য পূর্ব হইতেই আদাজল খাইয়া লাগিয়াছে এ কথা তাহারা আমাকে জানাইয়া দিল। অর্থাৎ গান্ধীয়াবাদী গুঁতা যে এই কাজের ভাগ্যলিপি এ তাহাদের জানাই আছে। আমি কিন্তু এতখানির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, দেশ স্বাধীনই হোক আর পরাধীনই থাকুক এ লইয়া যে মাথা ঘামাইবার কিছু আছে তাহা এতদিন মনেও স্থান দিই নাই। আর আজ যে সেই দেশ স্বাধীন করিবার জন্য একবারে জেলে হাজির হইতে হইবে সে কথা স্বপ্নেও ভাবা ছিল না। তাই লপসীর থালা কোলে করিয়া যখন হাপুস নয়নে এই অভূতপূর্ব এবং অনাস্বাদিত খাদ্য-বস্তু সম্বন্ধে কী করা যায় ভাবিতেছিলাম তখন হঠাৎ কানে আসিল—"এই লৌণ্ডে খাতা নাই কেঁও"। আরে 'খাতা যে নাই কেঁও' তাহা কাহাকে বুঝাইব। এত আর বৌদির মিষ্টি অনুযোগ নয় "সত্যিই কী দিয়ে খাবে ঠাকুরপো, একি আর মানুষে খায়, আমরা গরীব বলে কোনরূপে চালিয়ে যাই।" এ একবারে দাণ্ডাই অনুরোধ—অর্থাৎ জেল কোডে লেখা আছে না খেলে রুলের গুঁতো দিয়েও খাওয়াতে হবে। মানে সরকারি অন্নসত্রে উপবাসের স্থান নাই। যাক্ দীর্ঘ ছয়মাস ধরিয়া বহু প্রকারের ঝকমারির মধ্যে কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া যখন জেল গেটের বাহিরে আসিলাম তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম বাবা ভারতবর্ষ তুমি স্বাধীনই হও আর পরাধীনই থাক আমি আর এই সব ঝকমারিতে নাই।

সকলের বাড়ী হইতে কেহ না কেহ জেল গেটে অপেক্ষা করিতেছিল, কেবল আমার জন্য কেহ অপেক্ষা করিবার ছিল না। জেল হইতে বাহির হইতেই মাল্য-চন্দনে এবং নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য-বস্তুতে আমাদের আপ্যায়িত করা হইল। আমাদের তখন মুখে চোখে এমন

একটা ভাব যেন হতভাগিনী ভারত-জননীর আমরাই উদ্ধার করিবার একমাত্র কাণ্ডারী। মাল্যদান এবং ভোজ্য-বস্তুর পরিবেশনের ভার লইয়াছিল সেদিনের সেই বিদ্যুতময়ী বালিকা, যাহার প্রেরণায় থামক। না বুঝিয়া না শুঝিয়া এমন একটা যমপুরিতে পা বাড়াইয়াছিলাম।

সকলে যে যার আত্মীয়ের সহিত বাড়ী চলিয়া গেল। পড়িয়া রহিলাম আমি, আর নমিতার পিতৃদেব শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার, সেদিনের সেই বিরাট পুরুষ। নমিতা আগাইয়া আসিয়া বলিল "আপনাকে বুঝি কেউ নিতে আসে নি? বোধ হয় খবর দেন নি। তা আমাদের গাড়ীতে উঠুন এখন, আমাদের ওখানেই চলুন; তারপর আপনাকে বাড়ী পৌছে দেব। এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া এক প্রকার জোর করিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া লইল। গাড়ী চলিতে সুরু করিল অজয়বাবু বলিলেন—'বুঝলি নমি—মণী খুব ভাল ছেলে অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু জেলের অত কষ্ট তা কোন দিনই অভিযোগ করতে শুনি নি।

নমিতা সহাস্যে বলিল—আপনার নাম মণীবাবু বুঝি? তা জেলে আপনার কোন কষ্ট হয় নাই? অম্লানবদনে উত্তর করিলাম জেলে কষ্ট আবার কী, কোন কষ্টই আমার হয় নাই" এই বলিয়া নমিতার মুখের দিকে একবার চাহিলাম, দেখিলাম একটী আনন্দোজ্জল মুখ আমার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ী এক প্রাসাদোপম বাড়ীর দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর গেটে পিতলের পাতে ইংরাজীতে লেখা আছে—এ সরকার, বার এ্যাট ল। গেটের সামনে প্রায় শতাধিক পুরুষ ও মহিলা সুসজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। কানাইদার সহিত যখন গোয়াবাগানের বস্তিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেদিন মনে হইয়াছিল এই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে কাহারা বাস করে? আজ সেই সকল অট্টালিকার অধিবাসীদের দেখিয়া চক্ষুতে

ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল। কী তাহাদের সাজসজ্জা, কী তাহাদের বেশবিন্যাস! অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত মোটর হইতে অবতরণ করিলাম। সকলেই অজয় বাবুকে লইয়া পড়িল। তাঁহার ত্যাগ এবং দুঃখ ববণের আদর্শ দেশকে যে অনেকখানি আগাইয়া লইয়া গিয়াছে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইল। আমি যে কোন্ কর্মে এখানে আসিয়াছি বা অজয় বাবুর মত দেশকে খানিকটা আগাইয়া দিয়া থাকিতে পারি এ লইয়া কেহ কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল না। আমি বিমূঢ় চিত্তে দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় নমিতা ডাকিল—কী আপনি দাঁড়িয়ে কেন? আসুন আমার সঙ্গে। নমিতার পিছু পিছু চলিলাম। গেট পার হইতেই আমার মনে হইল আমি যেন মর্তলোকে আর নাই স্বর্গের নন্দন কাননে প্রবেশ করিয়াছি। পুষ্পোদ্যান, ফোয়ারা, টেনিসলন, লতাকুঞ্জ এই সব মিলিয়া আমাকে যেন বিভ্রান্ত করিয়া দিল। পার্কে বা ইডেন গার্ডেনে যাহা দেখিয়াছি তাহা যে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিতে পারে বিশেষ করিয়া যে ভদ্রলোক আমার কারাগারের সাথী, তিনিই ইহার মালিক এ কথা যেন বিশ্বাস করা যায় না। সেই বিরাট প্রাঙ্গন পার হইয়া একটি প্রশস্ত হল ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি কত প্রকারের বসিবার আসনে সজ্জিত যে আমি ইতিপূর্বে তাহার কোনটির সহিত পরিচিত নই। সেই হলঘরের একপাশে এক শ্বেত পাথরের সিড়ি বাঁকিয়া বাঁকিয়া উপরে উঠিয়াছে। নমিতা ঐ ঘর পার হইয়া সিড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল। আমার উপরে ওঠা ঠিক হইবে কি না ভাবিতেছি এমন সময় নমিতা বলিল—দাঁড়ালেন কেন উপরে চলুন। নমিতা, মণিকা বা বৌদি নয় তাহা অল্পক্ষণেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম তাই তাহাকে কোথায় যাইতে হইবে বা কেন যাইতে হইবে এইরূপ ছোটখাট প্রশ্ন পর্যন্ত করিতে সাহস করি নাই। নমিতার

আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে তাহাকে অনুসরণ করিলাম। এতক্ষণ নমিতার সহিত আসিলেও ভাল করিয়া তাহাকে দেখি নাই। লজ্জা, সম্ভ্রম এবং ভয় সব কিছু মিশিয়া মনটা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহার ইঙ্গিতে এই স্বর্গ পুরীতে প্রবেশধিকার পাইয়াছি সেই স্বর্গের দেবীকে ভাল করিয়া দেখিবার সাহস পর্যন্ত হয় নাই। বাঁকা সিড়ির মোড় ঘুরিতেই এক বিরাট দর্পণে নমিতার প্রতিফলিত মূর্তি দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলাম। কত মনোহর করিয়াই না নমিতা সাজিয়াছে। মণিকারাও সাধারণতঃ একটু ভাল করিয়া বেশভূষা করে কিন্তু নমিতার সহিত তাহার কোন তুলনাই হয় না। মানুষ যে এমন চমৎকার করিয়া সাজিতে পারে এ আমার ধারণার অতীত। নমিতা কতখানি সুন্দর সে দেখিয়ার অবকাশ আমার সেদিন হয় নাই তাহার মনোহারী বেশভূষা আমাকে হতবাক্ করিয়া দিল।

উপরের ঘরে প্রবেশ করিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। একি! নমিতা আমাকে যাদুঘরে লইয়া আসিল নাকি? নমিতা আমাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিল "আবার দাঁড়ালেন যে?" ও—ঐ বাঘটা? ওটা বাবা হাজারিবাগ জঙ্গলে শিকার করেছিলেন। ঐ চিতেটা—ওটা জলপাইগুড়ির এক চায়ের বাগানে। এই বনশূয়ার এটার উৎপাতে আমাদের চরণপুরের প্রজারা অস্থির হয়েছিল। বাবা যেয়ে এর উৎপাত হতে তাদের বাঁচান। বাঘের ঘর পার হইয়া যে ঘরে পড়িলাম তাহাতে বুদ্ধ, নটরাজ প্রভৃতি কত প্রকার মূর্তিতে যে সজ্জিত তাহার যেন ঠিকানা নাই। তাহার পরের ঘরে কত প্রকারের তৈলচিত্র কত সুন্দর ভাবেই না সাজান আছে দেখিলে নয়ন মন স্নিগ্ধ হইয়া যায়। আমার অবশ্য সেদিন নয়ন মন স্নিগ্ধ হওয়া দূরের কথা যত দেখিতে থাকি তত মন যেন আড়ষ্ট হইয়া একেবারে জমিয়া যাইবার জোগাড়

হইয়াছিল। ঘরের মধ্যে এত রকমের জিনিষ সাজাইবার কী প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা কিছুতেই আমার মাথায় অসিল না। মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলাম সাধারণ লোকের সহিত ইহাদের তুলনা করা বাতুলতা মাত্র। ইহারা স্বর্গের জীব কিনা জানিনা তবে হলফ করিয়া বলা যায় ইহারা মর্তের মানব নহে।

ভিখন সর্দার বা রাধারাণীর ইংরাজদের উপর চটিবার যথেষ্ট কারণ থাকিতে পারে কিন্তু অজয় বাবু কেন যে ইংরাজ সরকারের উপর চটিয়া এমন আরাম ছাড়িয়া আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে পচিতে গিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সন্দেহ হইল ভদ্রলোকের মাথা খারাপ নাকি? আরও দুইখানি ঐরূপ ঘর পার হইয়া অপেক্ষাকৃত একটি ছোট ঘরে প্রবেশ করিলাম। এইটী নমিতার বসিবার ঘর। এতদিনের অভিজ্ঞতা হইতে এইটুকু জানি যে একটী মানুষের জন্য বড় জোর একটী ঘর মিলিতে পাবে, কানাইদার ঘরে আসিয়া সে কথাও ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিলাম। আর এখানে কি না এতগুলি ফালতু জিনিষে ঘর ভর্তি রাখিয়া নমিতার মত একটি বলিকার জন্য বসিবার ঘর! নমিতা আমাকে বসিতে বলিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। আমি একটী সোফার উপর আড়ষ্ট হইয়া কোনরূপে বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে নমিতা আসিয়া আমাকে স্নান করিতে বলিয়া চলিয়া গেল। স্নানের ঘর দেখাইবার জন্য একজন পরিচারক নমিতার সহিত আসিয়াছিল। আমি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গেলাম, পরিচারক আমাকে স্নানের ঘর দেখাইয়া দিল। একি ব্যাপার! স্নান করিবাব জন্য এত কাণ্ডকারখানা। এত সুন্দর ঘর! আমাদের দেবালয় যে ইহাপেক্ষা অনেকাংশে হীন। ধুতি পাঞ্জাবী গেঞ্জি সব ঠিক করিয়া সাজান আছে—পরিচারকের কথায় বুঝিলাম আমার পরিধানের জন্য ঐগুলি রাখা হইয়াছে।

জীবনে বহুবিধ সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছি কিন্তু এমন সমস্যার মধ্যে কখনও পড়ি নাই। রাজসাহীর বাসায় সামান্য একটু দেওয়াল তুলিয়া কুয়ার পাশে এক স্নানের ঘর ছিল। বাথরুম বলিতে তাহাই জানি। তাও সে বাথরুমে কোনদিন স্নান করিবার প্রয়োজন হয় নাই। আর দেখিয়াছি বস্তিবাসীর স্নান, সামান্য জলের জন্য কী কাড়াকাড়ি, স্নান করিবার সময় শালীনতা বলিয়া কোন বালাই নাই বা রক্ষা করা সম্ভবও নয়। আর এ কি! প্রকাণ্ড একটা ঘর আগাগোড়া চীনা মাটীর টাইল দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাথটবের মাথায় ঝরণা আছে। সুগন্ধি তেলে, সাবানে তোয়ালে দর্পনে স্নানের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষে ঘরটী চমৎকার করিয়া সাজান। এইসব দেখিয়া আমি এমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যদি পালাইবার অন্য কোন পথ থাকিত তবে সোজা বাথরুম হইতে পলাইয়া যাইতাম।

স্নান সারিয়া যথাস্থানে আসিয়া বসিলাম। নমিতা আসিয়া চা খাইবার জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল। চায়ের টেবিলে দেখিলাম অজয়বাবু এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা বসিয়া আছেন। আমি আসিতেই সকলে কৌতুহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "মিঃ সরকার এই ছেলেটী বুঝি আপনার সহিত জেলে গেছল—যার কথা এতক্ষণ আপনি বলছিলেন?" অজয়বাবু উত্তর করিলেন হ্যাঁ, বড় চমৎকার ছেলে ভারি মিষ্টী স্বভাব, হাসিমুখে জেল খেটেছে। কী আর বয়েস, আমাদের বেবির চেয়ে অনেক ছোট। নমিতাকে বেবি বলিয়া ডাকা হয়। চায়ের টেবিলে কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম মিষ্টার সরকার তাহার বিপুল সম্পত্তির এবং ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা দেশের কাজে ব্যয় করিবেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সকলেই মিষ্টার সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। মিষ্টার সরকারের সম্পত্তি কত এবং ইহার আয়-ই বা কত তাহা আমার জানা

না থাকিলেও অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার ঐশ্বর্যের পরিমাণ যেটুকু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়িতে হয়ত সব সম্পত্তি নাও লাগিতে পারে।

ইংরাজের রাজত্বে সূর্যাস্ত হয় না এ কথা ভূগোলে বা ইতিহাসে পড়িয়াছি। পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণা আমার একটী দুই দিক চেপ্টা কমলা লেবুর মত। যখনই পৃথিবীর কথা চিন্তা করি তখনই পৃথিবীটা একটা দুইদিক চেপ্টা কমলালেবুতে পর্যবসিত হয়। অতএব এ হেন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ইংরাজ বাহাদুরকে কাবু করিতে অজয়বাবুর বিপুল সম্পত্তির সবটা যে ব্যয় হইবে না তাহা আমি অনায়াসে ধরিয়া লইলাম। ইংরাজের সহিত আমার বিশেষ কোন পরিচয় নাই তাই তাহাদের উপর আমার তেমন রাগও নাই। তাহারা যে কেবল বুদ্ধির জোরে এই সসগরা ধরণীর অধীশ্বর হইয়াছে নতুবা পলাশীর যুদ্ধে সত্যকারের লড়াই করিতে হইলে বাছাধন ক্লাইভকে আর মা বলিতে হইত না এ কথা ইতিহাসের অ আ ক খ যাহারা জানে তাহাদেরও অবিদিত নাই। ইংরাজের বুদ্ধিও যে খুব আছে তাহা নহে—অর্থাৎ আমাদের বাঙ্গালির নিকট বুদ্ধি ধার করিয়া ইংরাজ নাকি এত বড় হইয়াছে এ কথা বহুবার বহু লোকের মুখে শুনিয়াছি। আলীপুর জেলের সুপরিটেণ্ডেণ্ট সাহেব ছিলেন। তিনি প্রায়ই আমাদের জেল পরিদর্শন করিতে আসিতেন। জেল কর্তাদের মধ্যে কেবল তাহাকেই নিরীহ দেখিয়াছি বাকী সকলেরই দোর্দণ্ড প্রতাপ। এ হেন নিরীহ জীবদের উপর কেন যে আমাদের দেশের লোক এত চটিয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। অবশ্যই কিছু বড় রকমের কারণ আছে মনে করিয়া এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য না করিয়া বিনা দ্বিধায় ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে মনস্থির করিয়াছিলাম।

চা খাওয়া হইয়া গেল। নমিতা আমাকে বলিল "চলুন আমাদের আশ্রমে আজ বাবাকে সম্বর্দ্ধনা জানান হবে তাহার কতদূর কী ব্যবস্থা হ'ল দেখে আসিগে। সম্বর্দ্ধনা শেষে আপনাকে আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসব।

নমিতা ও আমি দমদমে এক প্রকাণ্ড বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। মস্ত বড় বাগানে কত প্রকারের ফলের গাছ; বাগানের মধ্যে তিনটী পুষ্করিণী, একটি চমৎকার বাংলার মত বাড়ীর, তিনদিকে অবস্থিত। আমরা বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাংলাটীকে সংস্কার করিয়া অনেক অদল বদল করা হইয়াছে। নমিতা আমাকে বাংলার একটী কক্ষে লইয়া গেল। দেখিলাম সেই কক্ষে এক সৌম্য মূর্তি ভদ্রলোক চরকা কাটিতেছেন। নমিতা পরিচয় করাইয়া দিল—ইনি হইলেন ডাঃ বসু, এম আর সি পি। পূর্বে সিভিল সার্জেন ছিলেন ইংরাজ সরকারের চাকুরী ছাড়িয়া দেশের কাজে যোগ দিয়াছেন। দিন দশেক হইল জেল হইতে বাহির হইয়াছেন। ইনি হইলেন আশ্রমের অধ্যক্ষ। ডাক্তার বসু নমিতার নিকট আমার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—আপনি যে দেশের জন্য লেখাপড়া ছাড়িয়া কারাবরণ পর্যন্ত করিয়াছেন ইহার চেয়ে আর আনন্দের কী আছে, আপনার মত ছাত্র-সমাজ ও যুব-সমাজ দেশের আশা ও ভরসাস্থল। আপনার সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম। মা নমিতা ইহাকে আশ্রমের অন্যান্য বিভাগ দেখাইয়া দাও। আসুন নমস্কার, মধ্যে মধ্যে আসবেন—বড় খুশী হব।" প্রতিনমস্কার করিয়া পাশের ঘরে গেলাম, এখানে শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার দুইজন আশ্রম বালক লইয়া কাঠের ঘানি নির্মাণ কার্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন। নমিতা আমার পরিচয় করাইয়া দিল। শ্রীযুক্ত দাসের

তখনও বিলিতি অভ্যাস পুরোপুরি যায় নাই তাই তিনি আমার হাত ধরিয়া এক ঝাঁকুনি দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর ইণ্ডাষ্ট্রি কিরূপ সভ্যতাকে গ্রাস করিতেছে তাহার এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া এবং কুটীর শিল্পই একমাত্র এই সভ্যতার সংকট হইতে ত্রাণ করিতে পারে তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত দাসের ঘানিতত্ত্ব শুনিয়া পাশের ঘরে গেলাম। সেখানে দেখি এক এম ডি ডাক্তার দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। তিনিও এক বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দিলেন বিলাতি ভেষজ কিরূপ ভারতীয় ব্যক্তির স্বাস্থ্য হানিকর। তাছাড়া বিলাতি ঔষধ কিনিতে আমাদের কত টাকা বিলাতে চালিয়া যায় তাহার এক হিসাব ফিরিস্তি দাখিল করিলেন। তারপর আমরা একটী হলঘরে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম আমার বয়সের বা কিছু অধিকবয়স্ক কয়েকজন ছেলেমেয়ে দাল বাঁটিতেছে। দাল বাঁটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় নমিতা বলিল "এই দাল বাঁটিয়া বড়ি দেওয়া হইবে। আশ্রমের সব কাজ হাতে কলমে শিখিতে হয়। আশ্রমের খরচ বাদে উদ্ধৃত বড়ি বাজারে পাঠান হয়। যদিও নমিতায় বাবা আশ্রমের সব ব্যয়ই বহন করেন তথাপি আশ্রমের অধ্যক্ষ আশ্রমটীকে স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এত বড় বড় বিদ্বান লোকগুলির ত্যাগ ও তপস্যা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। আশ্রমে ইহাদের সহিত থাকিয়া দেশ সেবায় মন দিবার কথা ভাবিতেছিলাম। কিন্তু বড়িদেওয়া আশ্রম বালকদের দেখিয়া সে ইচ্ছা মনেই রাখিলাম। কারণ তাহাদের বিদ্যা আমারই মত, সদ্য কলেজ বা স্কুল ছাড়িয়া বড়ি দেওয়া রূপ দেশ সেবার কাজে লাগিয়া গিয়াছে। আমি যদি আশ্রমে স্থান লই তবে আমার ভাগ্যেও যে এক জোড়া শিল নোড়া জুটিবে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিলাম। একটি অশ্রমকে স্বাবলম্বী করিতে হইলে

ঠিক বড়ি দিয়া বা সরিষার তৈল বেচিয়া করা যায় কিনা জানিনা। এত বড় বড় পণ্ডিতরা বড় বড় চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া বড়ির আয়ের উপর আশ্রম চলিতে পারে এরূপ অবাস্তব চিন্তাকরিবার মত ততখানি কাণ্ডজ্ঞান হীন নিশ্চয়ই তাহারা নহেন। তবে এমন অসম্ভব কাজে ইহারা মনোনিবেশ করিয়াছেন কেন বুঝিতে পারিলাম না। বড়ি দিয়া ইংরাজ তাড়ান সোজা কিনা তত বড় পাকা স্বদেশী আমি তখনও হই নাই। তবে একথা সেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলাম ইংরাজ বিরোধী লোক ইহাদের চেয়ে খুব কমই চোখে পড়ে। ওয়াটাবলু লড়াই ক্ষেত্রে লড়াই করা অপেক্ষা বড়ি দেওয়া আমাকে কঠিন মনে হইয়াছিল সেদিন দ্বিধাহীন চিত্তে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে ইংবাজের বিরুদ্ধে লড়িতে হইলে এইরূপ নিষ্কাম কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তির প্রয়োজন। জেলে শুনিয়াছিলাম গান্ধীজির আহ্বানে বড় বড় ব্যক্তি বড় বড় চাকুরী ছাড়িয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে যেগে দিয়াছেন আজ চক্ষে দেখিলাম গান্ধীজিব আহবানে মানুষ কী অসম্ভব কাজেই না ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে।

সারাদিন নমিতাদের বাড়িতে কাটাইয়া বৈকালে আশ্রমের সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগ দিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নমিতা আমাকে গোয়াবাগানের নিকট কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীটে নামাইয়া দিয়া গেল। যাইবার সময় অনুরোধ করিয়া গেল আমি যেন মধ্যে মধ্যে তাহাদের বাড়ী যাই এবং পত্র দ্বারা খোঁজ খবর রাখি। নমিতা অনুযোগ করিয়া বলিল—দেশের জন্য তাহার জীবন উৎসর্গ অতএব তাহাকে যেন জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত মনে করি এবং প্রয়োজন হইলে দ্বিধাহীন চিত্তে যেন সকল কথা জানাই।

২

গান্ধী! গান্ধী! গান্ধী! কে এই মহামানব! যিনি দরিদ্রতম বালিকা রাধারাণী হইতে ধনীর দুলালী নমিতার হৃদয়ে পর্যন্ত একই

রাজনৈতিক চেতনা জাগাইয়া দিয়াছেন। নমিতা ধনীর কন্যা, আর আমি দরিদ্র আমার সহিত কী সম্পর্ক তাহার হইতে পারে? অথচ কী তাহার মধুর ব্যবহার—যতক্ষণ কাছে ছিলাম ততক্ষণ মনে হইয়াছিল যেন আপন জনের মধ্যেই রহিয়াছি নতুবা তাহাদের আড়ম্বর পূর্ণ পরিবেশে আমি এক মুহূর্ত্তেও তিষ্ঠিতে পারিতাম না। নমিতার ব্যবহারে মনে হইল তাহাদের বিপুল ঐশ্বর্যে যেন আমার দাবী আছে। যে মহামানবের প্রভাবে এমন অঘটন ব্যাপার ঘটিয়াছে তাঁহার উদ্দেশে বারংবার মাথা নত করিলাম।

কিছু না বুঝিয়া না জানিয়া নেহাৎ ভাগ্য চক্রে জেলে গিয়াছিলাম। জেলে বসিয়া প্রতিটিদিন ভাবিতাম ছাড়া পাইলে দেশ সেবা মাথায় থাকুক জেলের ত্রিসীমানায় আর পা বাড়াইব না। অথচ কী আশ্চর্য! নমিতাকে দেখিয়া সে প্রতিজ্ঞা ওলটপালট হইয়া গেল। এখন নমিতাকে খুশী করিবার জন্য আমি সহস্রবার কারাবরণ করিতে পারি।

মানুষের মন জলে আঁকা আলপনার মত। বিশেষ করিয়া আমি যে বয়সের কথা লিখিতেছি। মনে একটি জিনিষের ছাপ পড়িতে না পড়িতেই অপর জিনিষ আসিয়া দখল করিয়া বসে। মণিকাকে ভাল লাগিয়াছিল আবার বৌদিকেও ভাল লাগিয়াছিল। বৌদির সহিত পরিচয় হইয়া মণিকাকে ভুলিতে দেরী লাগে নাই। তেমনি আবার নমিতার সংস্পর্শে আসিয়া বৌদিকেও ভুলিতে বসিয়াছি। নমিতার সহিত আলাপ আর কতক্ষনের তাও যেটুকু সময় তাহার সহিত মিশিয়াছি তাহার পিতার বিপুল ঐশ্বর্য নমিতাকে আমার নিকট হইতে অনেকখানি আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। নমিতা কথা বলে কম। খুব গম্ভীর প্রকৃতির না হইলেও আদৌ হাল্কা ধরণের মেয়ে সে নয়। অল্পক্ষণ মিশিলেও বুঝিতেও দেরী হয় নাই যে অন্যান্য মেয়েদের হইতে ইহার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। নমিতা

যাহা অনুরোধ করে অপরকে তাহা আদেশের মত শোনায়। অথচ এই আদেশের মধ্যে কোথাও যেন চাপ বা বাধ্য বাধকতা নাই। নমিতার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা সহজাত আভিজাত্য আছে যে প্রথম দর্শনেই একটা সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়। কারাবরণের দিন তাহার আদেশ উপেক্ষা করি নাই আর আজও তাহার অনুরোধকে অবহেলা করিব এ কথা মনেও স্থান পায় নাই। তাই বিদায় কালে একান্ত অজ্ঞাতে কণ্ঠ হইতে বাহির হইল 'নমিতাদি যখন যা প্রয়োজন হবে নিশ্চয়ই জানাব আপনাকে।' নমিতা উচ্ছসিত হাসিতে সেখানকার আলো বাতাসে একটা ঝড় তুলিয়া উত্তর করিল "মণীবাবু দেখবেন যেন দেশের কথা ভুলবেন না।" এই বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

কানাইদার বস্তিতে ফিরিয়া আসিলাম। দীর্ঘ ছয়মাস পূর্বে বৌদির সহিত কপট কলহ করিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু আর ফিরিতে পারি নাই। যদিও ইহায় জন্য আমি দায়ী নই তবুও যেন মনে হইল আমিই অপরাধ করিয়া বৌদির নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলাম। দীর্ঘ ছয়মাস পরে কোন মুখে আবার তাহার কাছে ফিরিয়া যাইব?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কলিকাতা নগরী আলোক মালায় সুসজ্জিত হইলেও কানাইদার বস্তিতে সেই আলোক রশ্মির এতটুকুও প্রবেশ করে নাই। গোটা বস্তিটা যেন জমাট একটা অন্ধকার, মাঝে মাঝে দুএকটি করিয়া কেরোসিনের আলো সেই অন্ধকারের উপর প্রতিফলিত হইতেছে যেন কষ্টি পাথরে একটি একটি করিয়া সোনার দাগ কাটা আছে। ঐ বস্তিটার মতই আমার মনটা অন্ধকারে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে কেবল বৌদিকে দেখিবার আশা একটি ক্ষীণ আলোক রশ্মীর মতই অন্তরে দেখা দিতেছে। আমি দেশের কাজ করিতে জেলে গিয়াছিলাম ইহার চেয়ে গৌরবের কি আর থাকিতে পারে তবুও যেন

অন্তরে একটা অপরাধের বোঝা মনটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। মনে হইতেছে কে যেন ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছে "না না এটা তোমার বাড়াবাড়ি হইয়াছে এত লঘুপাপে এতখানি গুরুদণ্ড দেওয়া ঠিক হয় নাই।"

অপরাধীর মত কানাইদার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি একি সর্ব্বনাশ! কানাইদা মৃত্যুশয্যায় সংজ্ঞাহীন দেহে সেই ছোট খাটটির উপর শুইয়া আছে। বৌদি নত মস্তকে চৌকির নীচে বসিয়া আছে। কেমন করিয়া কী হইল একথা জিজ্ঞাসা করিতে জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল। বৌদি একবার মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাইল তারপর যেমন নত মস্তকে বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল। ঝড়ের আগে সমস্ত প্রকৃতিটা যেমন স্থির হইয়া যায় বৌদিকে দেখিয়া মনে হইল সে যেন আসন্ন দুর্যোগের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমাকে বসিতে বলিল না। কোথায় ছিলাম এতদিন জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিল না। আমি অপরাধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম "বৌদি কানাইদার এমন অসুখ কতদিন হতে হ'য়েছে?"

বৌদি জড়িতকণ্ঠে জবাব দিল—অসুখ? তা প্রায় তিনমাস হবে।

তিনমাস কানাইদা এইরূপ জীবন মরণ সমস্যার মধ্যে রহিয়াছে। তাহার চিকিৎসা হইতেছে কিনা? বৌদির সংসার খরচ, ঔষধ, পথ্য ডাক্তার খরচ জুটিতেছে কী প্রকারে একথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। মনে হইল এই অসুখের জন্য যেন আমিই দায়ী। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলাম—রাধা কোথায় বৌদি?

বৌদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবাব দিল "রাধা! সে ত অনেকদিন চলে গেছে তার বাবা মারা যাবার পর।" কবিরাজ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে রাধা চলিয়া গিয়াছে। যতদূর শুনিয়াছি কবিরাজ মহাশয়ের কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না। তবে রাধা গেল কোথায়? কাহার সাথে

গেল ? এ কথা জানিতে ইচ্ছা হইলেও ভরসা করিয়া বৌদিকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। বৌদিও কোন কথা বলিতেছে না। এই অবস্থায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায়। রাত্রি হইয়াছে, কোথায় যাইব ? কলিকাতায় থাকিবার আমার আর কোন জানা আশ্রয় নাই। নমিতাদিকে কথা দিয়াছি প্রয়োজন হইলে তাহাকে জানাইব। সে ত শুধু কথার কথা মাত্র। যে বৌদির সহিত একত্র বাস করিয়া হাসি গল্পে কথায় এতদিন কাটাইয়া গেলাম তাহার সহিত সম্পর্ক যদি এত শীঘ্র এবং সহজে শিথিল হইয়া যায় তবে নমিতাদির নিকট কোন ভরসায় ফিরিয়া যাইব। বৌদিকেও ত অভিযোগ করিবার কিছু নাই। দোষ দিব কাহাকে ? ভাগ্যচক্রের অভাবনীয় পরিবর্তনেই ত এমনটা ঘটিয়াছে। এই একটু আগেই মনে-মনে কত কল্পনাই করিয়া আসিয়াছি। বৌদিকে যাইয়া তাক্ লাগাইয়া দিব—দেখ আমি কত মহৎ কার্য করিয়া আসিয়াছি, দেশের জন্য জেলে গিয়াছিলাম—তোমাদের কাছেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম সেদিন, 'আজ হইতে দুঃখীর দুঃখ মোচন করিবার ব্রত লইলাম এই ছ্যাখ সেই দুঃখ মোচনের কাজ শুরু করিয়া দিয়াছি'। কিন্তু হায় আমার সেই কল্পনার সৌধ এমন করিয়া ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে কে জানিত ? জেলে যাইবার কথা বৌদির কাছে সগৌরবে প্রচার করিতে আসিয়া সে কথা যে এমন করিয়া লুকাইয়া রাখিতে হইবে এ কথা মুহূর্তেও ভাবি নাই। যেমন করিয়া অপরাধ গোপন করে জেলের কথা তেমনি গোপন করিতে হইল মানুষের এত বড় পরাজয়ের কথা আর কী থাকিতে পারে ?

এই অবস্থায় কী করা যায় কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। বৌদি যদি অনুযোগ করিত 'পর বলেই তুমি চলে যেতে পেরেছিলে ঠাকুরপো' অথবা বলিত 'দেখছ ঠাকুরপো তোমার দাদার অবস্থা' তাহা হইলে

আমি স্বাস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আমার পুরাতন পরিচয় নূতন করিয়া শুরু করিতে পারিতাম। কিন্তু বৌদি একটি কথাও বলিল না। যেমন চুপ করিয়া বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল। আমি বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। এ অবস্থায় কী করা যায় কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। বৌদির এত বড় বিপদ দেখিয়া চলিয়া যাওয়াও মনুষ্যোচিত নহে আবার কী করিয়া থাকিয়া যাইব তাহারও সূত্র খুঁজিয়া পাইলাম না। রাধারাণী থাকিলে হয়ত একটা সমাধান হইয়া যাইত, কিন্তু অদৃষ্টের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস রাধাও এক বিপর্যয়ের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বাড়ীওয়ালী কানাইদার খোজ লইতে আসিল—"ও গৌরী বৌ, আজ বাবুর অবস্থাটা কেমন? এমন ক'রে আর কদিন ভোগবে। মরণ তরণ যা হোক হলে যে নিশ্চিন্ত হ'স। তাও কী কানা ভগবানের নজর দেবার সময় নাই। ওকি! মাণিকবাবু যে! কখন এলেন? কোথায় ছিলেন এতদিন? সেদিন চলে গেলেন, না ব'লে না ক'য়ে, ছুঁড়ির কী কান্না। সাতদিন উপুড় হয়ে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ ক'রে প'ড়ে রইল। আমরা কত বলে কয়েও এক গেরাস ভাত মুখে দেওয়াতে পারি নাই। আমি তক্ষুনি গৌরীবৌকে বলেছিলুম' দেখিস ফিরে আসতে হবে একদিন। এখন কোন নতুন মানুষ পেয়ে ভুলে গেছে। সেখানের নেশা ছুটে গেলে আবার ফিরে আসতে হবে।' দ্যাখ গৌরী বৌ আমার কথা সত্যি হ'ল কি না? কিন্তু যাই বল বাবু আপনারা পুরুষ মানুষরা বড় নিমকহারাম বলতে হবে। একটা মেয়ে মানুষকে মজিয়ে চলে যেতে একটুও বাধল না। আজ অনুকূলবাবু না থাকলে গৌরীর কী হ'ত বল দেখি বাবু? ঐ মানুষটা তিনমাস ধরে মরেও না বাঁচেও না। এর চিকিচ্ছে পথ্যি এ সবের খরচ কে জোটাবে বলুন ত? হ্যাঁ

অনুকূলবাবুর দয়ার শরীর বলতে হবে। গৌরীর মুখ চেয়ে কত পয়সাই খরচ করচে, তবু গৌরীর মন পেল না। আর গৌরীকেই বা দোষ দোব কী? আমি ত মেয়ে মানুষ, মেয়ে মানুষের মন ত জানি। এক জনকে মনে ধরলে আর দুনিয়ার জন-মনিষ্যি ভাল লাগে না। কিন্তু মাণিকবাবু মনের মানুষের জন্য পথ চেয়ে বসে থাকলে ত পেট ভরবে না। আপনারা পুরুষ মানুষ এ সবের মর্ম্ম বুঝবেন না। যখন যেখানে আপনাদের মন ঢলে সেই দিকে ঢলে পড়েন। আর মরণ হয় এদের মত হতভাগীদের।'

বাড়ীওয়ালী হরিদাসী একটানে এতগুলি কথা বলিয়া গেল। আমার সমস্ত চৈতন্য যেন জড় হইয়া গিয়াছে। বস্তি-জীবনের সহিত পরিচয় নাই তাহা নহে কিন্তু এ যেন নূতন অভিজ্ঞতা। বৌদির স্নেহ রাধার শ্রদ্ধা বস্তি-জীবনের এই সকল কদর্যতা হইতে আমাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। তাই বাড়ীওয়ালীর কথা আমাকে এমন অভিভূত করিল যে আমার সমস্ত চৈতন্য লোপ পাইবার জো হইল। হরিদাসী তখনও একটানা বলিয়া যাইতেছে—তা এসেছ বাবু আর কিছুদিন আগে আসতে তাহলে কিছু ল্যাঠা ছিল না। অনুকূলবাবু ছুঁড়ির পেছু অনেক পয়সা খরচ করছে এখন ত তাকে চলে যেতে বলতে পারা যায় না। আর বললেই বা যাবে কেন সে। সে ত মরদ মানুষ—

বৌদি এতক্ষণে মৌনতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—কী যা তা বলছ দিদি—!

হরিদাসী ঝঙ্কার দিয়া বলিল—ঠিক বলছি বৌ ঠিক বলছি, আমাকে সবাই সে জন্যে ঠোঁটকাটা বলে। পুরুষ মানুষ হলেই যে তার সব দোষ ক্ষমা করতে হবে আর আমাদের বেলায় যত দোষ, কেন আমরা মেয়ে মানুষ বলে—আমরা কী মানুষ নই?

বৌদি উঠিয়া দাঁড়াইল তারপর অঞ্চল হইতে একটী চাবির গোছা খুলিয়া আমাকে দিয়া বলিল—পাশের ঘরে তোমার জিনিষ-পত্র আছে ঠাকুরপো নেবে ত নাওগে। এতক্ষণে যেন আমার চৈতন্য ফিরিয়া পাইলাম। বলিলাম—তোমাব সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে বৌদি।

হরিদাসী মুচকী হাসিয়া বলিল—“যাই বাড়ীওয়ালা পোড়াব মুখো আবার চায়ের জন্য চেঁচাবে।” এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। পাশের যে ঘরে কবিরাজ মহাশয় থাকিতেন সেই ঘরটীতে অনুকুলবাবু আশ্রয় লইয়াছেন। বৌদি আমার নিকট চাবিটী ফেরত লইয়া সেই ঘরটী খুলিল। আমি ও বৌদি সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। রাধাদের সেই দীন-কক্ষটী শয্যায় বিলাস-দ্রব্যে যতখানি সাজান সম্ভব ততখানি সাজান হইয়াছে। একটী ছোট লোহার খাটে ধবধবে বিছানা পাতা। একপাশে একটী ছোট ড্রেসিং টেবিল তাহার কাছে একটী ভাঁজ করা ছোট্ট চেয়ার। ক্ষুদ্র ঘরে আয়তনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসবাবে ঘরটী পরিপাটী করিয়া সাজান আছে। বৌদি ঘরে ঢুকিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করিল—কী বল্‌বে বল ?

আমার ভাষা হারাইয়া গিয়াছে। কি বলিব কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। অতিকষ্টে কেবল মাত্র কথা বলিবার জন্যই বলিলাম—রাধা কোথায় গেল বলতে পার ?

বৌদি ঠোঁট উল্টাইয়া অবহেলার কণ্ঠে বলিল—নিজের খবরই রাখতে সময় পাই না আবার রাধার! আপনার কুকুর কোথায় পথ্যি করে তার ঠিক নাই, আবার—।

ইহার পর আর কী কথা বলা যায়। বৌদি ঘর খুলিতে চাবি দিয়াছিল জিনিষ-পত্র লইয়া যাইবার জন্য, অতএব সে যে আমার কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ করিবে না সেটুকু বুঝিতে দেরি হইল

না। হরিদাসীর মুখে এমন একটা জঘন্য ইতিহাস শুনিবার পর এখানে যে আর থাকা চলে না তাহা বুঝিতে পারিলাম কিন্তু রাত্রি বেলায় যাই কোথায়? তাই অনুনয়ের স্বরে বলিলাম—বৌদি কোন রকমে রাতটার মত আমাকে আশ্রয় দাও, জান ত কলকাতায় আমার জানাশোনা কোন জায়গা নাই।

বৌদি ঠোঁট উল্টাইয়া জবাব দিল—তা বটে এইটাই তোমার একমাত্র আশ্রয় কী বল?

এ কথার কী জবাব দিব, তাই চুপ করিয়া রহিলাম। দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকিবার পর কলিকাতায় যে আমি আশ্রয়হীন থাকিতে পারি সে কথা বৌদিকে জানাইয়া তাহার মমতা আকর্ষণ করিবার আর প্রবৃত্তি হইল না। হরিদাসীর মুখে একটু আগেই ত তাহার পরিচয় পাইয়াছি। কানাইদার অসুখ দেখিয়া একটু আগেও লজ্জায় নিজেকে অপরাধী মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু বৌদির চরিত্রের পরিচয় পাইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম যে—ভগবান তুমি কানাইদাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া যথার্থ দয়াল একথা প্রমাণ করিয়াছ। তোমার দয়ার আর সীমা নাই। আর এখানে থাকিতে একমুহূর্ত ইচ্ছা হইল না। মনে হইল ফুটপাথে বা পার্কে কোথাও রাতটা কাটাইয়া দিব কিন্তু কেন জানি না মন তাহাতে সায় দিল না। অনুকূল বাবুটী কেমন লোক দেখিবার আগ্রহ দমন করিতে পারিলাম না। তাই বৌদিকে শ্লেষ করিয়া বলিলাম—জায়গা কলকাতায় হয়ত মাথা গোঁজবার মত পাব তবে কিনা অনুকূলবাবুর সঙ্গে একটু আলাপ করে যাবার কৌতূহল হচ্ছে। লোকটা কেমন তোমার ঠিক যত্ন-আত্তি করতে পারবে কি না?

বৌদি বিষাদমাখা কণ্ঠে জবাব দিল—তা দেখে যাবে বৈকি ঠাকুরপো। সেটা না দেখলে মনে তৃপ্তি পাবে কেন? কিন্তু অনুকূলবাবু ত

এখুনি ফিরবে না তার ফিরতে রাত হবে অনেক। তা হলে নীচে তোমার বিছানা পেতে নাও, ঐ খাটের নীচে তোমার বিছানা রাখা আছে।"

ভাবিয়াছিলাম বৌদি আমার কথায় আঘাত পাইবে। কিন্তু হায় উল্টা সে আমাকে আঘাত দিয়া কথা বলিয়া আমাকেই হারাইয়া দিল। মেয়েরা পরাজয়ের মুখেও কেমন জয় করিবার কৌশল জানে সেদিন বৌদির কথায় তাহা বুঝিয়াছিলাম। আগে বৌদি নিজেই আমার বিছানা পরিপাটী করিয়া পাতিয়া দিত আর আজ অনায়াসে বলিল—খাটের নীচে হ'তে বিছানাটা টেনে নিয়ে পেতে নাও। মেয়েমানুষের সহজাত চক্ষুলজ্জাও কী বৌদি হারাইয়া বসিল। আমি এই অস্বাভাবিক অবস্থাটাকে যেন পরিপাক করিবার জন্যই বলিলাম—অনুকূলবাবুকে দেখার গরজ আমার নাই বৌদি—তবে কিনা কানাইদা মৃত্যু-শয্যায় আর তারই পাশে তোমাদের কেমন সরস সম্বন্ধটা গজিয়ে উঠছে এইটুকু দেখবার কৌতুহল হ'চ্ছে।

বৌদি বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে বলিল—ছি ঠাকুরপো তুমি ত বস্তির ছেলে নও, ও সব কথা বস্তির লোকের মুখে সাজে।

কে যেন আমার মুখে থাপ্পড় দিয়া আমার সমস্ত বাক্য রুদ্ধ করিয়া দিল। বৌদি একি কথা বলিতেছে! যাহা বলিতেছে তাহা সত্য না অভিনয়! কিন্তু সত্য বলি কী করিয়া—বাড়ীওয়ালী যে সব কথা বলিল কৈ বৌদি ত একটী কথারও প্রতিবাদ করিল না। তাই জোর করিয়া আবার বলিলাম—বৌদি যতটা বোকা ভাবছ ততটা বোকা আমি নই—তাছাড়া বাড়ীওয়ালী ত তোমার কীর্তির কথা তোমার কাছেই বললে এখন আর মিথ্যে সে কথা ঢাকা দিতে গেলে চলবে কেন?

বৌদি বিষাদ মাখা কণ্ঠে জবাব করিল—বাড়ীওয়ালী যা বলেছে তা

গোপন ক'রতে যাব কেন ? সত্যিই ত অনুকূলবাবু না থাকলে আমাকে পাথারে প'ড়তে হ'ত। অনুকূলবাবুর ঋণ একটা জীবনে আমি শোধ ক'রতে পারব না। অনুকূলবাবু আর যাই হোক সে মাণিকবাবু নয়। না ঠাকুরপো অনুকূলবাবুকে তোমার দেখে যেতেই হবে, নইলে আমার সত্যকারের খবর তোমার অজানাই থেকে যাবে। শুধু বাড়ীওয়ালীর কথাকে বেদবাক্য বলে নেবে কেন ; যখন ফিরে এসেছ তখন তোমার বৌদির সুখের খবরটা নিজের চোখেই দেখে যাও। সেদিন যে না বলে চলে গেছলে তার জন্য যদি কোন অনুতাপ হ'য়ে থাকে আজ তার খণ্ডন হ'য়ে যাবে। এই বলিয়া বৌদি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। আমি বলিলাম বৌদি আর একটু দাঁড়াও আমার আর একটা কথার জবাব দাও, সত্যিই রাধারাণীর খবর কিছু জান না তুমি ?

বৌদি নিষ্ঠুর হাসিয়া জবাব দিল—রাধারাণীর জন্য বড় দরদ দেখছি যে। সে গরীবেরও উপকার করবার ইচ্ছে যাচ্ছে না কি ? সত্যিই ঠিকানা জানলে তোমাকে দিতুম। সেও তোমার মহৎ অন্তঃকরণের একজন বড় রকমের ভক্ত ছিল। আর ঠিকানা জানা থাকলেই কী হ'ত। এতদিন তার ভাগ্যে যা হবার তা হয়ে গেছে।

ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—কী হ'য়ে গেছে এতদিন বৌদি, রাধার ?

বৌদি পুনরায় নিষ্ঠুর পরিহাসে জবাব দিল—এটুকু বুদ্ধি যদি তোমাদের ঘটে থাকত তবে কী আর রাধারাণীর সম্বন্ধে কোন কৌতুহল দেখাতে ? অভিভাবকহীনা গরীবের মেয়ের ভাগ্যে যা ঘটে তাই হ'য়েছে। রাধারাণীর ভাগ্যে তার ব্যতিক্রম হবে কেন ?

—কী হ'য়েছে রাধারাণীর ?

—হবে আর কী তার এক দূর সম্পর্কের মামা ঠিক সময়টীতে

এসে নিয়ে গেল। সে কী আর এমনি নিয়ে গেল ভাবছ ? সেই মামার এক দূর সম্পর্কের সম্বন্ধী আছে। তার বয়েস পঞ্চাশ হবে এ তার মুখেই শোনা যখন তখন বয়সটা নিশ্চয়ই কম ক'রে বলেছে—তার সঙ্গে রাধার বিয়ে দেবে। তারপর আর কী রাধা বাকী জীবনটা পরার্থে কাটিয়ে দেবে সেই বুড়োর আর বুড়োর দু পক্ষের ছেলেদের সেবা ক'রে।

রাধার বৃদ্ধ বরে বিবাহ হইতে পারে, অথবা কানাইদার মৃত্যুর পর বৌদির কী উপায় হইবে, দেশ সেবা করিতে যাইয়া বা বৌদিদের দুঃখের অংশীদার হইতে যাইয়া এইসব কথা কল্পনাতেও আনি নাই। কানাইদার কোনপ্রকারে শাকান্ন জোটে, কী করিয়া তাহার ভাল খাবার জোটান যায়। রাধা পরের বাড়ীতে জল তুলিয়া মশলা পিষিয়া কোনরূপে আধপেটা খাবার জোগাড় করে, কী করিয়া তাহাকে এই হীন বৃত্তি হইতে উদ্ধার করা যায় ইহাই দরিদ্রের সেবা বলিয়া মনে করিয়া সেদিন বৌদি ও রাধার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলাম "বৌদি তোমরা যদি দুঃখ সইতে পার আমিও পারব। প্রতিজ্ঞা করছি দুঃখের ভয়ে আমি তোমাদের ছেড়ে পালাব না। তা যত দুঃখই আমাকে সইতে হোক। শুধু তোমাদের দুঃখের ভাগ নেব এমন কথা নয় আজ হ'তে যেখানে যত দুঃখী আছে তাদের যাতে আপনার জন হ'তে পারি সেই আশীর্বাদ কর বৌদি।" আর একি ! দুঃখ যে মানুষের জীবনকে এমন করিয়া জট্ পাকাইয়া দিতে পারে তাহা কল্পনাও করি নাই ছাপ'খানায় চাকুরী করিয়া বড় জোর বৌদির সংসারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি হইতে পারে। অথবা রাধাকে হীন দাসীবৃত্তি হইতে বাঁচান যায়, কিন্তু তাহাদের জীবনের এই সব জটিল সমস্যার ত কিছুই করা যায় না। জেলে গিয়াছিলাম, দেশের দুঃখ মোচনের সূত্র তাহার মধ্যে আছে এই ভাবিয়া সান্ত্বনা, পাইয়াছিলাম। নমিতাদের ত্যাগ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া

গিয়াছিলাম এখন জেলে যাওয়া বা নমিতাদের ত্যাগ যেন নিছক ফ্যাসান বলিয়া মনে হইতেছে। হায় কিছু পূর্বেও এই জেলে যাওয়ার কথা ভাবিয়া নিজেকে কতই না বড় ভাবিয়াছি এবং মনে মনে কত কল্পনাই না করিয়া আসিয়াছি যে বৌদিকে আমার এই ত্যাগের কথা শাখা-পল্লবে শুনাইয়া তাক্ লাগাইয়া দিব; কিন্তু হায় এমন করিয়া আমার কীর্তি কথাকে গোপন রাখিতে হইবে এ কথা ত আদৌ ভাবি নাই। তাই হতবুদ্ধি হইয়া জবাব দিলাম—এমন সব গোলমাল হ'য়ে যাবে বৌদি তা ত ভাবি নি।

বৌদি পরিহাস করিয়া বলিল—যেন আমাদের কথাই ভাব সব সময় তাই এই সব গোলমেলে কথা ভাবো নি। হাসালে ঠাকুরপো, এত দুঃখেও হাসালে।

আমি অপরাধীর কণ্ঠে জবাব করিলাম—বিশ্বাস কর বৌদি, আমি স্বেচ্ছায় এতদিন এখানে আসি নি তা নয়—

বৌদি অধৈর্য স্বরে বলল—কৈফিয়ৎ চাই নি ঠাকুরপো। অদৃষ্টের কাছে আবার কৈফিয়ৎ কিসের। সে দিন ভেবেছিলুম তোমাকে আশ্রয় ক'রে তোমার সংসার বিরাগী দাদাকে নিয়ে দুঃখের সাগরে পাড়ি দেব। দেখলুম যে তরণীতে আশ্রয় করেছিলুম তা ফুটো। আবার আজ ভাবছি অনুকূলবাবুকে আশ্রয় ক'রে এই দুঃখের সাগর পার হব। তখন আবার হয়ত দেখব সেও মাণিকবাবুর চেয়েও অকেজো। যাক্ এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নাই। যাই অনুকূলবাবুর জন্য আবার খাবার ক'রতে হবে। এসে হাতের কাছে সব না পেলে রেগে আগুন হ'য়ে যাবে।

বৌদিকে অনুনয়ের সুরে বলিলাম—বৌদি তোমার দুটি পায়ে পাড়ি আর যাই ভাব আমাকে ভুল বুঝো না।

বৌদি ঝঙ্কৃত কণ্ঠে জবাব দিল—বোঝা বুঝি কিছুই নাই ঠাকুর পো আর থাকলেই বা কী। তোমরা হলে পুরুষ মানুষ তার উপর তুমি হলে সাধু মানুষ। যাদের ইহকাল পরকাল নাই তাদের কাছে কী তোমাদের মত সাধু মানুষ থাকতে পারে? তাইত সেদিন চলে গেছলে ঠাকুরপো পাছে তোমার চরিত্রে কোথাও দাগ পড়ে।

এই কথা কয়টী বলিয়া বৌদি হাঁফাইতে লাগিল। বৌদিকে যাহাই বলি বা যে ভাবেই বোঝাই বৌদি আমার কোন কথাই বুঝিতে চাহিবে না। যে বৌদি সেদিন আমাকে একান্ত আপনার লোক করিয়া লইয়াছিল এত আপনার যে সম্বিত হারা হইয়া কণ্ঠলগ্ন হইতে দ্বিধা করে নাই। আজ সেই বৌদি যে এমন নিষ্ঠুর হইয়া আমাকে ছুঁড়িয়া ফেলিবে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। যে বৌদিকে আমার ভাল লাগিয়াছিল, গল্পে, গানে হাস্যে পরিহাসে সে আমাকে সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একান্ত নিজের কাছে টানিয়া রাখিয়াছিল। তাহার অপূর্ব সৌন্দর্য আমার চিত্তে এমন একটা মাদকতা সৃষ্টি করিয়াছিল যেন বৌদি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। সর্বোপরি তাহার মনোরম ব্যবহার আমার সব কিছুই ভুলাইয়া দিয়াছিল—আর আজ কিনা সেই বৌদি পূর্বের সব কিছু ভুলিয়া এমন নিষ্ঠুর ভাবে আমাকে ত্যাগ করিবে কে জানিত! একি প্রতিহিংসা না আর কিছু। এতদিনের অভিজ্ঞতা হইতে যেটুকু জানি কই তাহার সহিত ত বৌদির ব্যবহারের মিল খুঁজিয়া পাইতেছি না। যাহাকে ভাল লাগিয়াছে বা যাহাকে ভাল বাসিয়াছি সে যে এমন অপ্রিয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আজ বৌদির ব্যবহারে আমার পক্ষে অশ্রুরোধ করিতে পারা কঠিন হইয়া পড়িল তাই কোন রূপে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম—বৌদি সেদিন তুমি অনুরোধ করেছিলে আমি যেন ভুল বুঝে তোমাকে ত্যাগ ক'রে চলে না যাই। ভাগ্য বিড়ম্বনায় সেদিনের

তোমার সে কথা আমি রাখতে পরি নি, কেন পারিনি সে কথার জবাব দেব বলেই আজ ফিরে এসেছিলুম। একথাও আমি জানতুম একদিন তোমার নিকট হতে অমোকে বিদায় নিতেই হবে। জানি তোমার সঙ্গে আমার দুদিনের সম্পর্ক, তাকে যদি ছিন্ন করতেই হয়, তবে এমন নির্ম্মম ভাবে না করলেই কী চলছিল না। কী ভেবে সেদিন আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে জানি না। আর কী এমন অপরাধ করেছিলুম যে আজ বিদায়ের দিনে এমন মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। বেশ ত বিদায় যদি দিতেই হয় বা নিতেই হয় তাকে সহজ ভাবেই নাও না কেন ?—এই কথা বলিয়া বৌদির মুখের দিকে চাহিলাম দেখিলাম, বৌদির মুখের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া গিয়াছে, বর্ষায় ধারার মত অবিশ্রান্ত গতিতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া বক্ষের সমস্ত বস্ত্রকে সিক্ত করিয়া দিয়াছে।

কোনরূপে রুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বৌদি উত্তর করিল—কেন ফিরে এলে ঠাকুরপো—কী দেখতে ফিরে এলে ? যে বৌদিকে তুমি দেখে গেছ সে ত কবে মরে গেছে। যে মরে গেছে তাকে যেমন ফিরে পাওয়া যায় না তেমনি কোনদিন তোমার সে বৌদিকে আর ফিরে পাবে না। যাও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। নোংরা বস্তিতে যার তার সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে বাকী জীবনটা আর নষ্ট ক'রনা। আমাদের ভাল মন্দ ভেবে মিথ্যে মনে কষ্ট পেয়ো না। বস্তির মানুষের জন্য তোমাদের মত লোক কেউ কোন দিন ভাবে নি মিথ্যে তুমি ভেবে কেন কষ্ট পাবে। অনুকূল বাবুর মত লোকেরাই চিরদিন আমাদের কথা ভেবে এসেছে। আমাদের দুঃখ দেখে পাশে এসে অযাচিত সাহায্য দিয়েছে। চিরদিন আমরা এদের মত লোকের কাছে সাহায্য পেয়ে বেঁচে আছি। অনুকূল বাবুর মত লোককে তোমায় মত আমিও একদিন ঘৃণা করতুম এবং ঘৃণা করতুম বলেই তোমাদের মত লোককে আপনার করতে গেছলুম। তখন ত বুঝি নি

তোমরা কত দুর্বল। আমাদের বোঝা বইবার মত শক্তি তোমাদের নাই। সেদিন যদি সে কথা বুঝতুম তবে কী তোমাকে এমন করে কষ্ট পেতে হত। পথের আলাপ পথেই শেষ করে দিতুম। সত্যি ঠাকুরপো কী বোকামিই সেদিন করেছি বলত? এইটুকু বুদ্ধি আমায় ঘটে সেদিন এলনা যে তোমরা কত অসহায় কত দুর্বল।

বৌদি একটানা তাহার যুক্তি বলিয়া যাইতেছে আর আমি হতবাক্ হইয়া শুনিয়া যাইতেছি। মনে মনে অনুকূল বাবুকে 'আসামী' মনে করিয়া নীতির এজলাসে দাঁড় করাইয়া বৌদিকে দেখাইয়া দিন যে অনুকূল বাবুর মত লোক সমাজের পক্ষে কত অকল্যাণকর, এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম। আর বৌদি কিনা বিচক্ষণ উকিলের মত প্রতি-পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়া আসামীকে খালাস করিয়া লইল। তাই বৌদির যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য শ্লেষ করিয়া বলিলাম বৌদি অনুকূল বাবুর ভাগ্য নিয়ে আমি ঈর্ষা করছি না তবে তারা যে সমাজের এতবড় উপকারী জীব একথা আমি জানতুম না। এ বোধ হয় তোমার শাস্ত্রে লেখা আছে।

বৌদি হাসিয়া জবাব দিল শাস্ত্র শাস্ত্রই ঠাকুরপো। সেখানে তোমায় আমার কিছুই নাই। শাস্ত্র সব সময়েই সত্যি সে তোমারই হোক আর আমারই হোক। তবে বস্তির শাস্ত্র বস্তির লোকের কাছে সত্য। আর তোমাদের শাস্ত্র তোমাদের কাছে সত্য। যাক্ এ নিয়ে আর মাথা ঘামিও না আমাদের শাস্ত্র তুমি বুঝতে পারবে না।

—বুঝতে যদি না পারি তবে না হয় একটু বুঝিয়েই দাও না বৌদি একদিন ত তোমাকে গুরু বলে মেনেছিলুম। আজও না হয় তোমাদের শাস্ত্রের আমার গুরু হয়েই রইলে।

—এবার হাসালে ঠাকুর পো। মানুষ তার প্রয়োজনে শাস্ত্র তৈরী

করে ঠাকুর পো। তাই আমাদের শাস্ত্র আর তোমাদের শাস্ত্র আলাদা। আমার বাবা একজন মস্ত বড় শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত ছিলেন। তার কাছে বসে কতদিন শুনেছি মানুষ তার প্রয়োজন মত কত শাস্ত্র রচনা করেছে। অথবা রচিত শাস্ত্রের প্রয়োজন মত নূতন ব্যখ্যা করেছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনকে বড় করবার জন্য আগের শাস্ত্রকে বারবার খণ্ডন ক'রে নূতন ক'রে শাস্ত্র রচনা করেছে। এই সব শাস্ত্র রচনা করবার সময় তারা নিজের দিকেই চেয়েছিল আর কারও দিকে চায় নাই। এই আমার বাবার কথাই দেখ না তাঁর আধ্যাত্মিক পথের বিঘ্ন হবে মনে ক'রে আমাকে গৌরীদান করল তোমার দাদার কাছে। বাবা বা বাবার গুরুদেব—তোমার দাদার আধ্যাত্মিক পথে আমি যে কাঁটা হ'তে পারি সে কথা তারা ভেবেও দেখলো না। আমার বাবা শুধু পণ্ডিত ছিলেন না ঠাকুরপো-বেশ বিত্তশালীও ছিলেন। তার সমস্ত বিত্ত গুরুর আদেশ মতই ব্যয় হ'ত। বাবার গুরুদেব দেখলেন গৌরী থাকতে একা সমস্ত বিষয়ের নির্যাস ভোগ করা যাবে না তাই তার সংসার বিরাগী শিষ্য তোমার দাদার হাতে আমাকে স'পে দিলেন; যে বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আর বাবা দেখলেন গুরুবাক্য সার্থক করলে অক্ষয় স্বর্গ—তাতে যদি গৌরীর মত এক আধটি প্রাণী বলিই দিতে হয় তাতে এমন কি এসে যাবে। তাই তাদের বিধান মতেই আজ বস্তিতে এসে পড়েছি এমনি আসিনি ঠাকুরপো!

বৌদির কথায় কী আর জবাব দিব। ইহার জবাব নাই জানি, তবুও পরিহাস করিয়া বলিলাম—বৌদি অনুকূল বাবুকে তোমার ভাল লেগেছে কী বল?

বৌদি উচ্ছসিত হাসিতে ফাটিয়া পড়িল—বলিল এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ। এ কথা তুমি বলবে আমি জানতুম।

তোমার দাদাকে আমার কোন দিন ভাল লাগে নাই এ কথা তোমার জানাই আছে তাই সেদিন তোমাকে ভালবেসে গলা জড়িয়ে ধরেছিলুম। আর তোমাকে যখন পেলুম না তখন যে অনুকুল বাবুর মত লোক খুঁজে বার করবো এটুকু জানতে বেশী বুদ্ধির দরকার হয়না।

বেদনা বিদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলাম—ছিঃ বৌদি তুমি এতখানি নেমে গেছ এ আমি ভাবতে পারি নি।

বৌদি সরল হাসিতে সমস্ত ঘরখানাকে সরস করিয়া বলিল—না ঠাকুরপো আমি একটুও নামিনি। ঠিক যেখানে থাকবার সেখানেই আছি। তবে তুমি অনেকখানি উঠে গেছ। তাই তোমার মনে হচ্ছে আমি অনেকখানি নেমে গেছি। যদি নেমে যেতুম তবে আবার গলা জড়িয়ে ধ'রে বলতুম আর তোমাকে ছাড়ব না, যখন ফিরে পেয়েছি। আর সে কথাটা শুনতেই ত ফের ফিরে এসেছ।

—ছিঃ ছিঃ বৌদি এ তুমি কি বলছ।

—ঠিক বলছি ঠাকুরপো অতি সত্যি বলছি। আমরা মেয়েমানুষ আমাদের মধ্যে তোমাদের যে স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। আজ অনুকুল বাবুকে ঘেন্না করলে কী হবে। আর যাই হোক মিথ্যে সাধুতার মুখোস পরে নাই তারা।

বারে বারে অনুকুল বাবুর কথা বলিয়া আমার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া আমি তিক্ত কণ্ঠে বলিলাম—যুক্তি মাত্রেই ন্যায় যুক্তি নয়। কিসের তাগিদে আজ অনুকুল বাবুর গুণগান করছ সে আর কেউ না জানুক আমার কাছে তা গোপন নাই।

বৌদি আবার হাসিয়া জবাব দিল—ঠিক ধ'রেছ ঠাকুরপো এ না হ'লে তোমাদের বিদ্বান বলবে কেন লোকে। কিন্তু যদি একটা কথার জবাব দিতে পার তবে অনুকুল বাবুকে ছেড়ে আবার তোমার গলা জড়িয়ে ধরি।

—কী যা তা বলছ বৌদি—

—কিছু যা তা বলিনি ঠাকুরপো। সত্যি কথা বলছি বলেই রাগ হচ্ছে। বস্তির এমন কত মেয়েই ত অনুকুল বাবুদের খপ্পরে পড়ে কই তাদের জন্য ত কোন মাণিক বাবুকে হা হুতাশ করতে দেখি না। যাক্ আমার কথার জবাব দাও দেখি—হাসছি বলে পরিহাস করছি না। মনে কর তুমি হলে বৌদি আর আমি মাণিকবাবু। তোমার স্বামী সর্বসাকুল্যে আটাশ টাকা বেতন পান। মাসকাবার খরচ চালিয়ে কিছু দেনা হয়। কেমন ক'রে দিন যায় তা ত তোমার অবিদিত নয়। হঠাৎ একদিন মাসের শেষে তোমার স্বামী পেটে অসহ্য ব্যথা নিয়ে ছাপাখানা হতে ফিরল। হাতে একটী পয়সা নাই। মাসের শেষ এর তার কাছে তখন ধার ক'রতে শুরু ক'রেছ। এমন অবস্থায় স্বামীর অসুখ, তার ত একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার পুঁজি নাই কিছু সামনে কিন্তু বিরাট খরচের ফিরিস্তি। এ অবস্থায় কী ক'রবে তুমি? অসহায় হ'য়ে কাঁদলে ত স্বামীর অসুখ ভাল হবে না। তুমি হয়ত এর তার কাছে হাত পাততে। তাতে দুচার আনা পয়সা মিলতে পারে তাই বলে এত কেউ বদান্য নয় যে ডাক্তারীর ফিটা দিয়ে দেবে। তখনকী ক'রবে যদি সাহায্য ক'রতে অনুকুল বাবুর মত কোন লোক এগিয়ে আসে?

আমি উত্তর করিলাম—এ অবস্থায় সাহায্য না নিয়ে উপায় কী।

বৌদি ধীর কণ্ঠে জবাব দিল—আর অনুকুল বাবুরা যে সাহায্য ক'রবে তা এমনিই করবে ভাবছ? কিছুদিন পরে যখন জানতে পারবে যে অনুকুল বাবুরা বিনা মতলবে সাহায্য করে না বিনিময়ে তারা আর কিছু চায় এবং সে চাওয়াটা যখন বাস্তবিক হ'য়ে দেখা দেবে তখন তুমি কী ক'রবে? তুমি জবাব দিতে পার এ ক্ষেত্রে সতী সাধ্বীরা গলায় দড়ী দিত। তাতে সতী সাধ্বীর অক্ষয় স্বর্গ হত কী না জানি না তবে

বেচারা স্বামী দেবতার রোগের চিকিৎসার একটুও সুরাহা হ'ত না। বল ত এখন এই অবস্থায় অনুকুল বাবুর হাত হ'তে রেহাই পাবার জন্য গলায় দড়ি দিতে পারতে ?

বৌদির এই কথায় কী উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। সত্যই ত যাহার স্বামী মৃত্যু শয্যায় অথচ তাহার চিকিৎসার পথ্যের নিজের ভরণ পোষণের কোন উপায় যাহার নাই সে অবস্থায় অনুকুল বাবুদের মত লোকের কাছে হাত পাতা ছাড়া উপায়ই বা কী—আর অনুকুল বাবুরা এই সুযোগে যদি কোন অন্যায় দাবী করে তবে তাহা হইতে পরিত্রাণেরই বা পথ কী ? এ সমস্যার কোনই সমাধান খুঁজিয়া পাইলাম না তবুও মনটা যেন ঠিক এই যুক্তিতে সায় দিতে চাহিল না। বৌদি যে নিজের পেটের জন্য বা কানাইদার চিকিৎসার জন্য অনুকুল বাবুর মত একজন নীচ ব্যক্তির নিকট আত্মবিক্রয় করিবে এ কথা ভাবিতেও পারা যায় না। তাই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিলাম—ঠিক এই অবস্থায় প'ড়লে আমি কী করতুম সে কথা শুনে তোমার কাজের সমর্থন পাবে এই আশা করেই তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছ। যে যাই করুক তা ন্যায়ই হোক আর অন্যায়ই হোক তার মধ্যে সে একটা যুক্তি খাড়া করবেই। সেইজন্য তোমার কাজেব সমালোচনা ক'বতে চাই না। কিন্তু দুঃখ হ'চ্ছে এই ভেবে যে কানাইদার মৃত্যুর পর না হয় ঠাঁই দিতে অনুকুল বাবুকে। কানাইদা সংজ্ঞাহীন হলেও ভগবান ত উপর হ'তে এই সব ঢলাঢলি দেখছে।

বৌদি ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে জবাব করিল—ঠিক বলেছ ঠাকুরপো যখন উপায় আর কিছু খুঁজে পেলে না তখন দুদিন আগু পিছুর মামলায় আমার বিরুদ্ধে ডিক্রী দিলে। আমার কাজের সমালোচনা ত ক'রলে কই সমাধানের ত রাস্তা বাতলাতে পারলে না। অনুকুল বাবুদের মত

লোকের সঙ্গে তোমার ত পরিচয় নাই। তারা অপেক্ষা ক'রতে চাইবে কেন শুনি? তারা ত আর দানছত্র খুলতে বসে নি।

আর কোন সন্দেহই রহিল না! এতক্ষণে বুঝিলাম বাড়ীওয়ালীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। বৌদি আজ অনুকূল বাবুকে আশ্রয় করিয়া তাহার ভবিষ্যতের নীড় বাঁধিয়াছে। হয়ত তাছাড়া আর গত্যন্তর কিছু ছিলনা। তবুও কথাটা ভাবিয়া কোথায় যেন বেদনা বোধ হইতেছে। না বৌদি ভাল করে নাই—ভুল করিয়াছে। অনুকূল বাবুই যে চিরদিন আশ্রয় দিবে তারই বা ঠিক কি? তাই বলিলাম বৌদি অনুকূল বাবু কি চিরদিন তোমায় আশ্রয় দেবে ভেবেছ?

বৌদি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কে বলেছে চিরদিন তার আশ্রয়ে থাকতে হবে। তেমন কিছু তার কেনা গোলাম হয়ে যাইনি। অনুকুল বাবুর চেয়ে যে বেশী করবে আবার তাকে নিয়ে ঘর বাঁধব।

একি! বৌদি এতখানি নামিয়া গিয়াছে। এই কথার কী উত্তর দিব তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। তাই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব করিলাম—যা করবে তা মনেই রাখ বৌদি ঐ কথা বলে বড়াই করার কিছু নাই।

বৌদি আরও জোরে হাসিয়া বলিল—রাগ করছ মিছে ঠাকুরপো—যাদের জীবনে অনুকূলবাবুরা ভীড় করে তারা তখন এমনই করে। আমার বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন? ভাত কাপড়ের জন্যে যদি এমনটাই হ'তে হ'লে তবে যে বেশী দেবে তার কাছে যাব না কেন শুনি? এ কিছু নূতন কথা নয়। এ তুমি হ'লেও করতে।

জবাব দিলাম—হয়ত ত আমি হ'লেও তোমার মতই করতুম।

কিন্তু মনের আগোচরে ত কোন পাপ নাই—আচ্ছা সত্যি ক'রে বল দেখি বৌদি অনুকূল বাবুকে তোমার খুব ভাল লেগেছে, তাই বারবার তার পক্ষ সমর্থন ক'রে যুক্তি খাড়া করছ—এই সোজা কথাটার উত্তর দাও দেখি ?

বৌদি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গদ গদ কণ্ঠে বলিল—সত্যি যদি বিশ্বাস কর ঠাকুরপো তবে অনুকূল বাবুকে আমার একটুও ভাল লাগে নি।

—তবে তুমি এমন ক'রে আত্মসমর্পন করলে কী করে ?

—এই যেমন তোমার দাদাকেও আমায় ভাল লাগেনি—তাই বলে তাকে নিয়ে কী ঘর ক'রতে আপত্তি করেছি, তেমনি অনুকুল বাবুর ঘর ক'রতে আপত্তি হবে না।

—দাদার সঙ্গে অনুকুল বাবুর তুলনা দিতে তোমার মুখে একবার বাধল না বৌদি !

—কেন বাধবে ঠাকুরপো আগেই ত বলেছি বস্তির শাস্ত্র আলাদা এদের শাস্ত্রের তোমাদের সঙ্গে মিল নাই। এদের কথা তোমরা বুঝতে পারবে না।

—বুঝতে না হয় নাই পারলুম। কিন্তু অনুকুল বাবুকে তোমায় ভাল লাগে না—অথচ তুমি তার কাছেই আত্মসমর্পন ক'রেছ, এ আত্মনিগ্রহের কারণ ত আমাকে একটা বোঝাতে হবে।

—এই সোজা কথাটা বুঝতে পারলে না! পেটের দায়ে এটা ক'রতে হচ্ছে। তোমার দাদাকে ভাল না লাগলেও ভরণ পোষণ কানরূপে চালিয়ে যাচ্ছিল তাই অনুকুল বাবুদের এতদিন খোঁজ পড়ে নি। আজ সেই পেটই তাদের খুঁজে বার ক'রল। পেটের চেয়ে আর কে বেশী আপনার বল ? তাকে তুষ্ট রাখতে একটা অনুকুল বাবু কেন

হাজারটা অনুকুল বাবুর খোঁজ ক'রতে হ'তে পারে। যাক্ আমাদের অবস্থায় না পড়লে যেমন ক'রেহ বোঝাই বুঝতে পারবে না। এখন যাই খাবার করিগে—নয় ত অনুকুল বাবু এসে চেঁচামেচি ক'রবে।

অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিলাম—বৌদি আমি কী তোমার কোন কাজে লাগতে পারি না। আমার দ্বারা কি তোমার কোন উপকারই হ'তে পারে না।

—না ঠাকুরপো হতে পারে না। তোমার সাধ্য কী যে আমার সমাস্যার সমাধান কর। তা যদি পারতে তবে কী অনুকুল বাবুকে ভ'জতে যাই। অনেক ভেবে দেখেছি তোমার দ্বারা কোন উপকারই আমার হবে না। তুমি যে দিন চ'লে যাও সে দিন কত কন্নাই কেঁদেছি। এত কেঁদেছি ঠাকুরপো যে তোমার আত্মভোলা দাদা না থাকলে সেদিন আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতুম। তারপর যত দিন যাচ্ছে তত বুঝতে পারছি ভগবান যা করেন ভালর জন্যই করেন। তুমি থাকলে ভাল ত আমার করতেই পারতে না উপরন্তু আজীবন তোমার জন্যই আমাকে ভুগতে হ'ত। এতে আমার দুঃখের লাঘব ত হতই না অথচ তোমার জীবনটা ছারখার হ'য়ে যেত।

আমি তোমার কথা বুঝতে পারলুম না বৌদি—

আহা অনুকুল বাবুর বদলে তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতুম। এ সোজা কথাটা বুঝতে দেরী হচ্ছে কেন? এতে কি ভালই হ'ত ঠাকুরপো, আজীবন তুমি সংসার হ'তে সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে একটা বস্তির জীবে পরিণত হতে। আমি নিজের জন্যে এতটা করতে পারতুম না কোন দিন। পেটের জন্য এতটা হীন হ'তে পারতুম না।

অনুকুল বাবুর মত ঘর বাঁধতে হত কেন? আমাদের ত অন্য সম্বন্ধ ছিল বৌদি—ঠাকুরপো হয়েই ত তোমার ভার নিতে পারতুম।

তা হয়ত পারতে। কিন্তু তাতে তুমি রক্ষা পেতে না। কেউ তোমাকে বিশ্বাস করত না। তোমার সমাজে তুমি আর মর্যাদা নিয়ে ফিরে যেতে পারতে না। পুরুষ মানুষ বলে হয়ত সমাজ জায়গা দিতে বাধা দিত না কিন্তু কোন দিন ওখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতে না। এ আমি সহ্য করতে পারতুম না ঠাকুরপো।

বেশ ত নাই বা সমাজে ফিরে যেতুম বৌদি। এখানেও কী ভাল হয়ে থাকা যেত না। তোমাদের কাছেই না হয় মাথা উঁচু করে থাকতুম।

ভুল ঠাকুবপো কত বড় ভুল তা বোঝাবো কী করে তোমাকে, মাথা উঁচু করে দাঁড়ান ত দুরের কথা আমার জ্বলন্ত কামনার কাছে পুড়ে তুমি ছাই হয়ে যেতে, মাণিক বলে আর চেনা যেত না। যাও ঘবের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। আমার কাছে কথা দিয়ে যাও আর দুঃখ মোচনের অহংকার করে বেড়াবে না। সত্যি কারের দুঃখ মোচনের যোগ্যতা যদি কোন দিন অর্জন করতে পার সেদিন যেখানেই থাকি দুঃখের ভার লাঘব করতে তোমার কাছে ছুটে আসব।

তবে কী বলতে চাও আমরা এতই অযোগ্য যে তোমাদের দুঃখের লাঘব করতে পারব না।

সে কথার আজ জবাব দেব না ঠাকুরপো। ভবিষ্যতের কাজের মধ্যেই আমার কথার জবাব খুঁজে পাবে। আমার ত একার নয় এমন কত হতভাগিনীর দুঃখ তোমার চোখের সামনে অহরহ পড়বে। তখন দেখতে পাবে কত ক্ষুদ্র তোমার ক্ষমতা। তখন যদি সত্য সত্যই তাদের দুঃখ মোচনের শক্তি অর্জন করতে পার তখন আমাকে আর খুঁজে বার করতে হবে না আমি আপনি এসে তোমার কাছে আশ্রয় নেব।

বৌদি একটা অনুরোধ রাখবে ?

কী বল ?

কানাইদার যা হয় একটা কিছু না হওয়া পর্যন্ত আমাকে এখানে থাকতে দাও আমি যে স্বার্থপরের মত পালিয়ে যাব এ কলঙ্ক হতে তুমি আমাকে বাঁচাও

না তা হতে পারে না।

আমি যদি জোর ক'রে থাকি।

আমি তা হলে তক্ষুনি অনুকূল বাবুকে নিয়ে পালিয়ে যাব।

"এই সোনার চাঁদটিকে কোথা হতে জোটালে বাবা। কখন হতে এসে দাঁড়িয়ে আছি তা ভ্রুক্ষেপ নাই। কে বাবা সোনার চাঁদ প্রেমালাপ জমিয়েছ ? বড শক্ত জায়গায় এসেছ। ওখানে আর দাঁত বসাতে হবে না। আমার মত ওস্তাদ খেলোয়াড়কেও সাত ঘাটের জল এক ঘাটে খাওয়াচ্ছে আর তোমার ত গায়ে আঁতুড়ের গন্ধ ছাড়ছে।

বৌদি ভৎর্সনার স্বরে বলিল—আবার আপনি আজ মদ খেয়ে এসেছেন ?

বুঝিলাম ইনিই অনুকূল বাবু !

অনুকূল বাবু টলিতে টলিতে উত্তর করিল—বাব্বা একবারে হাকিমের হুকুম। মদও খাবনা না, তোমাকে দিদি ঠাকরুণ ভেবে সাত হাত তফাতে থাকতে হবে তবে দাঁড়াই কোথা বাবা।

বৌদি রুক্ষস্বরে বলিল—নেন আজ আর মাথার ঠিক নাই শুয়ে পড়ুন এখন।

অনুকূল বাবু পূর্ববৎ জড়িত কণ্ঠে জবাব দিল—মাতাল হলে আমার মাথা কোনও দিন বেঠিক হয় না বরং যারা মতাল নয় তারাই দেখি বেঠিক। যাক্ এনার পরিচয়টা কী জানতে পারি ?

অনুকুল বাবুকে দেখিয়া ঘৃণায় লজ্জায় আমার বাক্যরুদ্ধ হইয়া গেল। বৌদি ইহাকে লইয়া তাহার ভবিষ্যতের ঘর বাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। মানুষ কতখানি অধঃপতিত হইলে এমনটা করিতে পারে তাহা ধারণা করা যায় না। বৌদির দিকে ঘৃণায় চাহিতেও ইচ্ছা করিল না।

অনুকুল বাবু বৌদিকে লক্ষ্য করিরা বলিল—কী বাবা পরিচয় দিতে লজ্জা কী, চুপ করে রইলে কেন? বল না এইটাই তোমার সেই মনের মানুষ—যার জন্য মর্তের লোককে গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয় না। বলে ফেল না—লজ্জা কিসের?

বৌদি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—কী যা তা বলছেন—যান্ মাথার ঠিক নাই আপনার শুয়ে পড়ুন গে এখন।

অনুকুল বাবু হাসিয়া জবাব দিল—ঐ দ্যাখ সত্যি কথা বলছি কিনা অমনি রাগ হয়ে গেল। বাড়ী ওয়ালার কাছে সবই শুনেছি। যে মাণিক চাঁদের জন্য হা হুতাশ করা হয়, মর্তের মানুষকে মানুষের মধ্যে গন্যই করা হয় না, ইনিই কী তোমার সেই মাণিকচাদ?

একজন মাতাল একজন ভদ্রমহিলার সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে শালীনতা হীন ভাষায় কথা বলিয়া যাইতেছে অথচ বস্তি শুদ্ধ লোক একটুও কৌতুহল বোধ করিতেছে না বা বৌদিকে এই অসম্মানের হাত হইতে রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিতেছে না। বস্তি জীবনের ইহা যেন নিত্য ঘটনা। এই রূপ পরিবেশের মধ্যে বৌদি কেমন করিয়া জীবন কাটাইতেছে বুঝিয়া পাইলাম না। তাই উত্তেজিত স্বরে বলিলাম—বৌদি খুব হয়েছে—এখানে আর দাঁড়িয়ে কেন ঐ ঘরে যাও।

অনুকুল বাবু হিহি করিয়া হাসিয়া জবাব দিল—কেন বাবা রাগ হয়ে গেল যুগল মিলনে বাধা দিলুম বলে? কৈ আমার ত রাগ হল না। এই যে এত টাকা ওর পেছুতে খরচ করছি তবুও মন পেলুম না! কোথায়

আমায় রাগ হবে—না আমাকে দেখেই রেগে খুন! কী ঠাকরুণ বলি ধর্ম্ম বলে ত একটা জিনিষ আছে ?

বৌদি অনুকুল বাবুকে ধরিয়া লইয়া জোর করিয়া বিছানায় শুয়াইয়া দিয়া বলিল—ফের যদি অমন করেন তবে আমি গলায় দড়ি দেব।

অনুকুল বাবু ভীতস্বরে বলিল—না না আমি চুপটী করে শুয়ে পড়ছি গলায় দড়ি ফড়ি আর দিয়ে কাজ নাই। ওর অনেক হাঙ্গামা। তোমার কী তুমি ম'রে খালাস আর আমার হুজ্জুতির এক শেষ।

বৌদি আমার দিকে চাহিয়া বলিল—স'রে দাঁড়াও ঠাকুরপো মেঝেতে তোমার বিছানাটা পেতে দিই।

বৌদির কথায় আমি ভয় পাইয়া গেলাম—এই মাতালটার ঘরে আমাকে সারারাত কাটাইতে হইবে এই ভাবিয়া ভীত কণ্ঠে বলিলাম—বৌদি অন্য কোথাও রাতটা কাটিয়ে দেব—আমার ভয় পাচ্ছে।

বৌদি মৃদু হাসিয়া জবাব দিল—তাকি হয়, অনুকুল বাবুকে দেখার সাধত মিটল এখন একটু আলাপ পরিচয় ক'রে যাও। চ'লে ত যাবেই—কে আর ধ'রে রাখছে বল ?

অনুকুল বাবু চুপ করিয়া পড়িয়াছিল, বৌদির কথা শুনিয়া বলিল গৌরী একটা কথা বলব ?

বৌদি ধমক দিয়া বলিল—না আর কথায় কাজ নাই, চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন।

অনুকুল বাবু তথাপি বলিলেন—আমি বলছিনু কী উনি চলে যাবেন কেন ? আমি থাকলে ওঁর অসুবিধে হয় আমিই না হয় রাতটা কোথাও কাটাই গে।

বৌদি বলিল—না ওর কোন অসুবিধে হবে না আপনি শুয়ে পড়ুন। এই বলিয়া বৌদি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে আমি বৌদির

আঁচল ধরিয়া টানিয়া বলিলাম—বৌদি তুমি যেও না, আমি এর কাছে থাকতে পারব না আমার ভয় করছে।

অনুকুল বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—ভয় কাকে ? আমাকে। এ যে রাজযোটক দেখছি। আমি যেদিন পেথম মদ খেয়ে এলুম সেদিন ত গৌরী ভয়ে বাড়ীওয়ালীর ঘরে ছুটে পালালো। ভয় কিসের বাবা—মদ খেলে কী মানুষ বাঘ ভালুক হয়ে যায় ?

বৌদি হাসিয়া বলিল—তুমি পুরুষ মানুষ ঠাকুরপো তুমি ভয় পেয়ে গেলে। আর আমি মেয়ে মানুষ হয়ে তোমাকে রক্ষা করব ?

অনুকুল বাবু খুশী হইয়া বলিল—ঠিক বলেছ গৌরী এতক্ষনে একটা বিচক্ষণের মত কথা বলেছ। আমাকে দেখে মেয়ে মানুষই ভয় খায় না ত পুরুষ মানুষে ভয় খাবে ? আমি ত বাবা কারও ক্ষতি করিনা। কী গৌরী তুমিই ত সাক্ষী রয়েছ ? তোমার কোন ক্ষতি করেছি আমি ? তুমি যা বলেছ তা মান্যি করেছি কি না ? বাড়ীওয়ালী আমার কাছে পাঁচশো টাকা আগাম নিয়ে বললে এমন মেয়ে মানুষ দেব যে তেমন মেয়ে ভূভারতে জুটবে না। এখন যদি বলি মেয়ে মানুষ আমার হল কই ? মেয়ে ত নয় যেন 'মা মনসা' কাছে যাবার জো নাই সাত হাত দূর হ'তে দণ্ডবৎ।—আচ্ছা গৌরী সত্যি আমাকে ভালবাসতে পার না ?

বৌদি সস্নেহ কণ্ঠে জবাব দিল—কেন ভালবাসতে পারবনা অনুকুল বাবু—আমি আপনাকে খুব ভালবাসি।

অনুকূলবাবু বিচলিত কণ্ঠে বলিল—থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এ কথা ভুলব না। মাইরী গৌরী যেদিন তোমাকে পেথম দেখি সেদিন হতে আর কিছু ভাল লাগে না। কতদিন ভেবেছি মদ আর খাব না। একবারে পবিত্র হয়ে যাব। বলি ও মশায় শুনছেন—মদ কেন তবুও খাই জানেন ? মানে ঐ যে আপনার

বৌদি না কী হয় বলছেন মদ না খেয়ে ওর কাছে দাঁড়ায় কার বাবার সাধ্যি—মানে যেন ভস্ম করে দেবে। তাই যেদিন দুটো কথা বলতে ইচ্ছে যায় সেদিন বাধ্য হয়ে একটু ফিকে নেশা করি। মানে জিনিষটা পেটে প'ড়লে ভয়-ডর আর ত্রিসিমানায় আসতে পারে না কিনা ?

বৌদি আমার শয্যা পাতিয়া দিয়া কানাইদার নিকট চলিয়া গেল আমি হতবুদ্ধি হইয়া শয্যার উপর বসিয়া পড়িলাম। বৌদির স্বামী মৃত্যু-শয্যায় তাহার জন্য তাহার কোন মমতা আছে বলিয়া বোধ হইল না। কানাইদার এতক্ষণের মধ্যে একটুও পরিচর্যা করিতে দেখিলাম না। অথচ একজন মাতালের সহিত সম্বন্ধ পাতিয়া দিব্য তাহার পরিচর্যা করিয়া কাটাইয়া দিতেছে। নারী জাতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি। আজ পর্যন্ত যত নারীর সহিত মিশিয়াছি তাহাদের সহজ সুন্দর স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এমন নীচ কুরুচিপূর্ণ স্বভাব থাকিতে পারে কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। বৌদির সহিত বহুদিন একত্রে বাস করিয়াছি—কই তাহার মধ্যে যে এতটা কদর্য্যতা লুকাইয়া ছিল তাহার আভাস পর্যন্ত কোনদিন পাই নাই। আমার সমস্ত বোধশক্তি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আমার মনে হইল আমি যেন বাস্তব জগতে নাই—কোন দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি।

অনুকূলবাবু জড়িত কণ্ঠে বলিল—বসে কেন শুয়ে পড়ুন। কোন ভয় নাই। মাতাল হলেও জ্ঞান ঠিক আছে। আমি তেমন মাতাল নই যে মদ খেয়েছি বলে জ্ঞান হারা হয়ে যাব। আমি মশায় ভদ্র লোকের ছেলে মদ খেলেও অন্যায় আমার দ্বারা হবে না। এই যে—মদ খেয়ে গৌরীকে কোনদিন একটা কুবাক্যি বলেছি। এই যে কানাই-বাবুর অসুখের জন্য জলের মত টাকা খরচ করছি, কী এত গরজ আমার—তবুও গৌরীকে একটা মন্দ কথা বলিনি। বাড়ীওয়ালী বললে এখন

খরচ কর ও একদিন তোমারই হবে। বাড়ীওয়ালী ভদ্রলোকের ব্যাপাব কী জানবে। আমি পেথম দিনেই গৌরীকে দেখে বুজেছি ও আমারই মত উঁচু বংশের মেয়ে ভাঙ্গবে তবু মোচকাবে না। বলি শুনছেন মশায় আমার কথা ?

উত্তর করিলাম—হ্যাঁ শুনছি বলে যান্।

হ্যাঁ শুনুন ভয় পাবেন না। আমিও ভদ্রলোকের ছেলে তাই সেদিন পিতিজ্ঞে করলুম একে নষ্ট হতে দেব না। তা না হলে মশায় আমি সেদিনই চলে যেতুম। যাব কী ক'রে বাড়ীওয়ালীকে ত বিশ্বাস করা যায় না। আবার কাকে এনে জোটাবে। আব অভাবের তাড়নায় গৌরীকে তাব কাছে হাত পাততে হবে। সবাই ত আর অনুকূল শর্মা নয়, পয়সাটী দিয়ে আপনার জিনিষ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেবে। বলি শুনছেন ?

হ্যাঁ শুনছি আপনি বলুন।

হ্যাঁ ভয় পাবেন না। তা আমি ত পিতিজ্ঞে করেছি আমার দ্বাবা গৌরীর কোন অনিষ্ট হবে না। আমি ত মানুষ বলি মানুষ কিনা আপনিই বলুন ?

হ্যাঁ মানুষ বই কী কে বলছে অপনি মানুষ নয়।

হ্যাঁ ভয় পাবেন না। দেখুন দেখি আপনি ত বলছেন মানুষ কিন্তু গৌরী গেরাহ্যিব মধ্যেই আনে না, মুখ গোমড়া করে থাকে। একদিনও হাসি মুখে কথা বলে না। মদ কী আর সাধ করে খাই মশায়, কবে—ছেড়ে দিতুম—আমিও ভদ্রলোকের ছেলে—আমি কি জানি না ভদ্রলোকের মেয়ের কাছে মদ খেয়ে দাঁড়াতে আছে ?

উত্তর কবিলাম—তবে মদ ছেড়ে দিলেই পারেন।

হ্যাঁ ভয় পাবেন না—আপনি ত বেশ বললেন। মদ খেয়ে তবে

গৌরীর কাছে দাঁড়াতে পাবি নয়ত ওর ত্রিসিমানায় আসে কার বাবার সাধ্যি।

তা আপনার আসবাব দরকাবই বা কী আপনিই যখন বলছেন বৌদি আপনাকে পছন্দ করে না তখন তার আশা ছেড়ে দিলেই পারেন।

তা পারব না। আশা-ফাসা কিছুই নাই। তবে কিনা ভাল লেগেছে তাই ছেড়ে যেতে পারি না। তা মশায় আমার সঙ্গে ভাল মুখে কথা বলতেও কী দোষ আছে?

কেন এই ত বেশ কথা বলল। এমন কী বলল "কেন ভালবাসতে পারব না—অনুকূল বাবু আপনাকে খুব ভালবাসি।"

কোনদিন অমন কথা বলে নাই মশায়। আজ আপনি এসেছেন বলে মনটা ভাল আছে। তাই বোধ হয় মুখের ফাঁকে বেরিয়ে গেছে। আপনি এখানে থাকুন না মশায় তবু যদি মেয়েটার মুখে হাসি ফোটে।

আমি হাসিয়া বলিলাম—বৌদি আমাকে ত তাড়িয়ে দিচ্ছে।

হ্যাঁ তা কিছু আশ্চর্য নয়। মানে এমনটা কেন করে জানেন?

কেন?

এই সব জায়গায় মোটেই ভদ্রলোকের মেয়ের থাকার জায়গা নয়, অভাবি লোকেরা অভাবের তাড়নায় এসে আশ্রয় নেয়, শেষকালে এখানকার বদ্‌মাইসদের খপ্পরে প'ড়ে একদম্ খারাপ হয়ে যায়। তাই গৌরী এইসব জেনে-শুনে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না।

বৌদিব সঙ্গে আপনার আলাপ হলে কী করে।

ঐ বাড়ীওয়ালী আলাপ করিয়ে দিয়েছে। আমিও মশায় ভদ্রলোকের ছেলে—শুনবেন মশায় আমার জীবন বৃত্তান্ত।

অনুকূলবাবুব জীবন বৃত্তান্ত শুনিবার ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া শুনিতে হইল। অনুকুলবাবুর বাবা একজন চরিত্রবান বিত্তশালী

ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নীতি উপদেশ অনুকূলবাবুর জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। অনুকূলবাবু যখন স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে পড়েন তখন তাহার পিতা তাহাকে গীতা ইত্যাদি ধর্ম-পুস্তক পাঠে এবং ব্রাহ্মণজনোচিত সন্ধ্যা-আহ্নিক পূজাপাঠে নিরত ব্যস্ত রাখিতেন। বাহিরের কোন লোকের সহিত মিশিতে দিতেন না। স্ত্রীলোক ত দূরের কথা স্ত্রীলোকের কোন ছবি দেখিলে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিতেন। কঠোর ব্রহ্মচর্যের যত প্রকার বিধি আছে তাহা অনুকূল বাবুকে পালন করিতে হইত। অনুকূলবাবুর জীবন এইসব বিধি নিষেধ পালন করিতে করিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অবশেষে অনুকূলবাবুর সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। অনুকূলবাবুদের বাড়ীতে এক তরুণী ঝি ছিল—যদিও অনুকূলবাবুর তাহার সহিত কথা বলা বা দেখা-সাক্ষাত করার উপায় ছিল না। কিন্তু সেই ঝি বহু আয়াসে অনুকূলবাবুর সহিত দেখা সাক্ষাত করিত। অনুকূলবাবু এই কঠোর জীবন হইতে মুক্তি চাহে। তাই সেই ঝিয়ের কথামত একদিন বাড়ী হইতে নগদ টাকা কড়ি ও বহু অলঙ্কার পত্র চুরি করিয়া ঝিয়ের সহিত অজানা জীবনের সন্ধানে বাহির হয়। বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়া কিছুদিন কলিকাতায় এক ঘর ভাড়া করিয়া উভয়ে বসবাস করিতে লাগিল। একদিন প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিল—যাহার প্ররোচনায় সে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে সেই ঝি অনুকুলবাবুর সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিয়া কোন অজানা পথে চলিয়া গিয়াছে। তারপর সহায় সম্বলহীন অবস্থায় অনুকূলবাবু পথে পথে ঘুরিয়া মুর্গীহাটায় এক ভদ্রলোকের দোকানে কাজ পায়। এরপর অনুকূলবাবুর কথায় বলি—

যার কাছে চাকরি পেলুম মশায় সে একজন বদ্ধ মাতাল। আর মস্ত বড় মনিহারি দোকান, কিন্তু আমাকে দোকানে কাজ

ক'রতে হ'ত না। কেবল তার ফাই ফরমাশ খাটতে হ'ত। এমনি ক'রে তার সঙ্গে থেকে আমিও পুরো মাতাল হ'য়ে গেলুম। তবে তাঁকে ধার্ম্মিক লোক বলতে হবে—আমাকে একদিন বললেন এই অনুকূল নেশা ত ক'রতে শিখলি আমি মরে গেলে কী ক'রে জুটবে শুনি? আমার মুখের ফাঁকে বেরিয়ে গেল—আপনি ধরিয়েছেন আপনিই ব্যবস্থা ক'রে যাবেন। এই কথা শুনে বাবু খুশী হ'য়ে তক্ষুনি বললেন—"বহুৎ আচ্ছা, কাল হ'তেই খুঁজে ছাখ বাজারে কোন ঘর খালি আছে কি না?" ভাগ্যক্রমে তাও জুটে গেল। তারপর সেই ঘরে মনিব তার দোকান হ'তে যাবতীয় মালপত্র দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে বললেন—পরে পশ্চাতে এর দাম শোধ করবি যা এখন দাসত্ব হ'তে তোকে মুক্তি দিলুম। আমি ত বাবুর চাকরি ছাড়তে রাজী নই। বাবু তখন বললেন ভেতরের কথা শোন "আমি আর বেশী দিন বাঁচব না। ডাক্তারে বলেছে আমার লীভার পেকে গেছে। তাই কাল হ'তে হাঁসপাতালে যাব। সেখান হ'তে ফিরি ত তখন আবার আসবি।" তবে ফিরতে আর পারব বলে মনে হয় না।

আমি ত মশায় মনিবের কথা শুনে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলুম। আমার কান্না শুনে তিনি ধমক দিয়ে বললেন—এই কাঁদছিস কী তুনিয়ায় এসেছিস, বেটাছেলে হ'য়ে জন্মেছিস, বেপরোয়া থাকবি। মেয়ে মানুষের মত কাঁদবি না। তারপর তিনি বললেন—ছাখ তুই ভদ্রলোকের ছেলে তোর ব্যাভারে বুঝেছি তাই তোকে তুটো কথা বলে যাচ্ছি সে কথা মান্যি ক'রলে আখেরে আর তোকে কষ্ট পেতে হবে না।—"এই নেশা ক'রে কখনও দোকানে বসবি না আর জোর ক'রে কখনও মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিবি না। নেশা ক'রে দোকানে বসলে দোকান ডুবে যাবে। আর

জোর ক'রে মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিলে চরিত্রি খাবাপ হ'য়ে যাবে। এই দুটো কথা মেনে দেখিস্ তোর জীবনে আর কষ্ট পেতে হবে না। তা মশায় আমি তার কথা বর্ণে বর্ণে মেনে থাকি।"

অনুকূলবাবুর জীবন বৃত্তান্ত শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কেমন একজন নীতিবিদের পুত্র নীতি নিগ্রহে দুর্ণীতির ঘুর্ণাবর্তে পড়িয়া কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে। অনুকূলবাবুর মত কোন লোকের সহিত আমার আজ পর্যন্ত পরিচয় হয় নাই। বস্তিতে বাস করিয়া গিয়াছি কিন্তু বস্তিব নৈতিক জীবনের পরিচয় পাই নাই। বৌদি ও রাধারাণীকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম দরিদ্র লোকেরাই বুঝি এখানে বাস করে কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নহে জীবনেব মূলধনে যাহারা সবচেয়ে দেউলিয়া তাহারাই এখানে আশ্রয় লয়।

অনুকূলবাবু বলিলেন—কী চুপ ক'রে রয়েছেন যে—এখন ভয়টা কেটে গেছে।

কিসের ভয় বলছেন ?

মানে গৌরীর আমি কোন ক্ষতি করব না !

কিন্তু বৌদি কী আপনাকে বিশ্বাস করবেন ?

না তা ক'রবে না, সে আমি জোর ক'রে বলতে পারি। দেখুন না কানাইবাবুকে আমি হাঁসপাতালে দিতে চেয়েছিলুম তা গৌরী কিছুতেই রাজী হ'ল না। কেন রাজী হ'ল না জানেন ?

কেন ?

বলে কি না—'আমাকে দেখবে কে ? আমি কার কাছে থাকব ? এ দিকে যে রোগীব পেটে ক্যানসার হ'য়েছে, এ রোগে কেউ বাঁচে না। যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছিল মশায় তাই ডাক্তারে মর্ফিয়া দিয়ে অজ্ঞান ক'রে রেখেছে। দেখুন না মশায় যে বেহুস হ'য়ে আছে, দুদিন বাদে মারা

যাবে তাকেই আশ্রয় ক'রে ও নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছে। প'ড়েছে আমার পাল্লায় তাই, অন্যের হাতে প'ড়লে—

কানাইদা মারা গেলে বৌদি কী করবেন ?

ঐ ত মুস্কিল হ'য়েছে মশায়। গৌরী আমার কাছে থাকতে রাজী হবে না। অথচ আমিও ত ছাড়তে পারি না। যদি অন্যের খপ্পরে পড়ে

পড়ুক না অন্যের খপ্পরে আপনার কী—ও যখন আপনার কথা কোন দিন শুনবে না।

অনুকূলবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—কী বললেন ছেড়ে দেব ? একটা মেয়ে মানুষের সর্বনাশ হবে তাই জেনে শুনে আমি পুরুষ-মানুষ হ'য়ে—তাই হ'তে দোব ? অনুকূল শর্মা সে লোক নয়।

আর ও যদি আপনার কাছে থাকতে না চায় তখন কী অধিকারে আটকে রাখবেন ?

এইবারে ভাবিয়ে তুলেছেন। আপনি ছেলে মানুষ হ'লেও বুদ্ধি আছে দেখছি। আচ্ছা তা হলে কী করা যায় বলুন দেখি ?

কী আর ক'রবেন ? বৌদিকে আমি যতটুকু জানি ও কারও কথা শুনবে না। আর ওকে ধ'রেও রাখা যাবে না। আর আমার ধারণা হ'চ্ছে ওদের রক্ষা করাও যায় না। আর তাছাড়া আপনার এত গরজই বা কী যখন ও আপনার কথা রাখবে না।

তা যা বলেছেন—তবে মন মানে কই।

বৌদি ঘরে ঢুকিয়া অনুকূলবাবুকে ডাকিল—আসুন আপনার খাবার হ'য়েছে।

অনুকূলবাবু উত্তর করিল—খুব জলদি হ'য়ে গেছে দেখছি—এখনও

যে আমাদের কথা শেষ হয় নাই—আচ্ছা চলুন মাণিকবাবু খেয়েদেয়ে এসে সারা রাত ধ'রে কথা বলা যাবে।

বৌদি বলিল—ওব খাবার করি নি—ও বাজার হ'তে খেয়ে আসুক।

অনুকূলবাবু লজ্জিত কণ্ঠে বলিল—সে কি! বাজার হ'তে খাবে কী, উনি হ'লেন তোমার নিজের লোক আমাকে না খাইয়ে ওকে আগে খাওয়ান উচিৎ।

বৌদি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—কী উচিৎ না উচিৎ আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। আসুন খাবেন আসুন, অনেক রাত হ'য়ে গেছে। তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল—যাও ঠাকুরপো বাজার হ'তে খেয়ে এসগে। বাক্সতে তোমার পয়সা কড়ি যা ছিল সব ঠিক আছে, বের ক'রে নিয়ে যাও।

বৌদির কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। অনুকূলবাবু চিৎকার করিয়া উঠিল—মেয়ে মানুষের আমি ঢের দেমাক দেখেছি। পড়েছে ভাল মানুষের পাল্লায় তাই। আমি না থাকলে কত দেমাক দেখাতে দেখতুম। একটা পয়সার জন্য রাস্তায় দাঁড়াতে হত। অনুকুল শর্মাকে ভাল মানুষ পেয়ে যা খুসী তাই করছ।

বৌদি দীপ্তকণ্ঠে বলিল—খুব হ'য়েছে এখন খাবেন আসুন। চেঁচামেচি করবেন না বস্তিশুদ্ধ লোক আবার জেগে উঠবে।

অনুকুলবাবু আরও জোরে চীৎকার করিয়া বলিল—আলবৎ চেঁচাব একশবার চেঁচাব, আমার পয়সায় আমি খাব দশজনকে খাওয়াব তুমি না খাওয়াবার কে? ওকে খাইয়ে তবে আমি জলগ্রহণ ক'রব।

বৌদি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—না ওর খাওয়া হবে না।

কেন হবে না শুনি?

বৌদি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—অনেক ঋণ জমা হচ্ছে আর ঋণ বাড়াতে চাই না।

অনুকুলবাবু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—ও বুজেছি শুনছেন মশায় আমার পয়সা যতদূর সম্ভব উনি কম খরচ করেন—মানে আমার পয়সা উনি নিজের জন্য একরকম খরচই করেন না। কেবল কানাইবাবুর জন্য যা দরকার হয় তাই চেয়ে নেন। এই সব ছোট লোকদের ঘরে ঘরে জল তুলে মশলা পিষে উনি নিজের খোরাকটা জোগাড় করে নেন। যাক্ এই যে মন কষ্ট দিচ্ছ—আমি যদি বাপের বেটা হই জোর ক'রে বলছি একদিন শর্মার কাছে নিজের জন্যও হাত পাততে হবে। তা যদি না হয় তবে আমি দুবাপের ব্যাটা।

বৌদি ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—খুব হ'য়েছে এখন খাবেন কিনা বলুন ?

কখনও খাব না, আমি তোমার হাতে জলগ্রহণ পর্যন্ত করব না। তোমার মন পাপে ভরা তুমি মানুষকে বিশ্বাস কর না, বাইরে দেখতে তুমি সুন্দর হ'লে কী হবে ভেতরটা তোমার অতি নোংরা।

বৌদি ঠিক তেমনি নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলিল—আজ বুঝি মাত্রা ঠিক রাখতে পারেন নাই। মদ খেয়ে এসে তাই আমার ব্যাখ্যান হচ্ছে এতক্ষণ। কাকে আমি বলতে গেলুম যে আপনার পয়সায় আমি খাব না! আগে মানুষটাকে মরতে দিন তারপর আমাকে নিয়ে যা খুশী ক'রবেন এ কটা দিন সবুর স'চ্ছে না।

বৌদির কথায় আমি মর্মাহত হইলাম। অনুকুল বাবুর এতক্ষণ আমি যা পরিচয় পাইলাম তাহাতে তার উপর শ্রদ্ধায় আমার মন ভরিয়া গেছে। তাই বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলাম—বৌদি কী যা তা বলছ—অনুকুলবাবুর সঙ্গে আলাপ ক'রে যা বুঝলুম তাতে তিনি ত তোমার কোন মন্দ ক'রতে চান না।

বৌদি উত্তেজিত স্বরে বলিল—ভাল মন্দের কথা তুমি কী বুঝবে ঠাকুরপো। মেয়ে মানুষ হলে বুঝতে। অনুকুল বাবুদের সাহায্য নেওয়ার চেয়ে জল তুলে মশলা পিষে খাওয়ার মধ্যে ঢের ইজ্জত আছে।

অনুকুলবাবু উচ্চৈস্বরে বলিল—দেখছেন মাণিকবাবু, যত ইজ্জত ওদের বেলায়। আর আমাকে বেইজ্জত করতে বাধল না। আমি বস্তিশুদ্ধ লোকের কাছে বলে বেড়িয়েছি গৌরীকে আমার নিজের বোনের মত করে পালন করব। এখন যদি আমাকে অবিশ্বাস করে তবে আমার ইজ্জত রইল কোথায়? বস্তিশুদ্ধ লোক যে আমাকে ঠাট্টা টিট্‌কারিতে আর তিষ্ঠুতে দেবে না।

কেনই বা বৌদি অনুকুল বাবুর সহিত মিছামিছি এই সব সামান্য বিষয় লইয়া মনকষ্ট দিতেছে বুঝিতে পারিলাম না। যে অনুকুল বাবুর নাম শুনিয়া ঘৃণা হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাইয়া দেবতা মনে হইল। অনুকুল বাবুর পিতা অনুকুল বাবুকে সার্থক গীতা পড়াইয়াছিলেন। এমন নিষ্কাম সাধনা কে করিতে পারে!

বৌদিকে অনুনয়ের সুরে বলিলাম—বৌদি অনুকুল বাবুর মত লোক এই নোংরা জায়গায় পাওয়া যায় কিনা জানি না। সত্যই যদি এদের মত লোক বস্তিতে থাকে তবে স্বর্গ বস্তিতে নেমে আসবে। আমি বেশ বুঝতে পারছি তোমাদের দুঃখ আমরা কোন দিন ঘোচাতে পারব না। অনুকুল বাবুর মত লোকেই তোমাদের দুঃখ ঘোচাতে পারে। অনুকুলবাবু মানুষ নয় দেবতা। অনুকুল বাবু আমি বৌদির হয়ে মাপ চাচ্ছি—বৌদিকে ক্ষমা করুন।

অনুকুলবাবুর নেশার জড়তা তখনও কাটে নাই—তাই করুণ অথচ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—ক্ষমা! ক্ষমা আমি করলে কী হবে, ওকি ক্ষমার

যুগ্যি মানুষ। এই বলিয়া অনুকূল বাবু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৌদি আর খাবার জন্য অনুরোধ না করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। আমারও সে রাত্রি খাওয়া হইল না। বৌদি কিছু খাইল বলিয়া মনে হইল না। বেশ বুঝিতে পারিলাম মুমূর্ষু স্বামীকে ভরসা করিয়া নিঃসঙ্কোচ চিত্তে ঘুমাইয়া পড়িল। মানস নয়নে দেখিতে পাইলাম কানাইদা সংজ্ঞাহীন হইলেও বৌদিকে যেন জাগ্রত দৃষ্টিতে পাহারা দিতেছে। অনুকুল বাবু বা কেহ তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। স্ত্রীলোকের স্বামী ছাড়া এমন নির্ভয় আশ্রয় স্থল আর কোথায় মিলিবে। শত অনুকুল বাবু সহস্র মাণিক যাহাকে রক্ষা করিতে সাহস পায় না একটা সংজ্ঞাহীন মুমূর্ষু দেহ দিব্য অনায়াসে ঐ অপরূপ লাবণ্যময়ী যুবতীকে যেন সহস্র বাহু দিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছে। এমন কত কথাই সে রাত্রিতে ভাবিয়াছিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই—কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম তাহাও জানি না।

ভোর হইতেই বৌদি আমাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া দিয়া বলিল—আর আমার সঙ্গে বোধ হয় দেখা হবে না। আমি একজনের বাড়িতে কাজ করতে যাই এবং সেখান হ'তে গঙ্গাস্নানে যাই। গঙ্গাস্নানে আমার বিশ্বাস নাই তা ত তুমি জান, তবে তোমার দাদা নিত্য গঙ্গাস্নান করত আমি তার সহধর্মিনী তাই যতদিন বেঁচে আছে ততদিন গঙ্গাজল এনে মাথায় দিই। যদিন বাঁচে তার ধর্ম রক্ষা করে যাই। এই জন্যই ত তোমার দাদা আমাকে বিয়ে করেছিল।

আমি বৌদির কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। ভোরের আধ আলোয় আধ আঁধারে দেখিলাম বৌদির চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিয়াছে। কোনরূপে অশ্রুসম্বরণ করিয়া বলিলাম—বৌদি যদি কোন বিপদে পড় আমাকে জানিও, বল রাগ করে আমায় এতটা পর ক'রে দেবে না?

বৌদি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল—মেয়ে মানুষের আর এর চেয়ে কী বিপদ থাকতে পারে। এ বিপদের পর কারও সাহায্য চাওয়ার দরকার হবে বলে মনে করি না। তবে দরকার হ'লে নিশ্চয়ই জানাব। কিন্তু ঠাকুরপো জানালেই কী পারবে সাহায্য করতে? যাক্ বেলা হ'য়ে যাচ্ছে। মনে দুঃখু কর না, আমার কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করবে।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলাম—আমাকে তাড়িয়ে না দিলে কী চলছিল না। তোমাকে এত দুঃখের মধ্যে কী ক'রে রেখে যাই বল ত?

বৌদি কাতর কণ্ঠে বলিল—না না তোমাকে যেতেই হবে। আমার কোন দুঃখ নাই। তুমি থাকলেই আমার দুঃখ বেড়ে যাবে, সহস্রগুণ বেড়ে যাবে। এই বলিয়া বৌদি দ্রুত গতিতে চলিয়া গেল। বিমূঢ় চিত্তে বৌদির গতিপথে চাহিয়া রহিলাম। আপনার মহিমায় বৌদি ভোরের বাতাসকে মহিমান্বিত করিয়া চলিয়া গেল।

একটা মুটে ডাকিয়া বাক্স ও বিছানা লইয়া হরিশপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। কানাইদা ছোট্ট খাটটিতে সংজ্ঞাহীন দেহে শুইয়া আছে, অনুকুলবাবুর নেশা ছুটিয়াছে কিনা জানিনা তবে অচৈতন্য হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। এই দুইটি সংজ্ঞাহীন মানুষের কাছে বৌদিকে রাখিয়া স্বার্থপরের মত চলিয়া যাইতে মন না চাহিলেও গত্যন্তর ছিল না। বৌদি আমার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। যতটুকু চৈতন্য ছিল তাহাতে এইটুকু বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে আমাকে তাড়াইয়া দিয়া বৌদি নিজেকে কতখানি আঘাত করিল। কেবলমাত্র আমাকে রক্ষা করিতে একজন নারী নিজেকে কতখানি বলি দিতে পারে তাহা সেদিন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। সেদিন আমি যেন আমার সমস্ত সম্পদ গোয়াবাগানে ফেলিয়া আসিয়া দেউলিয়া হইয়া হরিশপুরের পথে যাত্রা করিয়াছিলাম।

৩

মণিকাকে সেচ্ছায় আমি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম। মণিকা আমাকে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। মণিকাকে ত্যাগ করিবার সময় বেদনা বোধ হইলেও কতখানি আঘাত তাহাকে দিয়া আসিয়াছিলাম তখন বুঝি নাই। আজ বুঝিতে পারিলাম মণিকাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কতখানি আঘাত দিয়াছি! বৌদির নিকট থাকিতে মন চাহিয়াছিল, বৌদি একপ্রকার জোর করিয়া আমাকে বিদায় করিয়াছিল। ভালবাসার বেদনার প্রত্যাখ্যান কতখানি দুঃসহ তাহা যে ভালবাসা পাইয়া প্রত্যাখ্যাত না হইয়াছে সে বুঝিতে পারিবে না। বৌদি আমাকে কত গভীর ভাবে ভালবাসিয়াছে যে মণিকার ভালবাসাকেও ছাপাইয়া গেল। তাই মণিকাকে ছাড়িয়া যত না দুঃখ পাইয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ দুঃখ পাইয়াছিলাম বৌদিকে ছাড়িয়া। সেদিন বৌদির নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় মনে হইয়াছিল জীবনের সব কিছু পুঁজি হারাইয়া দেউলিয়া হইয়া চলিয়া যাইতেছি।

মগরা ষ্টেশেনে গাড়ী থামিতেই দেখি গোবর্দ্ধন ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া। গোবর্দ্ধনকে মগরা ষ্টেশনে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। উচ্চৈস্বরে গোবর্দ্ধনকে ডাকিয়া বলিলাম—এই গোবরা এখানে কোথায়? আমার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই গোবর্দ্ধন ছুটিয়া আসিয়া বলিল—আমি তিরপিনী গেছলুম, তুই কোথায় যাচ্ছিস রে মাণকে?

আমি বাড়ী যাচ্ছি।

আমিও ত এই ট্রেনেই যাব

তবে উঠে পড় দেরী কচ্ছিস কেন?

তুই যে দেড়া গাড়ীতে উঠেছিস মাইরী—মানে ইণ্টার কেলাসে

চেপেছিস এদিকে আমাদের যে রয়েল কেলাস। উঠলেই কোম্পানী ধ'রে জেল দিয়ে দিক্‌ আর কী ?

না না জেল দেবে না তুই উঠে পড়, বেশী ভাড়া যেটা সেটা দিয়ে দিলেই হবে।

আমি ত ভাই একা নই আরও লোক র'য়েছে যে ? এই বলিয়া গোবর্দ্ধন প্লাটফরমের একটী স্থান অঙ্গুলি বাড়াইয়া দেখাইয়াদিল। চাহিয়া দেখি গ্রামের সাত আটজন প্রৌঢ়া ও যুবতি মহিলা সেই স্থানে জড় সড় হইয়া বসিয়া আছে। গোবর্দ্ধন বলিল—মানে ওরাও আমার সঙ্গে গঙ্গাচান ক'রতে এসেছে।

বেশত, ওদের মেয়েদের গাড়ীতে তুলে দে।

নেমে এসে তুইও একটু সাহায্য কর না মাইরী। সবাই হাঁড়ি হাঁড়ি গঙ্গা জল আর কাদা নিয়ে এমন মোট করেছে মাইরী যে আগের রেলটাতে লোকে উঠতেই দিলে না। যে গাড়ীতেই উঠতে যাই তেড়ে মারতে আসে। এখন এটাতেও যদি উঠতে না পারি তবে নাকালের একশেষ হতে হবে। টিকিট ক'রে আর একটিও পয়সা নাই কারও হাতে।

আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া গোবর্দ্ধনকে সাহায্য করিতে গেলাম। গাড়ীতে বেশী ভীড় ছিল না। তাহাদিগকে মেয়েদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। গোবর্দ্ধন তাহাদিগকে সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিল—"দেখিস বেণে খুড়ি জানলা দিয়ে যেন মুখ বাড়াস না। সাঁই ক'রে হাওয়াতে টেনে নিয়ে যাবে। এ ত আর গরুর গাড়ী নয় যে ঘটাক্‌ ঘটাক্‌ করে যাবে—এ বাবা কলের গাড়ী সাতদিনের পথ একদিনে চলে যাবে। ত্যাখ—আর সাহেব এসে যদি টিকিট চায় তবে বলিস আমাদের টিকিট গোবর্দ্ধন বাঁড়ুয্যর কাছে আছে। সে দেড়া মাশুলের গাড়ীতে

আছে। আর এই নে খুড়ি আট আনা পয়সা, গঙ্গাজলের দরুন চার আনা পয়সা দিবি তাতেও যদি না শোনে তবে আর চার আনা দিয়ে বলবি—সাহেব এতেই কোন পেকারে পান খেও আমরা গরীব মানুষ আর আমাদের পয়সা কড়ি নাই।

আমি বলিলাম—পয়সা কি জন্য ?

গোবর্দ্ধন বলিল গঙ্গা জল রেলে নিয়ে যেতে দেবে কেন কোম্পানী ? এমনি করে দেশ শুদ্ধ লোকে যদি গঙ্গা জল নিয়ে যায় তবে গঙ্গার জল শুখিয়ে যাবে না ? কিন্তু গঙ্গাজল না হলেও ত চলে না তাই কোম্পানীর লোককে পয়সা দিয়ে লুকিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

তোর মুণ্ডু পয়সা দিয়ে গঙ্গাজল নিয়ে খেতে হয় ?

ওরে ভাই ওসব না বুঝে শুঝে কী বিদেশ বিভূঁয়ে পা বাড়িয়েছি। বেহারী গোঁসাই সব নিখে নিখে দিয়েছে। বলে দিয়েছে যদি আটজন লোক হয় তবে পাঁচখানা টিকিট হলেই চলবে। সাহেব যদি ধরলে তবে আট আনা পান খেতে দিলেই হবে। না ধ'রলে সে আট আনাও বেঁচে গেল। মোট বেশী হলে আরও আট আনা দিতে হবে।

আমি বলিলাম আচ্ছা খুব হয়েছে চ এখুনি গাড়ী ছেড়ে দেবে। গোবর্দ্ধন তাহার সহযাত্রিনীদের আ। একবাব সাবধান করিয়া আমার সহিত আমার গাড়ীতে উঠিল। গোবর্দ্ধন ইণ্টার ক্লাস গাড়ী দেখিয়া খুসী হইয়া বলিল "দেখেছিস মাইরী বেঞ্চিতে গদী এঁটেছে। তাতেই রে ভাই দেডা ভাড়া নেয়। বসে কী আরাম রে মাইরী মানে ঘুম এসে যাচ্ছে।

আমি গোবর্দ্ধনের কথায় হাসিয়া বলিলাম—নে চুপ কর খুব হয়েছে। লোকে শুনতে পাবে।

কেন আমার টিকিট নাই জানতে পারবে নাকি ? তার চেয়ে ভাই ওদের সঙ্গে বসলেই হত।

না না কোন ভয় নাই। তা হটাৎ গঙ্গাস্নানে আসা হয়েছিল কেন শুনি?

সখ করে এসেছিস মনে করছিস—মানে বাবার অস্থি নিয়ে এসেছিনু বাবা রে—মানে আমার বাবা। বাবা মারা গেছে কি না।

সে কী জ্যাঠামশায় মারা গেছেন? কবে—কি হয়েছিল তাঁর?

তা পেরায় মাস পাঁচ ছয় হবে। তা বাবা মারা গেল এতে আশ্চর্যের কিছু নাই। সেত মারা যেতোই। পিসীমাও যে মারা গেছে।

সেকী! পিসীমাও মারা গেছেন'? তাঁর কী হয়েছিল?

বাবার ত গিরিণী হ'য়েছিল, কিন্তু পিসীমার ত অসুখ বিসুখ কিছুই হয় নাই।

তবে তিনি কিসে মারা গেলেন?

সে দুঃখের কথা আর বলিস না ভাই খামকা খামকা গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেল।

গলায় দড়ি দিতে গেল কেন?

বাবা ত অসুখে অনেক দিন থেকেই ভুগছিল। তা সামান্য পেটের অসুখ মনে করে পিসীমা নিজেই টোটাকা টুটকী ক'রছিল। আবার ডাক্তরের পয়সা জোটা চাইত। কিন্তু ভাল হওয়াত দূরের কথা শেষে বাবার হাতের কর ফুলে গেল। তখন পিসীমা বুঝতে পারলে রুগী আর নয়। কর ফুললে রুগী টেকে না তা পিসীমা অনেক দেখেছে। তাই বাজীতপুর হতে কবরেজমশায়কে নিয়ে এলুম। কবিরাজ মশায় দেখে বললে—মানদা-ঠাকরুণ আর হাতি বাঁধলেও রুগীকে বাঁচান যাবে না। এ শুনেই ত পিসীমা পেট চাপড়িয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। পেট চাপড়ায় আর বলে

"এই যে দরিয়া কে দেবে ভরিয়া—ওরে আমাদের পিণ্ডী কে জোগাবে রে—ওরে আমাদের পেটে আগুন লাগুক রে।" তখন কী ছাই জানি যে পিসীমা একটা কাণ্ড করে বসবে। তাহলে কী তাকে কাছ ছাড়া করি। এদিকে বাবা মরমর আমি পড়লুম ফ্যাসাদে, আমি ত আর রুগীকে ছেড়ে উঠতে পারি না। পিসীমা এদিকে কাঁদতে কাঁদতে কোথায় যে গেল তা বুঝতে পারলুম না। শেষে তিন-চার ঘণ্টা পরে পিসীমাকে খুঁজতে যেয়ে দেখি পিসীমা গলায় দড়ি দিয়ে গোয়ালঘরে ঝুলছে।

গোবর্দ্ধনের কথা শুনিয়া হতবাক্ হইয়া গেলাম। মানদা পিসীকে মনে পড়িয়া গেল। কতদিন সে গোবর্দ্ধনের খাওয়া লইয়া গোবর্দ্ধনের বিমাতার সহিত ঝগড়া করিয়াছে—"জীব দিয়াছেন যিনি অহার দিবেন তিনি।" এইরূপ আহার দিবার কর্তার উপর যাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল ভাইয়ের মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া সে যে নিজের আহারের চিন্তায় এমন ব্যাকুল হইবে কে জানিত। যে ভগবান সকল জীবের আহারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন সে ভগবানের উপর মানদা পিসী যে জীবন-সন্ধ্যায় এমন করিয়া বিশ্বাস হারাইয়া পোড়া পেটের জ্বালায় গলায় দড়ি দিবে কে তাহা ভাবিয়াছিল। মানদা পিসীর কাছে শুনিয়াছি—সাত বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, নয় বৎসর বয়সে তাহার স্বামি মারা যান। শ্বশুর থাকিতে স্বামির মৃত্যু হওয়ায় শ্বশুরের সম্পত্তিতে কোন অধিকার না থাকায় বাধ্য হইয়া তাহাকে বাপের বাড়ীতে চলিয়া আসিতে হয়। এ দিকে ভাইয়ের সংসারও স্বচ্ছল নয়। এমনি করিয়া সে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ভাইয়ের বাড়ীতে কাটাইয়াছে। মানদা পিসী প্রায়ই বলিতেন—কখনও সুখের মুখ দেখলুম না রে মাণিক্ কখনও সুখের মুখ দেখলুল না। মনিষ্যী জনম নিলুম তা সুখ কী জিনিষ জানলুম না. বাবা।" আমরাও

দেখিয়াছি মানদা পিসী কখনও পুকুরের ধারে শুশুনি শাক্ তুলিতেছে কখনও একটা শুখনা তালপাতা হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। রাস্তায় কোথাও গোবর পড়িয়া থাকিতে দেখিলে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের পূর্বেই অত্যন্ত তৎপরতার সহিত ছুটিয়া যাইয়া কুড়াইয়া আনিতেছে। তিনি গোবর্দ্ধনকে যে কত গভীর স্নেহ করিতেন তাহা চোখে না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। প্রায়ই দেখিতাম অঞ্চলের প্রান্ত হইতে গের' খুলিয়া দুইটী কাঁচা পেয়ারা অথবা কুল ইসারায় ডাকিয়া গোবর্দ্ধনকে খাইতে বলিতেছে। গোবর্দ্ধন এ সব বস্তু চিরদিনই তাহার পিসীমা অপেক্ষা সংগ্রহ করিতে অধিক পটু তাই খাইতে আগ্রহ প্রকাশ না করিলে পিসীমা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিতেন—নে পোড়ার মুখো পেটে দে—যা পেটে দিবি তাই কাজে লাগবে। কতবার দেখিয়াছি মানদা পিসী নিমন্ত্রণ বাড়ী হইতে নিজের অংশের পায়স এবং সন্দেশ গ্লাসে করিয়া লুকাইয়া আনিয়া পুষ্করিণীর ঘাটে গোবর্দ্ধনকে লুকাইয়া খাওয়াইতেছেন। এমন পরম স্নেহের গোবর্দ্ধনকে রাখিয়া কেবল উদরান্নের জন্য একজন বৃদ্ধা গলায় রজ্জু দিয়া প্রাণত্যাগ করিল কেমন করিয়া বুদ্ধিতে আসিল না।

গোবর্দ্ধন বলিল—তারপর মাইরী কী মুস্কিলে যে পড়লুম, তিনকড়ি গোমস্তা বললে গলায় দড়ি দিয়ে যখন মরেছে তখন পুলিশ-দারোগা ডাকতে হবে। যাক্ ভাগ্যিস গাঁয়ের পাঁচজন লোক ছিল তাই মিটমাট করে দিলে। দুটো গাই বিক্রী করলুম; পিসীমার হাত-বাক্সতে তিনটে টাকা ছিল তাই জমীদার ও তিনকড়ি গোমস্তাকে দিয়ে তবে রেহাই পেলুম। কী করি বামুনের বিধবার লাস ত মুদ্দোফরাসের হাতে দিতে পারি না! পিসীমাকে পুড়িয়ে এলুম এ দিকে দেখি বাবার শ্বাস হচ্ছে সে মাইরী কি বিপদ। হাতে একটী পয়সা নাই আবার পেরাচ্ছিত্তি ক'রতে হবে। ফের দুটো ঘড়া তিনটে থালা বাঁধা দিলুম তবে পেরাচ্ছিত্তির

পয়সা জুটলো। এ দিকে নতুন-মা এমন চেঁচামেচি শুরু করলো যে তা কী বলব। মানে মানুষটাকে আগে মরতে দে তারপর কাঁদিস ? ওমা তারপর শুনি বাবার শোকে কাঁদছে না বাবা নাকি বলেছিল তার যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে তা নতুন মায়ের নামে লিখে দেবে। কিন্তু বাবা যে এমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে মরে যাবে তা নতুন মা জানতে পারে নাই। আমার মাইরী নতুন মায়ের কান্না দেখে এমন রাগ হল যে বললুম—তা কান্না কেন বাবার চেয়ে যদি তোর সম্পত্তিই বড় হল তবে ও সম্পত্তির আমি ভাগ নোব না—যদি নিই ত গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত জানবি। আমি যে ভাই এত বড় দিব্যি করলুম তা নতুন মায়ের বিশ্বাস হল না। চুপ করে থেকে ভেবে বললে দিব্যি আর কে কবে চার কাল পালন ক'রে থাকে—তবে যদি বিষয়টা 'না দাবি' লিখে দাও তবে বিশ্বাস করতে পারি। আমিও বললুম বাবা মারা যাবার তেরাত্তি পেরুতে দোব না। তা ভাই তেরাত্তি পেরুতে দিই নাই; আমার অংশের বিষয় নতুন মাকে লিখে দিয়েছি।

কলির ভীষ্মের দিকে চাহিয়া রহিলাম। গোবর্দ্ধনের পিতার রাজত্ব না থাকুক কয়েক বিঘা জমীর উত্তরাধীকারই বা কয়জন ব্যক্তি ত্যাগ করিতে পারে ?

গোবর্দ্ধনের বক্তব্য শেষ হইলে বলিল—আচ্ছা মাইরী আমার কথাই কেবল হ'ল এবার তোর খবর শুনি ? তুই নাকি ইচ্ছে ক'রে জেল গেছলি। তোর মাকে যে জেল হতে চিঠি দিয়েছিলি তা আমি দেখেছি। আচ্ছা জেল যেয়ে কী হয়রে মাণ্কে ?

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম—কী আর হবে; যা মনে ক'রে জেল গেছলুম জেল যেয়ে দেখলুম তার কিছুই হয় না।

গোবর্দ্ধন সোৎসারে প্রশ্ন করিল—কী মনে করে জেলে

গিয়েছিলি রে? কেউ কী নিজের ইচ্ছেয় ঐ যমপুরীতে পা বাড়ায়?

আমি হাসিয়া বলিলাম—তা যা বলেছিস কেউ নিজের ইচ্ছেয় ওসব জায়গায় পা বাড়ায় না। একরকম বাধ্য হ'য়েই গেছলুম বল্‌তে হবে।

গোবর্দ্ধন বলিল—শুনলুম তুই স্বদেশী কাজ করে জেলে গেছলি—সে কাজে গেলি কেন? যে কাজে জেল হয় সে কাজ কেউ নেয় মাইরী, তুই যে এত লেখা-পড়া শিখলি তুই যে দেখছি আমার চেয়েও বোকা।

জেলে কেন গিয়াছিলাম কী জন্যই বা জেলে যাইবার প্রয়োজন থাকিতে পারে সেই বিষয়ে গোবর্দ্ধনকে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া শুনাইলাম। গোবর্দ্ধন কখনও আনন্দে কখনও বিস্ময়ে চক্ষু-বিস্ফারিত করিয়া আমার কথা শুনিতে লাগিল। তারপর গোর্দ্ধবন উৎফুল্ল স্বরে বলিল—মাণকে জেল হতে চিঠি পেয়ে তোর মায়ের কী কান্না! গাঁ খানার লোক ত কান্না শুনে জড় হয়ে গেল। কেউ বলে চুরি ক'রে জেলে গেছে কেউ বলে বদমাইসী ক'রে জেলে গেছে। কেবল আমি কারও কথা বিশ্বাস করি নাই। আমি বললুম খুড়ি তুই কাঁদিস না। মাণকে লেখাপড়া শিখে যখন জেলে গেছে তখন বুঝেসুঝেই গেছে। নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে। তবে আমার ধারণা হ'য়েছিল আমাদের সেই রেঙ্গুন যাবার মত কোন পিতিজ্ঞে ক'রে জেলে গেছিস; আমি ত জানি তোর গুণের কথা। তবে এটা ভাবি নাই যে তুই দেশের ভালর জন্যে জেলে গেছলি। তবে মাণকে জেলেই যা আর আর যাই কর এ দেশের কেউ ভাল ক'রতে পারবে না।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গোবর্দ্ধনের দিকে চাহিলাম। গোবর্দ্ধন সোৎসাহে বলিতে লাগিল—ঐ যে বিলিতি কাপড় পোড়ানর কথা বলছিস

আমাদের গাঁয়েও ভলেণ্টারী এসেছিল বিলিতি কাপড় পোড়াতে। গোবিন্দপুর বাজিতপুর এই সব গাঁয়ের ছেলেরা ভলেণ্টারীতে যোগ দিয়েছে আমাদের গাঁয়ে এসে তারা মিটিং করতে চাইল তা খোকার বাবা চৌকিদার ডেকে আর নিজের পিয়াদা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে, আর গাঁ শুদ্ধ লোকেও মাইরী খোকার বাবার দিকে। যখন গোটা গাঁয়ের লোক ভাল চায় না তখন এদের ভাল ক'রে কি লাভ! স্বরাজ হ'লে ওদেরও ভ' হবে, না হবে না? তা বুঝবে ওরা?

আমি বলিলাম খোকার বাবা না হয় বাধা দিল—তা তোরা শুনলি কেন?

গোবর্দ্ধন উত্তর করিল—তোর কী, তুই ত বলবি। খোকার বাবার কথায় বাঘে বলদে ঘাস খায় এক সঙ্গে। আমরা কী তাকে এঁটে উঠতে পারি? তবে আমরাও নেহাৎ চুপ ক'রে বসেছিলুম না। একদিন গোপলা, আমি, সজনী, নেপাল এমনি সাত আট জনা মিলে এর তার বাড়ী হ'তে কাপড় চেয়ে এনে রাত্রি বেলায় লুকিয়ে কাঁটাদিঘিতে বিলিতি কাপড় পুড়িয়েছি।

আমি হাসিয়া বলিলাম—গাধা কোথাকার গোপনে বিলাতি কাপড় পোড়ালে স্বদেশী হয় না। এ বুদ্ধিও তোদের নাই। পাঁচ জনের সামনে বুক ফুলিয়ে এ সব কাজ করতে হয়।

গোবর্দ্ধন বোকার মত উত্তর দিল কী জানি ভাই—অতশত বুঝি না। শুনলুম বিলিতি কাপড় পোড়ালে স্বদেশী করা হয়, তা লুকিয়ে পোড়ালে হবে না কেন শুনি?

গোবর্দ্ধনের কথার কী উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। সত্যই যদি বিলিতি বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের মধ্যে স্বাধীনতালাভের উপায়

থাকে, তবে তাহা গোপনে বা প্রকাশ্যে যেমন করিয়া হোক, করিলেই হইল। তবুও নিজের নির্বুদ্ধিতা ঢাকা দিবার জন্য বলিলাম —ওরে বোকা দেখিয়ে পোড়ালে আরও পাঁচজনা পোড়াবে। এই যেমন ভলেণ্টীয়ারদের কথা শুনে বা দেখে তোদের ইচ্ছা গেল।

গোবর্দ্ধনের যুক্তি খণ্ডন করিয়াছি ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম, কিন্তু সে ছাড়িবার পাত্র নহে। সে আর এক প্রশ্ন করিয়া বসিল—আচ্ছা মাইরী কাপড় পোড়ালে ইংরেজ জব্দ কী ক'রে হবে শুনি? এতে-ত বিলিতি কাপড়ের বিক্রী আরও বেড়ে যাবে। কাপড় পরতেই মানুষের কত পয়সা বিলাতে চলে যাচ্ছে বলছিস তারপর যদি স্বদেশী করাবার জন্য পোড়াবার কাপড় লাগে তা হ'লে ত কথাই নাই।

গোবর্দ্ধনের প্রশ্নে আমার স্বদেশী বিদ্যা ভরাডুবি হইবার জো হইল। জেলে বসিয়া অজয়বাবু বা অন্যান্য ছেলেদের নিকট বহু স্বদেশী কথা শিখিয়াছি তাহার কোনটা প্রয়োগ করিলে গোবর্দ্ধন আর আনাড়ির মত প্রশ্ন করিয়া আমাকে কাবু করিতে পারিবে না তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু ঠিক কোন কথাটা প্রয়োগ করা উচিৎ বুঝিতে না পারিয়া বললাম—গান্ধীর নাম শুনেছিস?

গোবর্দ্ধন বলিল—তা শুনি নাই? ভলেণ্টারীদেব মুখে ত তার নাম লেগেই আছে।

খুশী হইয়া বলিলাম—সেই গান্ধীই নিজে বলেছেন বিলিতি কাপড় পোড়াতে।

গোবর্দ্ধন উত্তর করিল—তুই যে বেশ রে মাইরী—গান্ধী বলেছে

ব'লে বিলিতি কাপড় পোড়াতে হবে। এবার যদি বলে ঘরে আগুন দিতে হ'বে, তুই তাই দিবি বল।

আমি রাগিয়া উত্তর দিলাম—তা কথনও বলে এতে যে লোকের ক্ষতি হবে।

আর কাপড়ে আগুন দিলে বুঝি ক্ষতি হয় না মনে করিস। বাবা মারা গেল তা একখানা নতুন কাপড় পরিয়ে শ্মশানে নিয়ে যেতে পারলুম না। পিসীমার জন্য গাঁয়ের মুখ বন্ধ করতে সব খরচ হয়ে গেছে আগে। যে সে নয়রে ভাই—বাবা! অভাবের জন্য তাকে শেষ দিনে একখানা কাপড় দিতে পেলুম না এ দুঃখ আমার মলেও যাবে না। আর তুই বলিস সেই কাপড় পোড়াতে হবে। এ গান্ধী ভাল করছে না তা তুই যাই বল্।

গোবর্দ্ধন মাত্র ফোর্থ ক্লাশ পর্যন্ত পড়িয়াছে। তাও সে কোনদিন ভাল করিয়া লেখা পড়া শেখে নাই। অর্থাৎ ফোর্থ ক্লাসের ছেলের বিদ্যাও যাহার পেটে নাই তাহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে লজ্জা হইল। সেইজন্য তাহার যুক্তিকে খণ্ডন করিবার জন্য উৎসাহ করিয়া বলিলাম ও আর তোর মাথায় ঢুকবে না কেবল জেনে রাখ গরীবের দুঃখ মোচন হবে বলেই তিনি এই সব কাজ আরম্ভ করেছেন।

গোবর্দ্ধন আর আমার কথার প্রতিবাদ না করিয়া বলিল—তাই বল। এ কথা আগে বলতে হয়, এবারে বিলিতি কাপড়ের গুষ্টির শ্রাদ্ধ ক'রে দেব।

গান্ধীজীর খবর গোবর্দ্ধনের নিকট, আমাদেয় হরিশপুরের জনসাধারণের নিকট পৌছিয়া গিয়াছে শুনিয়া আশ্চর্য বোধ হইল। গান্ধীজীকে দেখি নাই তাঁহার নাম শুনিয়াছি মাত্র এবং যেটুকু তাঁহার কাজের পরিচয় পাইয়াছি তাহা যথেষ্ট নয় তবুও যেন এই পরম পুরুষ আমার

সমগ্র সত্তাকে তাঁহার দিকে টানিয়া লইতেছেন। কেন এমনটা হইল বুঝিতে পারিলাম না। এই পরম পুরুষ যেন হাতছানি দিয়া আমায় ডাকিতেছেন—এস ভারতের মুক্তি সাধনায় ঝাঁপাইয়া পড়। ত্রিশ কোটী আর্ত মানব পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা আছে। তাহাদের ক্ষুধার অন্ন নাই, পরিধানের বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ নাই বাসের গৃহ নাই, জ্ঞানের আলো নাই কুসংস্কারের গর্তে পড়িয়া তাহারা হাবুডুবু খাইতেছে এস তাহাদের উদ্ধারে জন্য ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া এস। আমি যা বলি তা শোন, আমি যে পথ বাতলাইয়া দিব সেই পথেই স্বাধীনতা আসিবে। যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে পার তবে তোমাদের যত দুঃখ যত দৈন্য যত বেদনা সব ঘুচিয়া যাইবে।" সেই মহামানবের আহ্বানে আমার মন ঠিক সাড়া দিতে চায় নাই, কিন্তু মণিকা, বৌদি, রাধা, নমিতা, গোবর্দ্ধনের পিসীমা যেন আমাকে ঐ মহামানবের যাত্রাপথে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিতেছে। তাহারা যেন জোট পাকাইয়া বলিতেছে "তুমি যে দুংখ মোচনের ব্রত লইয়াছে তাহা উদযাপনের ঐ একটি মাত্র পথ। যে মহামানব ত্রিশ কোটী আর্তমানবের দুঃখ মোচনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন আমি যদি সেই ব্রত গ্রহণ করি তবে আমি বৌদিদের দুঃখ গোবর্দ্ধনের পিসীমাদের দুঃখের অবসান ঘটাইতে পারিব; এ যেন কে আমার কানে কানে বলিয়া দিতেছে। আমি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি এই একমাত্র পথ। ঐ পথেই আমাকে চলিতে হইবে। তাই গোবর্দ্ধনকে বলিলাম—গোবরা স্বদেশী করতেই হবে, এছাড়া উপায় কিছু নাই।

গোবর্দ্ধন সোৎসাহে বলিল—সে কথা আর দুবার করে বলতে হবে? নইলে খোকার বাবা ঢিট হবে না। আমি একা না বোকা।

তুই যখন এসেছিস তখন স্বদেশী কী করে করতে হয় তা বাজীতপুরের লোকদের দেখিয়ে দেব।

গোবর্দ্ধনের কোন দুঃখ নাই জানিতাম তাই গোবর্দ্ধন আমার ডাকে সাড়া দিবে কিনা সন্দেহ করিতেছিলাম কিন্তু খোকার বাবা তাহাকে মুক্তি সংগ্রামের পথ দেখাইয়া দিয়াছে। তাই সে সাগ্রহে আমার আহ্বানে সাড়া দিল। আমি সেদিন বুঝিয়াছিলাম আর্ত-মানবের মুক্তির ভার আর্তমানবেই গ্রহণ করিবে। এতদিন তাহারা পথের সন্ধান পায় নাই যিনি আজ পথের সন্ধান বলিয়া দিতেছেন সেই মহামানবকে গোয়াবাগানের বস্তি হইতে হরিশপুরের জনসাধারণের পর্যন্ত চিনিতে দেরী হয় নাই।

শুসকরা ষ্টেসেনে গাড়ী থামিতেই গোবর্দ্ধন ব্যস্ত হইয়া নামিয়া পড়িল এবং মেয়েদের কাছে যাইয়া চেঁচামেচী শুরু করিল—নেমে পড় বেগে খুড়ি নেমে পড় সব এখুনি গার্ডসাহেব ফুর্‌র্‌ ক'রে বাঁশী বাজালে আর রক্ষে নাই। একবারে দীল্লি মক্কায় নিয়ে ফেলবে। গোবর্দ্ধনের কথায় এবং চেঁচামেচিতে আমার হাঁসি পাইল। গোবর্দ্ধন এখনও ঠিক আগের মতই আছে। তাহার যে বয়স বাড়িয়াছে এ যেন তাহার অগোচরেই আছে।

আমি বলিলাম—নে নে চেঁচামেচি করতে হবে না; ধীরে সুস্থে নামুক পাঁচমিনিট গাড়ী থামবে। গোবর্দ্ধন পূর্ববৎ ব্যস্ততা দেখাইয়া বলিল—তোর ত ভারী বুদ্ধি দেখছি। এত আর হবি মোড়লের গরুর গাড়ী নয় যে দুদণ্ড দাঁড়তে বললে দাঁড়াবে। এ বাবা কোম্পানীর গাড়ী। আর বেশীক্ষণ দাঁড়ালেই কী চলে ওদের—কতদূর যেতে হবে এখন বল দেখি? নে নে নেমে পড় সব, নয়ত একবারে দিল্লী মক্কা।

৪

গোবৰ্দ্ধন ও আমি বাড়ী পৌছিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। মায়ের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। তাঁহার শরীর আধখানা হইয়া গেছে। আমাদের মাথায় হাত দিয়া মা আশীর্বাদ করিলেন কিন্তু একটী কথাও বলিলেন না। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম মায়ের চক্ষু দুইটী হইতে অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। গোবৰ্দ্ধন মায়ের কান্না দেখিয়া সান্ত্বনা দেবার জন্য বলিল—কাঁদিস না খুড়ি মাণকে যে সে জেল যায় নাই একবারে স্বদেশী জেল। এখন সন্ধ্যেবেলায় শুনবি কী কাণ্ড ক'রে এসেছে। মগরা ইষ্টিসেনে চেয়ে দেখি বাবু গ্যাঁট হ'য়ে দেড়া মাশুলের গাড়ীতে বসে আছে। গুসকরাতে দেখি বাবু হেলে দুলে নামল—গাড়ী ছেড়ে দেবে তা ভ্রুক্ষেপ নাই। আমার দেড়া মাশুলের টিকিট ছিল না। তা সাহেব যখন এসে আমার টিকিট চাইলে তখন মাণকে তাকে এমন ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিলে ব্যাটা একবারে কেঁচোটী হয়ে গেল। মাণকে আমার হয়ে পয়সা দিতে গেল একবারে নট টেকিং উল্টে আবার সাহেব সিগরেট নিয়ে বললে নাও একটা সিগরেট ড্রিঙ্ক কর। আমি মনে মনে হাসছি ব্যাটা সাহেব যত তুম্বি আমাদের কাছে। মাণকে ত সিগরেট খায় না তাই থ্যাঙ্কাইউ বলে ফিরিয়ে দিলে—। আমি তখন মনে মনে ভাবছি বলি সাহেব আমি কী ফল্ট করলুম আমাকে একটা—দাও না তা মাণকের মান রাখবার জন্যে আর বললুম না। তারপর দুজনে ব'সে ইংরেজীতে কথা বার্তা। গাড়ী শুদ্ধ লোক ত হাঁ করে রইল। আমি ইংরেজী বলতে না পারি বুঝতে ত পারি। মাণকের টিকিট লাগে নাই জেলের দারোগা লিখে দিয়েছে যেথা খুশী বিনা পয়সায় যেতে পারবে

সাহেব যখন সেই লেখা দেখে বুঝলে যে ও স্বদেশী করে কাল জেল হ'তে বেরিয়েছে তখন কী খুশী—কেবল বলে 'বড় সৌভাগ্য যে আপনার সহিত আমার পরিচয় হল।" আর তুই কাঁদছিস খুড়ি ওর সঙ্গে আমিও ভলেণ্টারীতে নাম দোব। খোকার বাবা ফাবাকে আর ডরাই না।

গোবর্দ্ধন এক নিঃশ্বাসে রেল ভ্রমণ হইতে আমার জেল যাইবার কাহিনী মাকে বিবৃত করিল। আমিও পরিচয় দিবার দায় হইতে রেহাই পাইলাম। মা গোবর্দ্ধনকে বলিল—বাবা গোবর্দ্ধন তুমিও মাণিকের সঙ্গে এখানে থাবে।

গোবর্দ্ধন হিহি করিয়া হাসিয়া জবাব দিল—শেষকালে তোকেও একঘরে ক'রবে না ত খুড়ি। নেমন্তন্ন করার ঠেলা আছে।

গোবর্দ্ধনের কথা বুঝিতে পারিলাম না তাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিলাম, মা হাসিয়া জবাব দিলেন—ওর কথা আর বলিস না বাবা তোরই ত বন্ধু কারও কথা ত শুনবে না। বামুনের ছেলে হয়ে বাগ্দির ঘরে হ'য়েছে ওর আড্ডা! এইসব অনাছিষ্টি দেখলে কেউ কী সমাজে স্থান দিতে পারে? তুইই বলত?

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল—তুইও কী ঐ কথা বলবি খুড়ী? আমি বাগ্দি ঘরে খাই! কখনও খাই না। আমি কী জানি না—আমি বামুনের ছেলে ওদের হাতে খেলে জাত থাকবে না। আমি ত নিজে হাতে রেঁধে খাই। নিজে জল তুলে নিই ওদের জল পর্যন্ত ছুঁতে দিই না। খোকার বাবা শুধু শুধু এমনটা মিথ্যে রটিয়ে আমাকে একঘ'রে করলে বইত নয়? করুক একঘ'রে আমি ত লোকের ঘরে খাবার জন্যে পাত পেতে ব'সে নাই।

ট্রেনে এবং মায়ের নিকট গোবর্দ্ধনের সহিত জমীদারদের একটা

বিরোধের আভাষ পাইলাম। কারণ জানিতে কৌতুহল হইলেও জিজ্ঞাসা করিলাম না। হরিশপুরে থাকিতে থাকিতে একদিন সব খবরই পাইব বলিয়া আর ঐ প্রসঙ্গ তুলিলাম না। মা ছটুর বাড়ীতে লোক পাঠাইলেন ছটুকে আনিবার জন্য। ছটুকে অনেকদিন দেখি নাই। ছটুকে দেখিবার জন্য মন উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

গোবর্দ্ধন ও আমি একত্রে আহার সমাধা করিয়া উঠিলাম। গোবর্দ্ধন বলিল—চল্ মাণকে বেড়িয়ে আসি। মনটা বেশ ভাল ছিল না তাই জবাব দিলাম—সন্ধ্যে বেলায় আসিস তখন এক সঙ্গে বের হব।

গোবর্দ্ধন তাহার স্বভাবসুলভ নির্বিকার চিত্তে জবাব দিল—আচ্ছা তাই যাস্। তবে সন্ধ্যে বেলায় হয়ত আমার আসা হবে না। নেউকী বুড়ি হয়ত পটল তুলবে আজ। তার তখন সদ্গতি করতে হবে। তবে যদি আজকের দিনটা ভালয় ভালয় কাটে তখন সন্ধ্যে বেলয়ে আসব। তুই এখন ঘুমো।

নিয়োগী গিন্নীর আশঙ্কা জনক অবস্থা শুনিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে গোবর্দ্ধন ওদের মিট্‌মাট্ হল ?

গোবর্দ্ধন বলিল—ক্ষেপেছ খুড়ি ও কখনও মেটে। আমাদের তিনকড়ি দেওয়ান থাকতে মিটবে কিছু ভাবছ ? মিটে ত যেত। নেউকী গিন্নী অর্দ্ধেক জমী গাঁয়ের শিবের নামে লিখে দিতে চেয়েছিল কিন্তু তিনকড়ি তাতে রাজী হল না বলে—সবটা লিখে দিতে হবে। কিন্তু নেউকী বুড়ি খুব শক্ত, তাই শুনে বললে—হাড়ি ডোম চণ্ডালে যদি আমার মড়া ফেলে তাও ভাল কিন্তু বৌকে বঞ্চিত ক'রে সব সম্পত্তি লিখে দিতে পারব না। যতদিন ও বাঁচে ততদিন যেন ও খেয়ে প'রে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে।

ও আমার বেণীর বৌ ও পেটের জন্য কেঁদে বেড়ালে আমার শ্মশানে হাড় কাঁদবে। এর চেয়ে যদি আমার দেহ চিল শুকৃনিতে খায় তাতেও আমার শান্তি আছে।

বেণীর মা নিয়োগী গিন্নীর সৎকার না করিবার ভয় দেখাইয়া তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার কৌশল বুঝিতে দেরী হইল না। বেণী আমাদেরই সমবয়সী বা এক দুবছরের বড় হইবে ইতি মধ্যে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বেণী তাহার দ্বাদশ বৎসরের বালিকা বধূ এবং ষাট বৎসরের বৃদ্ধামাকে কাঁদাইয়া গত বৎসর কলেরায় মারা গিয়াছে। বেণীর মায়ের নামে বেণীর বাবা সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া যখন স্বর্গারোহন করেন তখন বেণীর বয়স মাত্র সাত মাস। আজ বেণীর মা সেই সম্পত্তি পুত্র বধূর নামে লিখিয়া গ্রামের শত্রুতা সাধন করিয়াছে। তিনকড়ি চাটুয্যের অভিমত মেয়ে মানুষের সম্পত্তির মালিকানা বর্তাইতে পারে না। ভাল জমীদার তাই এতদিন এই সম্পত্তি বেণীর মাকে ভোগ করিতে দিয়াছেন অন্য কোন জমীদার হইলে খাস দখল করিত। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি গ্রামের শিবের নামে লিখিয়া দিতে বলিয়া যে মহত্ব দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা হয় না ইত্যাদি। তিনকড়ি নাকি এই বলিয়া শাসাইয়াছে যে—আগে বুড়ি মরুক তাহার পর কেমন ক'রে বেণীর বৌ জমী দখলে রাখে তা দেখে নেবে। এই কথা গোবর্দ্ধন মাকে শুনাইতে লাগিল। বেণীর বৌকে দেখি নাই। তবে ত্রয়োদশ বৎসরের এক বালিকার উপর সমগ্র গ্রামের উদ্যত রোষ কল্পনা করিয়া কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িলামে। মাকে বলিলাম—মা এই সব অবিচার চলতে দেওয়া উচিৎ ?

মা শঙ্কিত কণ্ঠে জবাব দিলেন—কী করব বাবা আমাদের ক্ষমতা কতটুকু ?

মায়ের উত্তর আমার মনে সায় দিল না। প্রদীপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম —এ অবিচার প্রাণ থাকতে হতে দেব না

মা ভীত কণ্ঠে বলিলেন—তুই দুদিনের জন্য এসেছিস বাবা এসব হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়িস না। পারবি না ওদের সঙ্গে বিরোধ করতে। তোর বাবা বিরোধকে বড় ভয় করতেন। আমিও বড় ভয় করি, আর তোর সাধ্যই বা কতটুকু যে এর মীমাংসা করবি। এ সব ত আমাদের গ্রামের নিত্য ঘটনা এর কটারই বা প্রতিকায় করতে পারবি তুই ?

মা কথা কয়টি বলিয়া যেন হাঁপাইতে লাগিলেন। ভাবী বিপদের সম্ভবনায় তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডল ভয়ে নীল হইয়া গিয়াছে। আমি মায়ের মুখের চেহারা দেখিয়া কী জবাব দিব ভাবিয়া পাইলাম না। গোবর্দ্ধন বলিল—সে আর উপায় নাই খুড়ী। মাণকে ভলেণ্টারীতে নাম লিখিয়েছে। এ সব কাজ না করলে ভলেণ্টারী কিসের ? এই দায়টা উদ্ধার করে আমিও গান্ধীর কাছে ভলেণ্টারীতে নাম লিখিয়ে আসব। ভলেণ্টারী করা ছাড়া গতি নাই। মাণকে আর তোর কথা শুনবে না। ভলেণ্টারীতে নাম লেখাতে হলে পেথমেই লিখতে হয় মা বাবার কথা একদম শোনবার জো নাই, জীবনে বিয়ে করবার জো নাই, পান বিড়ি কিচ্ছু খাবার জো নাই। এ সব মাণকে নিজে হাতে গান্ধীর কাছে লিখে দিয়ে এসেছে। গোবর্দ্ধন তাহার কল্পনা মত ভলেণ্টিয়ার জীবনের ইতিবৃত্ত শোনাইতে লাগিল। গোবর্দ্ধনের কল্পনার রাশ একটি মাতৃ হৃদয়কে কিরূপ শঙ্কাকুল করিয়া তুলিতে পারে তাহা বুঝিবার মত ক্ষমতা তাহার ছিল না। আমি মায়ের বেদনা কাতর মুখমণ্ডল দেখিয়া বলিলাম—কি যা তা বলছিস গোবরা—চুপ কর না। আমার কথায় গোবর্দ্ধনের চুপ করা দূরে থাক আরও উল্লসিত হইয়া বলিল—এখন বোঝ ঠেলা তখন

ভলেণ্টারীতে নাম লেখাতে গেছলি যেমন ?—এখন নেউকী বুড়ির গতি করতে হবে, তার জমীর দখল বাজায় রাখতে হবে। এত আর ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া নয় এ হল খোকার বাবা—

গোবর্দ্ধনের ভয় কেবল খোকার বাবাকে—আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম নে নে খোকার বাবার কত বড় মবদ দেখা যাবে। মায়ের দিকে লক্ষ করিয়া বলিলাম—মা তুমি ভেব না। কোনে অন্যায় কাজ করব না জীবনে এ কথা জেনে রেখ—কিন্তু কোন অন্যায়ও সহ্য করব না এতে যে বিপদ হয় হোক্

মা চোখ মুছিয়া জবাব দিলেন—আমার মরার পর যা খুশী করিস আমি দেখতে আস্‌ব না।

আমি হাসিয়া জবাব দিলাম—বাব্বা সে অনেক দেরী। তোমার মরা পর্যন্ত আমার তর সইবে না। তাছাড়া এমন কীর্ত্তি যদি তোমাকেই না দেখাতে পারলুম তবে আর ভলেণ্টীয়ারী ক'রে লাভ কী ? তুমি নিজের চোখে দেখতে পাবে গাঁয়ে অবিচার আর হতে দেব না।

মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ কবিলেন—তা যদি পারিস আমায় চেয়ে আর কেউ সুখী হবে না। তবে বাবা ওরা মোটেই লোক ভাল নয়. কত বকমে যে মানুষের ক্ষতি করতে পারে তার আর ইয়ত্তা নাই। গোবরাকে ত ওরাই পথে বসিয়েছে। ওদের অসাধ্য কিছুই নাই।

আমি মাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলাম— তুমি ভেব না মা খোকাব বাবার চেয়ে আমার ঢের বড় লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে। আমি বিপদে পড়লে তারা ঝাঁপিয়ে প'ড়বে। নমিতাদের কথা মনে হইয়া গেল। বেণীর বৌকে যদি তার নেয্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে নমিতাদের অর্থের সার্থকতা কী ? মা কিছুটা আশ্বস্ত হইলেন। আমি দিবা নিদ্রাব আয়োজন কবিয়া একটা বই লইয়া শুইয়া পড়িলাম।

অবিচ্ছিন্ন দুঃখ লইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। বৌদির নিকট হইতে যে বেদনা লইয়া হরিশপুর আসিয়াছিলাম নূতন পরিবেশে আসিয়া সে বেদনা অনেকখানি ভুলিয়া গেলাম। যে নারী তাহার সমস্ত ভালবাসা দিয়া আমাকে ঘেরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল সেই যখন তাহার নিজের দুঃখের দিনে আমাকে হেলায় দূরে ঠেলিয়া দিল, তখন আর কী সান্ত্বনা থাকিতে পারে? এ আঘাত মানুষের হৃদয়ে কতখানি বাজিতে পারে তাহা ঐরূপ ভালবাসা যে না পাইয়াছে সে বুঝিবে কী করিয়া? আমি ভাবিয়াছিলাম এ আঘাত বুঝি সহ্য করিতে পারিব না কিন্তু কী আশ্চর্য গোবরা, বেণীর বৌ, মা এমন করিয়া আমাকে ভুলাইয়া দিবে তাহা মুহূর্তেও ভাবি নাই। এমনি একটী প্রলেপ না থাকিলে মানুষ ক্ষত লইয়া একদিনও বাঁচিতে পারিত না। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। "মাণিক সন্ধ্যে হ'য়ে এল আর কত ঘুমুবি উঠে চা খেয়ে নে।"

ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমগ্র হরিশপুরটা ধুসর পর্দায় কে যেন ঢাকিয়া দিয়াছে। কুক্কুট জননী তাহার শাবকগণকে যেমন দুইটি ডানা দিয়া ঢাকিয়া রাখে তেমনি করিয়া কে যেন কালো পাখার আবরণ দিয়া আমাদের সমগ্র হরিশপুরটাকে পক্ষপুটে ঢাকিয়া দিতেছে। ধরিত্রী জননীর বিরাট একটা ডানার একাংশে বৌদি, রাধা, মণিকা নমিতা সকলে আশ্রয় লইয়াছে, অপর অংশে গোবরা, আমি, বেণীর বৌ, মা পরম নিশ্চিন্ত মনে আশ্রয় লাভ করিয়াছি। যেন কোন শঙ্কা নাই কোন ভাবনা নাই।

মা চা লইয়া হাজির হইলে মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—গোবরাকে এখন কোথায় পাওয়া যায় মা?

মা জবাব দিলেন—কোথায় আবার, বাগ্দিদের কালীবাড়িতে।

চাটুকু শেষ করিয়া গোবরার সন্ধানে বাহির হইলাম। বাগ্দিদের কালীবাড়ি আমার জানাই আছে। তিনদিকে মাটির দেওয়াল, উপরে তালপাতার ছাউনি—একটা বড় রকমের হলঘরের মত বাগ্দিদের কালীবাড়ি। এইখানে তাহাদের বৎসরে একবার কালীপূজা হয়। বাকী সময় তাহাদের গরু ছাগল প্রভৃতি আশ্রয় লাভ করে। কালীবাড়ীতে পৌছিয়া দেখিলাম—গোবর্দ্ধন বেশ জাঁকাইয়া কয়েকজন বাগ্দি, মুচি ও ডোমের মধ্যে বসিয়া আছে। বাগ্দিরা গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে যথেষ্ট দূরত্ব রক্ষা করিয়া ঐ কালীমণ্ডপের মধ্যেই আছে, ডোম আর মুচিরা আছে মণ্ডপের নীচে।

গোবর্দ্ধন আমাকে দেখিয়া খুসী হইয়া বলিল—এসেছিস—এই তোর কথাই হচ্ছিল—এদিকে বলছিলুম মাণকে তেমন নয়, ঠিক আগের মতই মাইডীয়ার আছে আমার—মানে আমরা ঠিক আগের মতই এক কেলাসের ইয়ার আর কী। হলেই বা ভলেণ্টারী আর বি-এ বিদ্বান। তা হলেও এখনও আমার কথা আগের মতই শোনে।

নিমাই বাগ্দি উত্তর করিল—তা শুনতে হবে বই কী আলবৎ শুনতে হবে। আপনি হচ্ছ ওর পরাণের বন্ধু—হলই বা ও জজ মেজিষ্টর। এই যে মাধাইবাবু আর আমি এক বয়সি। আমার বাবা যখন ওদের বাড়ীতে চাকর ছিল তখন মনিববাবুর বাড়ীতে যেয়ে আমিত মাধাইবাবুর সঙ্গেই খেলতুম। এখন যে মাধাইবাবু এত বড চাকরি করে কিন্তু আমার মান্যি গেছে কোথা। সেদিন মাধাইবাবু এল, সন্ধ্যে বেলায় দেখা করতে গেলুম। এত যে লোক বসেছিল তা কাউকে কিছুটি বলে নি যেই আমি গেছি অমনি বললে নিমে এসেছিস—দেত আমার পাটা টিপে ইষ্টিসেন হতে আসতে বড় কষ্ট হয়েছে। হ্যা হ্যা আমি ওনার সঙ্গে একসঙ্গে খেলেছি বলেই ত অতবড় কথাটা বলতে পারলে ?

গৌর বাগ্দি নিমাইয়ের কথা শেষ না হইতেই বলিল—ও আর বেশী কী ক'রেছে। সিদ্ধেশ্বরবাবু আমাকে কত মান্যি করে জানিস্? তাকে ছেলে বেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে কত বিড়ি কিনে খাইয়েছি—মানে তখন ত আমি গরু চরিয়ে তবু দু'চার আনা রোজগার করি, উনি তখন স্কুলে পড়ে পয়সা পাবে কোথায়—তাই আমার কাছে যখন তখন বিড়ি চাইতক্। সেদিন সিধুবাবু সিগরেট খাচ্ছে দেখে বললুম—দাও ত বাবু একটা সিগরেট, আমরা অমন দামী জিনিষ কোথায় পাব। এই শুনে বাবু কী খুশীই হলেন তা কী বোলবোরে নিমে—বাবু মশায় বললে—আবার একটা শুধু শুধু নতুন সিগরেট খরচ করব কেন এই নে আমার পেসাদিটা নে। এই বলে তার নিজের মুখের সিগরেট দিয়ে দিলে—।

খোকা মুচি নীচে হইতে উচ্চৈস্বরে বলিল—ওহে ও গৌর যাই বল ছেলে বেলার ভাবই আলাদা ঐ যে তোমাদের নরেনবাবু উনি যেতক্ ইস্কুলে আর আমি তখন ঢাক বাজান শেখার জন্য গাছ তলায় হাত সাধতুম। তা উনি রোজ ইস্কুলে যাবার সময় আমার ঢাকের কাঠি কেড়ে নিয়ে এক হাত বাজিয়ে তবে যেতক্। সেই থেকে আমরা সাঙ্গাৎ পাতাই। তা ওদের বাড়ীতে ক্রিয়াকাণ্ড হ'লে আমাদের পাড়ার নোক যখন এঁটো পাতা নেবার জন্য ব'সে থাকে তখন নরেনবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যত পাতা আমার ঝুড়িতে দেওয়ায়। আমিও তেমনি ঋণ রাখি না। আমরা ছোট জাত কী দিয়ে শুধবো আরআমিই বা অমনি নোব কেন? তাই নরেনবাবু বাড়ী এলে হাঁসের ডিম, গাছের আম যখন যা পারি তেনাকে দিয়ে আসি। এই সেদিন খুব ভাল বাহারে একজোড়া গামছা বুনে দিয়ে এসেছি। তা পেয়ে তেনার কী খুশী। তখুনি ঠাকুরুণকে ডেকে এক ডালা মুড়ি গুড় জোর ক'রে দিলে আমার আঁচলে আমি নোব না কিন্তু কিছুতেই শুনবে না।

গৌর, নিমাই ও খোকা মুচির কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বন্ধুত্বের বিনিময়ে এতবড় অপমানের কথা আমি আর কখনও শুনি নাই। মানুষের সম্মান বোধ কতখানি নীচে নামিলে এই ধরণের অনুভূতি হয় ভাবিতেও পারিলাম না অথচ ইহারা ইহাকে কিছুই মনে করিতেছে না। আমি যেন এক নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াছি। এই ধরণের কথা-বার্তার সহিত আমি যে পরিচিত নহি তাহা নহে কিন্তু এমন করিয়া ত কোনদিন অর্থবাহির করিবার চেষ্টা করি নাই। কিছুদিন আগে হয়ত খোকামুচির এই কথায় আমার মনে কোনই রেখা পাত করিত না কিন্তু আজ যেন তাহার মুখ নিঃসৃত বাণী চাবুকের মত আমার পিঠে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। আমি উত্তপ্ত কণ্ঠে বলিলাম—কেন তোমরা ভদ্রলোকের বাড়ীতে এঁটো পাতা আনতে যাও। এতে যে তোমাদের কত বড় অপমান তা জান না?

খোকা মুচি উত্তর দেবার আগেই শশ মুচি বলিয়া উঠিল অপমান কেন হ'তে যাবে বাবু আমাদের বাপ ঠাকুদ্দা হ'তে নিয়ে এসেছে। ওতে আমাদের হক্ আছে। তবে বাবু আর পূর্বের মত লোকে পাতে কিছু ফেলে রাখে না যে ছোট লোকেরা পেসাদ পাবে। সব চাকর-বাকরদের জন্য তুলে রেখে শুধু পাতাটাই ফেলে দেয়। খুঁটে খেঁটে খুব কম লক্ষ্মীর দানাই পাওয়া যায়। তাই মাথায় ক'রে মা লক্ষ্মীকে নিয়ে আসি। খোকার কথা বলছ—ওকে একটু তেনারা বেশী চেঁহ করে কিনা তাই পাতের সবটা নিয়ে নেয় না। কিছু প'ড়ে থাকে।

শশধরের কথা আমাব কর্ণে যেন গলিত শীষকের মত প্রবেশ করিয়া গেল। আমি অভিভূতের মত বলিলাম না না এ চলতে পারে

না গোবরা, খানিকটা উচ্ছাসের সহিত বলিতে যাইতেছিলাম "এই সব মূঢ় মূক ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা"—কোনরূপ উচ্ছাস দমন করিয়া বলিলাম—গোবরা এদের জড় ক'রে এখানে কি করিস্ রে।

গোবর্দ্ধন নির্বিকারে চিত্তে মূঢ় হাসিতে জবাব দিল—কী আর ক'রব এদের সব রামায়ণ মহাভারত প'ড়ে শোনাই। এ জন্মত ওদের এমনি ক'রেই কেটে গেল আসছে জন্মে পুণ্য ক'রে যাতে উঁচু জাতে জন্মাতে পারে।

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—কী বললি আসছে জন্মে, কেন এ জন্মে কী ওরা বড় হ'তে পারে না?

গোবর্দ্ধন আমার সমস্ত যুক্তিকে জয় করার তাহার সাবেকি হাসিতে জবাব দিল—কী বলছিস্ মাইরী কত পাপ ক'রলে তবে লোকে ছোট জাতে জন্মায়, এত শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্র বাক্য কী খণ্ডন করা যায়রে—তুই কী শাস্ত্র বাক্য উড়িয়ে দিতে চাস্?

শশধর মুচি আমার দিকে বিদ্রুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গোবর্দ্ধনকে বলিল—দা ঠাকুর আপনি ক্ষেপছ কেন, মানে মাণিক বাবু ইংরাজী প'ড়েছে উনি শাস্ত্র বাক্যর কী অর্থ জানবে শুনি? তাই অমন কথা বলছেক্। আমরা কী জানি না কত পাপে এই ছোট জাতে জন্মাতে হয়। এক মনিষ্যি জন্ম পেতে হলেই আশীনক্ষ যোনী ভেমন ক'রতে হয়, তার উপর বামুন জন্ম হ'ল্ল দুল্লভ জন্ম। বামুন ঘরে জন্মাতে হ'লে কোন না দু আশী নক্ষ যোনি ভেমন ক'রতে হবে?

মতিলাল বাগ্দি অমনি গর্জন করিয়া উঠিল—কী বললি শশ বাহ্মণের ঘরে জন্মাতে হল দু আশী লক্ষ যোনী ভেমন ক'রতে হবে। মানে মুচির ঘরের মুরুখ্যু তুই—তাই এমন কথাটা তোর মুখে এল। ওরে বোকা—বাগ্দি, মুচি, ডোম এরা বামুন হ'য়েছে কখনও শাস্ত্রে আছে

দেখেছিস্। ক্ষত্রিয় বামুন হ'য়েছে বটে। আগে ক্ষত্রিয় জনম নিতে কত আশীজন্ম যায় ত্যাখ, তারপর ও বামুন!

শশমুচি মাথা নাড়া দিয়া মতিলালের কথায় সায় দিয়া বলিল—তা যা বলেছ মতিলাল—সে কী আ'র এ জন্মে হবে—তাকি আর জানি না। তত ভাগ্যি কী আর করেছি।

জন্মবৃত্তান্তের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা লইয়া এ ওর কানে কানে গুঞ্জন ধ্বনি করিতে লাগিল। একজন খুব মৃদু স্বরে গান ধরিল—আশী লক্ষ যোনী ভেমন ক'রে মানব জনম পেয়ছ রে—

আমি গোবর্দ্ধনকে উপহাস করিয়া বলিলাম—এই সবের ক্লাস হয় বুঝি এখানে?

গোবর্দ্ধন বিহ্বল দৃষ্টীতে চাহিয়া বলিল—কেলাস হয় মানে—?

মানে আবার কী—তুই এটাকে ধর্মের স্কুল ক'রেছিস্।

গোবর্দ্ধন দিগন্ত কাঁপাইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল—ইস্কুল কী রে বোকা? এরা সব মুখ্যু শুখ্যু মানুষ লেখা পড়া জানে না তাই মহাভারত রামায়ণ পোড়ে শোনাই

আমি বলিলাম—কেন ওদের ত পড়াতে পারিস এখানে?

গোবর্দ্ধন বোকার মত বলিল—পড়াতে পারিস্ মানে—?

—মানে আবার কী, ওদের ত রাত্রে রাত্রে একটু ক'রে লেখা পড়া শেখাতে পারিস্।

গোবর্দ্ধন আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কী হবে শিখিয়ে শুনি? ওরা কী চাকরি ক'রতে যাবে?

আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম—যদি যায় ত ভালই হবে।

গোবর্দ্ধন বিদ্রুপ করিয়া বলিল—তবে গাঁয়ের গরু বাছুর গুলো তুই চরাবি। জমীগুলো তুই চাষ করবি কী বল্?

গোবর্দ্ধনের যুক্তির কাছে আমি হারিয়া যাইবার জো হইয়াছি তাই জোর করিয়া বলিলাম—বেশ ত তা ক'রতে দোষ কী শুনি ? ধান রোপা, গরু চরান এমন কিছু খারাপ কাজ নয়।

গোবর্দ্ধন টিটকারি দিয়া বলিল তাহলেই হয়েছে আর কী। তুই ধান রুইলে—হলুদ গাছ বেরুবে। তুই হাসালি মাণকে তুই রুইবি ধান ! তোর মাথা খারাপ হল নাকি ?

খোকা বাগ্দি গোবর্দ্ধনের হাসিতে যোগ দিয়া বলিল-কত ধানের কত চাল তা ত মাণিক বাবু জানে না। গরু চরাণই কী সোজা নাকি ? কই আমাদের মনিবের এঁড়ে গরুটার দড়িতে হাত দেবেন চলুন দেখি, তার মূর্ত্তি দেখে তখুনি বাপ্ বাপ ক'রে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

গোবর্দ্ধন এবং তাহার পরিষদ বর্গের গুঞ্জন ধ্বনিতে সভাস্থাল ভরিয়া গেল। ইংরাজী শিক্ষিত অর্বাচীন ছাড়া এমন অসম্ভব কথা কে বলিতে পারে, প্রায় সকলের কণ্ঠেই মৃদুস্বরে সেই সমালোচনা চলিতেছিল। আমি লজ্জায় অপমানে কেমন যেন মুষড়াইয়া পড়িলাম গোবর্দ্ধন আমার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া থাকিবে তাই উচ্চৈস্বরে বলিল—শোন সব ব্যাপার শোন্, মাণকে ভলেণ্টারী হ'য়েছে। আমিও ভলেণ্টারীতে নাম দেব ঠিক ক'রেছি। আর বামুন কায়েত ছাড়া যদি ভলেণ্টারীতে নাম দেওয়া চলে তবে তোদের সবাইকে নাম লেখাতে হবে। হাঁরে মাণকে শূদ্রদের ভলেণ্টারী হওয়া চ'লবে ত ?

কঠিন প্রশ্ন। ইহাদের স্বদেশী করার প্রয়োজন আছে কিনা জানি না কিন্তু কাহাকেও কোন অধিকারে হইতে বঞ্চিত করিবার মত মানসিক অবস্থা তখন আমার ছিল না তাই গোবর্দ্ধনের কথায় জবাব দিলাম—তা চলবে কেন ?

গোবর্দ্ধন মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিল—আচ্ছা মতিলাল ভাল ক'রে শাস্ত্রটাস্ত্র দেখতে হবে—মানে সব কাজে ত আবার, শূদ্রুদের অধিকার নাই। গান্ধীকে চিঠি লেখতে হবে যদি মত পাওয়া যায় তখন সক্কলকে ভলেণ্টারীতে নাম দিতে হবে। একজনও বাদ গেলে চলবে না। চল্ মাণকে নেউকী বুড়ির খববটা নিয়ে আসিগে—।

৬

নিয়োগী গিন্নীর মৃত্যুর পর বেণীর বৌকে লইয়া আমাদের এক সমস্যা হইল। গ্রামের সকলে জমীদারের পক্ষে। জমীদার বলিতেছে—ভাবনা কী বেণীর বৌ আমার এখানে এসে থাকুক। বাহারজুতে থাক্-দাক্। আর তাছাড়া তার যখন কোন অভিভাবক নাই তখন তাকে রক্ষণা-বেক্ষণই বা করবে কে ? বেণীর বৌ ক্ষুদ্র বালিকা কী করা উচিৎ না উচিৎ তাহা বুঝিবার মত বয়স তাহার হয় নাই। তাহার শাশুড়ির জীবদ্দশায় গোবর্দ্ধনকে একমাত্র তাহাদের হিতৈষী লোক বলিয়া চিনিয়াছিল। তাই গোবর্দ্ধন যাহা করিতে বলিবে তাহাই সে করিতে প্রস্তুত। বেণীর মা মৃত্যুর সময় গোবর্দ্ধন বেণীর বৌয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া বলিয়াছিল—গাঁয়ের লোক যখন এক রত্তি মেয়ের মুখের দিকে চাইলে না তখন বাবা তোমাকেই ওর ভার দিয়ে গেলুম। দেখ যেন ওর বিষয় সম্পত্তি থাকতে ওকে ভিক্ষে ক'রে বা দাসীবৃত্তি ক'রে খেতে না হয়।

গোবর্দ্ধন বলিল—বুঝলি মাণকে বেণীর বৌকে খোকার বাবা আপনার ঘরে রাখতে চাইছে কেন জানিস ?

আমি বলিলাম—কেন ?

—মানে ওর সম্পত্তিটা বাগাবে—তারপর বিনা মাইনের ঝি ক'রে রেখে দেবে, এই মতলব।

আমি চিন্তিত হইয়া বলিলাম—মেয়ে-মানুষ, ওকে কী ক'রে রক্ষা করা যায় তা' ত বুঝতে পারছি না।

গোবর্দ্ধনের মাথায় এক বুদ্ধি খেলিয়া গেল। চিরদিনই এইরূপ অবস্থায় তাহার মাথায় বুদ্ধি জোগাইয়া থাকে। গোবর্দ্ধন বলিল—হ্যাঁরে মাণকে তোর নমিতাদি না কী নাম বলছিলি তাকে ব্যাপারটা জানিয়ে চিঠি দে দেখি—নিশ্চয় কোন সুরাহা হবে!

গোবর্দ্ধনের পরামর্শ আমি যুক্তি সঙ্গত মনে করিয়া নমিতাদিকে পত্র দিলাম। নমিতাদির পত্রের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের বাড়ীতে বেণীর বৌকে রাখার ব্যবস্থা করিলাম। মা ইহাতে বেশ প্রসন্ন হইলেন বলিয়া মনে হইল না। আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন—কেন বাবা এ সব ঝঞ্ঝাট ঘাড় পেতে নিচ্ছিস। এ সবের অনেক দায়। জমীদার নিজে যখন ভার নিতে চেয়েছিল তখন তুই এ সব ঝক্কি পেয়াতে গেলি কেন? মায়ের মুখে এমন স্বার্থপরের মত কথা শুনিব আশা করি নাই। মায়ের কথায় বেদনা বোধ করিলাম। মাকে বলিলাম—তুমিই বলত জমীদার বাড়ীতে গেলে ওর ভাল হবে?

মা বিরক্তির স্বরে বলিলেন—ওরে অবুঝ ছেলে—এখানে থাকলেই কী ওর ভাল হবে। কী সাধ্যি তোর যে ওর ভাল করিস, ও যে এখন ভাল মন্দের বার।

মায়ের কণ্ঠেও বৌদির ভাষা। আমি ইহাদের ভাল করিতে পারিব না। আমার ক্ষমতা কত তুচ্ছ। মা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমার কথা ত শুনবি না বাবা, দেখবি ওকে নিয়ে তোকে কী দুর্ভোগই ভুগতে হবে একদিন। আজ আমার কথা শুনলি না একদিন এর জন্য খেদ করতে হবে।" মায়ের বিরক্তির কারণ বুঝিলাম না এবং কেনই বা বেণীর বৌয়ের জন্য আমাকে দুঃখ পাইতে হইবে তাহাও ভাবিয়া পাইলাম না।

কয়েক দিন পড়ে নমিতাদির পত্রের জবাব আসিল—"আমি ও বাবা যাইতেছি সেখানে যাইয়া আপনার লিখিত বালবিধবা মেয়েটিকে লইয়া আসিব। আপনাদের গ্রামে একটি সভার আয়োজন করুন। বাবার ইচ্ছা ঐ স্থানে কোথাও আমাদের আশ্রমের শাখা স্থাপন করা। আপনাকে আশ্রমের ভার লইতে হইবে।"

নমিতাদির পত্রের কথা মাকে বলিলাম—মা বেশ খুশী হইল না। ছটু শশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে তাহাকেও ব্যাপারটা জানাইলাম ছটুও দেখিলাম মায়ের মত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাদের চিন্তার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না।

সন্ধ্যার সময় মা মালা জপ করিতে বসিয়াছেন। ছটু আসিয়া বলিল—দাদা কী করছ কোথাও বেরুবে না কি ?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ বেরুতে হবে—কিছু বলছিস্‌—

ছটু হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ বলছিলুম কী একটা বিয়ে থাওয়া কর—ছটুর কথায় হাসি পাইল একরত্তি মেয়ে যেন একবারে গিন্নী হ'য়ে গেছে। তাই কপট ক্রোধ দেখাইয়া জবাব দিলাম—তোকে আর গিন্নীগিরি ক'রতে হবে না ফাজিল কোথাকার—

ছটু ছাড়িবার পাত্রী নহে তাই সরোষে জবাব দিল—ফাজিলী কী, বিয়ে ক'রতে বলা ফাজিলি নাকি ? বাব্বারে বাবা দাদা যেন কী হ'য়ে ফিরে এসেছে—এই বলিয়া ছটু অভিমান প্রকাশ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

ছটুর অভিমান হইয়াছে দেখিয়া সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলাম—ছটু রাগ করলি বুঝি ? তোকে বিয়ের কথা কে শিখিয়ে দিলে রে—মা বুঝি ?

ছটু হাসিয়া জবাব করিল—মা কেন শিখুতে যাবে ? আমিই বলছি বিয়ে করবে না কেন শুনি ? যে বয়সের যা তাই করতে হয়।

ছটু ঠিক আগের মতই আছে। সব বিষয়েই সে বয়স্কা মেয়েদের মত কথা বলে।

আমি বলিলাম—ছটু তোর ত বিয়ে হয়েছে খুব মজা—না? জানিস তোর চেয়ে বড বড় মেয়েদের সহরে বিয়ে হয় না।

ছটু ঝঙ্কার দিয়া বলিল—বিয়ে হয়েছে তাই জানি, মজাফজা অত জানি না যেমন সব অনাছিষ্টির কথা।

আমি ছটুকে রাগাইবার জন্য বলিলাম—নৃপেন বাবু তোর কেমন যত্ন আত্তি করেরে ছটু—

ছটু মাথা দোলাইয়া সরোষে বলিল—কেমন যত্ন করে আগে বিয়ে কব তখন বুঝতে পারবে। বৌদি এলে তখন এ কথার জবাব দোব। সত্যি দাদা আমাদের গাঁয়ে একটি খুব সুন্দরী মেয়ে আছে। তোমাদের জামাইয়ের ভারি ইচ্ছে যে সেইটি তোমার বৌ হয়। তুমি মত দিলেই সম্বন্ধ করি

ছটুকে হাসিয়া জবাব দিলাম—ও বাবা সুন্দরী বৌ আমি বিয়ে করব না। আমাকে সে গেবাহ্যির মধ্যে আনবে না। তার চেয়ে বরং খুব কালো বৌ একটা দেখিস, আমার যদি পছন্দ হয় তখন না হয় বিয়ে করা যাবে।

ছটু আবার রাগিয়া গেল।—যত সব অনাছিষ্টির কথা। কাল বৌ কে আবাব কবে পছন্দ করে বিয়ে ক'রেছে শুনি?—তাই কাল বৌ দেখতে চাও। বিয়ে করবে না তাই বল আমি যেন কচি খুকী তাই তোমার চাল বুঝতে পারি নি—।

আমি ছটুর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলাম—আহা রাগছিস কেন? কচি খুকী তুই কে বললে তুই হলি আদ্যি কালের বদ্যি বুড়ি তবে কিনা সুন্দরী মেয়ে আমার কপালে টিকবে না, তাই বলছিলুম—। এই বলিয়া হাসিতে লাগিলাম।

ছটু হাসিয়া জবাব দিল—কত যেন সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করছ তাই টিকবে না।

আমিও ছটুর হাসিতে যোগ দিয়া বলিলাম—নাইবা সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করলুম। তবে সুন্দরী মেয়েদের মন আমার জানা আছে। তাদের দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। তাদিকে আমি বিয়ে করতে চাইলে কী হবে, তারা আমাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন?

ছটু মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল—না চাইবে না আবার। তোমার মত পাত্র যেন গড়াগড়ি যাচ্ছে কত। ভাগ্যে থাকলে তবে তোমার মত বর জুটবে।

ও তাই নাকি? আমি এত ভাল বর তাত জানি না। আচ্ছা তোর কথা ভেবে দেখা যাবে, এখন এক কাপ চা ক'রে নিয়ে আর দেখি। আমি বরং ততক্ষণ কেমন মেয়ে বিয়ে করা যাবে একটু ভেবে রাখি।

ছটু চা করিতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে চা লইয়া আসিয়া বলিল বেণীদার বৌকে আমাদের গাঁয়ের লোক কী বলছে জান দাদা?

আমি গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলাম—হ্যাঁ জানি।

ছটু চাপা গলায় বলিল—সেই জন্যই ত তোমার বিয়ে করা দরকার তা হলে আর কিছু না হোক গাঁয়ের লোকের মুখ বন্ধ হবে।

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—ছটু—

ছটু আদ্র কণ্ঠে ললিল—তুমি রাগ করবে জানি। এদিকে মায়ের হয়েছে মরণ। ঘাটে পথে বের হতে পারছে না। তিনু গোমস্তার মেয়ে, মাকে পুকুর ঘাটে দেখে বললে—কি গো ছেলের বুঝি বিধবা বিয়ে দেবে। স্বদেশী করা ছেলের ত হামেশাই বিধবা বিয়ে হয়। মা এই সব শুনে কেবলই কাঁদছে আর বলছে, "আমার মরণ হয় কী করে।"

আমি শান্ত কণ্ঠে বললুম ছটু কে কী বলছে ছেড়ে দে। আচ্ছা তুইই

বল ত আমি অন্যায় করেছি কিছু। একটা অসহায় মেয়েকে আশ্রয় দেওয়া কী অন্যায়। আমি আশ্রয় না দিলে বেণীর বৌয়ের কী হত বল দেখি?

আমার কথায় ছটু একটু নরম হইয়া জবাব দিল—সব জানি দাদা কিন্তু আমাদের দেশে ঐসব কে করে বল। তাই ত লোকে কথা বলছে। মেয়েটাকে দেখলে আমরই বুক হা হা করে, এক রত্তি মেয়ে বাকী জীবনটা কী করে কাটাবে তা ভেবে পাই না। রইলই বা আমাদেব ঘরে মায়ের কাছে চিরকাল। তবে পাড়া গাঁয়ের লোকের বড় কথা—তাই মা কাঁদা কাটা করছে।

আমি বলিলাম—বলুক না যার যা খুশী। এই কটা দিন বই ত নয় আসছে রবিবারে নমিতা দি আসছে ওকে নিয়ে যাবার জন্য, আর লোকের কথাকেই যদি ভয় করতে হয় ছটু তবেত মানুষের দুঃখ মোচন করা যাবে না। আমি যে দুঃখ মোচনের ব্রত নিয়েছি ছটু।

ছটু অবাক হইয়া জবাব করিল—কী ব্রত নিয়েছ? পুরুষ মানুষে আবার ব্রত করে নাকি? তোমার মুখে যত সব অনাছিষ্টির কথা, তুমি ব্রত করলে ওর দুঃখ ঘুচবে কী ক'রে শুনি? ওকে ব্রত করতে হবে। তাই ওকে বলছিলুম "সাবিত্রী ব্রত কর এ জন্ম ত গেল আসছে জন্মে যাতে মরা স্বামী ফিরে পাস্," তুমি ওর জন্যে ব্রত করলে ত লোকে আরও কথা কইবে—ছিঃ ছিঃ ওসব কথা মুখে এন না। বেণীদার বৌয়ের দুঃখ মোচন করবার তুমি কে?

ছটুর কথায় স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বৌদির কথায় মর্ম এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম আমি কত অসহায় কত দুর্বল। সামান্য বেণীর বৌয়ের দুঃখ মোচনের ক্ষমতাও আমার নাই। কী করিলে এই সব সমস্যার সমাধান করিতে পারি কে বলিয়া দিবে। গোবর্দ্ধনের এ বিষয়ে কোন চিন্তাই নাই। আমার ঘরে বেণীর বৌকে তুলিয়া দিয়া দিব্য নিশ্চিন্ত

:ন তাহার কাজ করিয়া যাইতেছে। বেণীর বৌয়ের জন্য তাহার কোন
াবনাই নাই এমন কী বেণীর বৌ বলিয়া কেহ আছে এ কথাও যেন
াহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। আর বেণীর বৌয়ের জন্য আমার
ন চিন্তার অন্ত নাই। ছটু ছেলে মানুষ হইলেও ছটুর কথা উড়াইয়া
ওয়া যায় না। বৌদির কথারই সে প্রতিধ্বনি করিতেছে। নমিতাদি
আসা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি বোধ করিতে পারিতেছি না।
:ন মনে বলিলাম গোবরারও ত এই দায় পোয়ান উচিৎ আমি একা
কন? তাই রাগত স্বরে ছটুকে বলিলাম—গোবরাকে ডাকতে পারিস্।
ছ বলিল আর ডাকতে হবে না "গোবরদা অনেকদিন বাঁচবে তুমি।
দ গোবরদা এই তোমরাই খোঁজ করতে দাদা বলছিল।"

গোবর্দ্ধন হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে আর
ঁজ করতে হবে না। আমি আপনি কাম্ ক'রব। নট্ সার্চিং
াট অল্।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলাম—থাম্ থাম্ যত সব ফক্কুড়ি খালি—এই
লিয়া গোবর্দ্ধনকে ধমক্ দিলাম।

গোবর্দ্ধন সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিল—ও বাব্বা এই মাত্র
তনু দেওয়ানের মেয়ের সঙ্গে ফাইট্ ক'রে এলুম আবার তোর সঙ্গে
াইট্ করতে হবে। আজ কার যে মুখ দেখে উঠেছি মাইরী খালি সকাল
তে ফাইট।

আমি রাগত স্বরে বলিলাম—কী হ'ল আবার তিনু চাটুয্যের মেয়ের
ঙ্গে তোর। কেন তার পিছুতে লাগতে গেলি?

গোবর্দ্ধন বলিল—আরে আমি লাগতে যাব কেন? সেই বললে
ট্যারে গোবরা নেউকী বৌয়ের তোরা নাকি বিধবা বিয়ে দিচ্ছিস। তা
ুই বিয়ে করবি, না মাণকে বিয়ে করবে?" তা আমি বললুম—বিয়ে যখন

দোব তখন তোকেও ইনভাইট ক'রব। তোর মত ডুবে ডুবে জল খা
না, যে শিবের বাবাও জানতে পারবে না।

গোবর্দ্ধনের কথাটা কেমন যেন নোংরা শোনাইল। ছটুর দিকে
চাহিয়া বলিলাম—ছটু তুই বাইরে যা।

গোবর্দ্ধন দাঁত বার করিয়া বলিল—ওঃ ছটু বুঝি জানে না ভাবছিস
খোকার সঙ্গে তিনু চাটুয্যের মেয়ের ঘটনার কথা কে না জানে শুনি;
জমিদারের ছেলে ব'লে কেউ কিছু বলে না।

ছটু শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—তুমি কেন ও সব কথা বলতে গেলে
গোবরদা, ওদের কথা বলতে গেলে ওরাও তোমাদিকে বাদ দেবে না।

গোবর্দ্ধন পূর্ব্ববৎ নির্বিকার চিত্তে জবাব দিল—ইস্ বললেই হ'ল
নিজেদের গায়ে গু, নয় ত ওরা এই নিয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে দিত।

আমি বলিলাম—খোকাকে দেখছি না যে কোথায় সে ?

গোবর্দ্ধন বলিল—দেখবি কোথা থেকে বাবুর যে পরীক্ষা। এই নিয়ে
চারবার আই-এ পরীক্ষা হল।

খোকা ত তোকে খুব মানত তাই জানি। তার উপর তোর রাগ
কেন ?

গোবর্দ্ধন বলিল—ওরে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। তার বাবাকে
তবু পারবার যো আছে। কিন্তু ছেলের গুণের আর সীমা নাই।
নে নে আর দেরি করিস না। নমিতাদির আর মোটে আসতে দুদিন
বাকী আছে।—আর শুনেছিস খোকার বাবা পুলিশে খবর দিয়েছে যাতে
এখানে মিটিং না হয়। শুনছি আজ দারোগা আসবে।

উত্তর করিলাম—আসুক দারোগা ভারি ত। চল সব জোগাড় যন্ত্র
করিগে।

দারোগা আসার কথায় কিন্তু গোবর্দ্ধন ভয় পাইয়াছিল। তাই ভী

কণ্ঠে বলিল—তিনু গোমস্তা বলছিল তারা থানায় ডায়রী ক'রেছে যে—গোবরা ও মাণকে মিলে বাগ্দি ও ডোমদের নিয়ে ডাকাতের দল খুলেছে। দ্যাখ দেখি মাইরী এরা কী নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বদেশী ক'রতে দেবে মনে করিস্ ?

গোর্দ্ধনের কথা সত্য—নিশ্চিন্ত ইহারা কোন কাজ করিতে দিবে না তাহা অল্প দিনেই বুঝিয়াছি। তাই কোনরূপে মনে জোর করিয়া বলিলাম—এই সব বাধা ত আসবেই গোবরা, এসব জেনেই একাজে হাত দিয়েছি। ভয় পেলে ত চলবে না।

গোবরা উপহাস করিয়া বলিল—আমি এত ডরাই না। ভয় হয় তোর জন্যে। ব্রাদার-ইন্-ল-দিকে পারা বড় কঠিন। তার উপর তোর মা মাইরী ভারী ভয় পেয়ে গেছে। হয়ত তোর মায়ের জন্যেই স্বদেশী ছাড়তে হবে।

ছটু দারোগার কথায় ভয় পাইয়া বলিল—তাইত দাদা দারোগা ফারোগা এসে তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাবে না ত ?

আমি হাসিয়া বলিলাম—তা ত যেতেই পারে। এখন বুঝছিস্ কেন বিয়ে ক'রতে চাই না। এখন সুন্দরী বৌকে কে দেখে বল্ দেখি।

গোবর্দ্ধন বলিল—ব্রাদার ছটু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি ওয়ান কাপ টি ব্রিং কর দেখি।

গোবর্দ্ধনের ইংরাজী বাক্যে সমস্ত পরিবেশ হাল্কা হইয়া গেল। ছটুও হাসিয়া বলিল—ওঃ বাবু রাজ কার্য ক'রে এলেন এবারে টি ব্রিং কর। তোমার মত ছেলেকে হর্স এগ্ দিতে হয়।

আমরা হাসিতে লাগিলাম। ছটু গোবর্দ্ধনের জন্য চা আনিতে চলিয়া গেল।

জনসেবাই হোক; দেশসেবাই হোক, আর পরের দুঃখ মোচনই হোক

কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে করিবার উপায় নাই। কেন জানি না প্রথম হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত পরের হিত করিবার জন্য যে কাজে হাত দিয়াছি তাহাতেই বাধা পাইয়াছি। যে লোক এক কালে উপদেশ দিয়াছে যে পরের দুঃখে ঝাঁপাইয়া পড় সেই লোকই আবার পরের দুঃখে ঝাঁপাইতে দেখিয়া সর্বাগ্রে বাধা দিয়াছে। অনেকে বলে যাহাদের কোন জ্ঞান বা বুদ্ধি নাই তাহারাই এই গুণের মূল্য বোঝে না। কিন্তু আশ্চর্য সব চেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের নিকট হইতেই বাধা পাইয়াছি বেশী মূক জনসাধারণ হয় নিষ্ক্রিয় হইয়া অসহযোগীতা করে নতুবা তাহারাই সর্বাগ্রে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। যাহাদিগকে আমরা মূর্খ অজ্ঞ এই সব নামে অভিহিত করি তাহারা কখনও কোন ভাল কাজে বাধা দেয় নাই—বরং তাহাদের সহোযোগীতাতেই দেশ সেবার কাজে লাগিয়া থাকিতে পারিয়াছি।

জমীদার বাড়ীর সিপাহি আসিয়া ডাক্ দিল—মাণিকবাবু থানা হ'তে দারোগা এসেছেন আপনাকে ডাকছেন।

দারোগার নামে মায়ের মুখ শুখাইয়া গেল—ভীতকণ্ঠে বলিল—দারোগা এল কেনরে—মাণিক্ ?

ছটু আমার হইয়া জবাব দিল "দারোগা কেন এল তা আর তোমাকে বলে দিতে হবে মা, ঐ-জমীদাররাই ডেকে এনেছে। দাদার খোঁজ করতে হ'লে দারোগা এখানেই ত আসতে পারত।"

ছটুর জবাবে অবাক হইয়া গেলাম। আমাদের হাওয়া কী তবে ছটুর গায়ে লাগিল। মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলাম মা—চুরি ডাকাতি ত আর করিনি যে দারোগা এলে ভয় পাব। তবে যে কাজে নেমেছি তাতে দারোগা পুলিশ মধ্যে মধ্যে খোঁজ নিতে আসবে, এতে ভয় পেলে চলবে না।

জমীদার বাড়ীতে গেলাম। দেখিলাম ইতিমধ্যে গোবর্দ্ধনকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে এবং তাহার উপর নানারূপ ধমক শুরু হইয়া গিয়াছে। গোবর্দ্ধনের সঙ্গে মতিলাল প্রভৃতি বাগ্দিদেরও দুচারজনকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। গোবর্দ্ধন দারোগার ধমকে ও গালাগালিতে হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। আমি উপস্থিত হইতে গোবর্দ্ধন অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। দারোগা আমাকে দেখিয়া খুব গম্ভীর হইয়া বলিল "কী খুব যে স্বদেশী করা হচ্ছে। গাঁয়ের ছোটলোক-দিকে নিয়ে নাকি দল পাকান হচ্ছে। জান ছোকরা এখুনি বি এল কেসে ফেলে তোমাদের দল পাকান ঠাণ্ডা ক'রে দিতে পারি।"

আমি দারোগার কথায় কোন উত্তর দিলাম না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দারোগা বলিয়া যাইতে লাগিল—তুমি নাকি এই বয়সে একটা মেয়ে মানুষ রক্ষিতা রেখেছ—বলি মনে ক'রেছ কী? ইংরেজ রাজত্বে এসব অবিচাব চ'লবে ভেবেছ?

মনে মনে ভাবিলাম দারোগার এ সব কথার উত্তর দেওয়া ঠিক হইবে না। তাই ধীরে ধীরে বলিলাম—দারোগাবাবু আপনি যা খুশী বলতে পারেন বা করতে পারেন—কিন্তু আমার লোক বা আমি আপনার কোন কথার উত্তর দেব না। এমন কী মেরে ফেললেও একটি কথার জবাব পাবেন না।

দারোগা এমন কথা কখনও শোনে নাই। তাই জমীদারকে বলিল—ও মশায় এ যে বিচ্ছু ছেলে, একে ত পেরে ওঠা কঠিন। জমীদার ও দারোগা, তাহার পর আমার ও গোবর্দ্ধনের উপর নানারূপ তর্জন গর্জন শুরু করিল। আমরা পূর্ববৎ নিরুত্তর রহিলাম। কিছুক্ষণ এইরূপ চলিবার পর আমি বলিলাম দারোগাবাবু—আমাদের গ্রেপ্তার করে

থাকেন ত বলুন নতুবা আমরা এখানে আর থাকবার প্রয়োজন মনে করি না।

দারোগাবাবু আমার কথায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। জমীদারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইংরাজীতে যাহা বলিল তাহার মর্ম এই যে "আপনার অনুরোধে ইহাদের শাসন করিতে আসিয়াছি গ্রেপ্তার করা ত আর চলে না। ইহারা যেরূপ একগুঁয়ে ছেলে ইহাদের এইভাবে জব্দ করা যাইবে না।" তারপর দারোগাবাবু গম্ভীর এবং কর্কশ কণ্ঠে বলিল—যাও ছেলে মানুষ বলে ছেড়ে দিলুম—খবরদার এই সব ছোট লোকদের নিয়ে দল পাকাবে না।

আমরা চলিয়া আসিলাম। গোবর্দ্ধন বলিল—মানকে তুই না এলে আমাদিকে মেরে ফেলত মাইরী, বেটা যা তুম্বি আরম্ভ ক'রেছিল।

আমি বলিলাম—তোকে কী সব বলছিল।

ঐ কেবল বলে "আর বাগ্দিপাড়ায় আড্ডা করবি ?"

তুই কী বললি ?

বললুম—না করব না।

কেন অমন কথা বলতে গেলি ?

যা ধমকাচ্ছিল রে মাইরী।

চুপ করে থাকলে দেখতিস কিছু ক'রতে পারত না।

সে ত দেখলুম রে স্বচক্ষে—আর ব্যাটাদের সঙ্গে একদম স্পীকটী নট্। এর পর শর্মাকে কই ক্যাচ করে দেখুক না।

বুঝিলাম গোবর্দ্ধন তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

(৭)

বেণীর বৌকে নমিতাদি ও অজয়বাবু আসিয়া লইয়া গেলেন। দমদমের অনুকরণে একটী আশ্রম করিবার জন্য আমার হাতে কিছু

টাকা দিয়া গেলেন। আমরা বেণীর বাড়িতে আপততঃ আশ্রমের কাজ আরম্ভ করিলাম। অজয়বাবু একজন কর্মী পাঠাইয়া দিলেন। আমরা তাঁহার নির্দেশ মত কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। গ্রামে গ্রামে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিতে এবং চাঁদা আদায় করিতে চতুর্দ্দিকের গ্রামের ছেলেরা সাহায্য করিতে লাগিল। গ্রামের প্রান্তে একটি অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলাম। গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে বাঁশ-খড় সংগ্রহ করা হইল। গোবর্দ্ধন উৎসাহ সহকারে বাগ্দি, ডোম, মুচি দিকে জড় করিয়া তাহাদের দ্বারা বিনা পারিশ্রমিকে মাটির দেওয়াল দেওয়াইয়া প্রকাণ্ড দুইখানি ঘর তৈয়ারী করিল। গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল। অভূতপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে আমাদের আশ্রমের কাজ আগাইয়া যাইতে লাগিল। সহর হইতে কংগ্রেসের নেতারা আসিয়া আমাদের কার্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আশ্রমের কাজে মাতিয়া উঠিল। এই বয়সে এমন একটা বিরাট কাণ্ড করিতে পারিব এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার ও গোবর্দ্ধনের প্রশংসা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে নরনারী আসিয়া আমাদের আশ্রমের কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিল। অল্পদিনেই কঠিন কাজ সোজা হইয়া গেল। আমার উপরে স্কুলের ভার পড়িল। গোবর্দ্ধন চরকা তাঁত ও অন্যান্য সব কাজের ভার লইল। অজয়দার প্রেরিত কর্মী বিভূতি-দা আশ্রমের সকল বিভাগের কর্তা হইয়া আমাদের পরিচালনা করিতে লাগিলেন, আমরা তাঁহার নির্দেশ মত দিবা-রাত্রি এক প্রকার আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দেশের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। কত দূরগ্রাম হইতে আশ্রমের শাখা খুলিবার জন্য আমাদের ডাক আসিল। আমরা যথাসাধ্য আমাদের কর্মের বিস্তার করিতে লাগিলাম।

প্রশংসা ও নিন্দা দুইটি যমজ ভাই। ইহাদের জন্ম একই সঙ্গে হয়

ইহারা একই সঙ্গে লালিত পালিত হয় একই সঙ্গে বাড়িতে থাকে। দেশের লোক যখন আমাদের কাজের প্রশংসায় পঞ্চ মুখ তখন ঠিক তলে তলে অন্তর্মুখী ফল্গুর মত আমাদের বিরুদ্ধে গোপনে সমালোচনা চলিত ছিল। কেহ বলিল আমরা বেণীর বৌকে .কলিকাতায় পাপ ব্যবসা করিবার জন্য চালান করিয়া দিয়াছি। অনেকে এমন কথাও বলিল তাহারা নাকি সচক্ষে বেণীর বৌকে দেখিয়া আসিয়াছে, সবচেয়ে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল তিনকড়ি গোমস্তা ও তাহার মনিব, তাহারা বলিল "এর একটা বিহিত করতেই হবে।"

আমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা অবলম্বন করা কিন্তু সহজ ছিল না। অধিকাংশ গ্রামের লোক তখন আমাদের কাজের প্রশংসা করিতেছে। দেশে যেন নূতন এক বন্যা আসিয়াছে। সেই বন্যার গতিরোধ করিতে পারা সহজ ছিল না তাই আমাদের দু একটা নিন্দাবাদ শোনা ছাড়া আর কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। পূর্ণবেগে আমাদের কাজ চলিতে লাগিল।

মানুষের জীবনে এমন দু একটা ঘটনা ঘটে যাহাকে অত্যাশ্চর্য বস্তুর সহিত তুলনা করা চলে। যে জিনিষ হাহাইয়া গিয়াছে যাহা আর কোন দিন ফিরিয়া আসিবে না, এমনও দেখা যায় সেই হারাণ ধন একান্ত অবহেলার জিনিষের মতই চক্ষু গোচরে আসে। সেদিনের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে—মা আমাকে বলিলেন—ওরে ও মাণিক দু একটা পুরোনো ধুতি থাকলে তোর, কানাইয়ের বৌকে দিতুম। আমার কাপড় সব থান কাপড়। আহা হতভাগীর এই বয়সে সব কিছু গেছে তবু যদি কাপড়েয় উপর একরত্তি নরুনের পাড় রয়েছে তা আর আমি থান কাপড় দিয়ে ঘুচিয়ে দিই কেন! এই বয়সে ছুঁড়ির সব সাধ শেষ হয়ে গেছে। আহা মেয়ের রূপ নয় যেন লক্ষী প্রতিমা—।

আমি তখন দিবানিদ্রা হইতে সবে মাত্র জাগিয়াছি মায়ের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে তোমার লক্ষ্মী প্রতিমা মা ? যার জন্য আমার এমন আরামের ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিলে—এই বলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি বৌদি উঠানে স্তুপীকৃত ধান্যরাশী হইতে ধান্য লইয়া কুলায় করিয়া ধুলা ঝাড়িতেছে।

বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলাম ! কানাইদার বৌ গোয়াবাগান হইতে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল কি করিয়া! বৌদি ক্ষণেকের জন্য আমার দিকে চাহিল তারপরে মাথার কাপড় টানিয়া দিল। আমার সঙ্গে যে তাহার পরিচয় আছে, তাহার ব্যবহারে তাহা মোটেই বোঝা গেল না। মা বলিলেন—এর কথাই বলছিলুব মাণিক তোকে—মৌগাঁয়ের কানাইকে জানতিস্ কি ? সেই যে সাধু হয়ে গেছল। এ হল তার বৌ। কানাই সাধু হয়ে সব সম্পত্তি ভাইপোর নামে লিখে দিয়ে তারপর এমন সোনার চাঁদ মেয়েকে বিয়ে ক'রে পথে বসিয়ে গেছে। ভাচা ভেনে এখন কোন রূপে ওর দিন চলে। অথচ ওর স্বামীর কী না ছিল। আমাদের গাঁয়ে ধান ভাচা দেবার লোকের আভাব বড়, তাই গোবর্দ্ধনকে বলেছিলুম একজন ভাচাতি দেখিস ত ? গোবর্দ্ধন ওকে মৌগাঁ হতে খুঁজে এনেছে। তুই যে বলছিলি এবারে ভাত খুব পরিষ্কার, তা সেই চাল কানাইয়ের বৌ তৈরী করেছে। আমাদের গাঁয়ের ভাচাতির মত ফাঁকি বাজ নয়।

কানাইদার বৌ ধানের ধুলা ঝাড়িয়া যাইতেছে মা কানাইদার বৌয়ের ভাচা ভানার প্রশংসা করিতেছে আর আমি নির্বাক বিস্ময়ে এই অসম্ভব দৃশ্য দেখিতেছি। বুঝিতে পারিলাম কানাইদার মৃত্যুর পর বৌদি তাহার শ্বশুরের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। অনুকুল বাবুকে লইয়া যাহার ঘর বাঁধিবার কথা, সে যে আজ আমারই ঘরে ধানের ভাচা লইতে আসিয়াছে এ কথা

ভাবিতেও পারা যায় না। মায়ের কাছে প্রকাশ করিতে লজ্জা হইল যে ইহাকে আমি চিনি। বৌদি যে আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল তাহাতে বুঝিতে দেরী হইল না যে বৌদিও চায় না যে আমাদের উভয়ের পরিচয় কোন কালে ছিল তাহা প্রকাশ পায়। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বাক্স হইতে আমার একটী মিহি শান্তিপুরে কালাপাড় ধুতি বাহির করিয়া মায়ের হাতে দিয়া বাহির হইয়া গেলাম—

মা উচ্চৈস্বরে ডাকিলেন—"চা খেয়ে গেলি না—মাকে উত্তর দেবার মত শব্দ আমার কণ্ঠে ছিল না। মা পুনরায় বলিলেন—গোবর্দ্ধনকে পাঠিয়ে দিস্ কানাইয়ের বৌকে মৌগাঁয়ে দিয়ে আসবে।

আশ্রমে আসিয়া গোবর্দ্ধনকে বলিলাম—মা তোকে ডাকছে মৌগাঁয়ে যেতে হবে এখুনি। গোবর্দ্ধন আশ্চর্য হইয়া উত্তর করিল—একরাশ ধান এত শীগ্‌গীরি ঝাড়া হয়ে গেল। তাই যে এখুনি যেতে বলেছে। সে আমি ঠিক সময়ে যাব। গোবর্দ্ধনের নিকট বৌদির পূর্ণ সমাচার জানিবার জন্য কৌতুহল হইল কিন্তু পাছে গোবর্দ্ধন সন্দেহ করে তাই নেহাত তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিলাম "তুই এত ঝঞ্ঝাট বাধাতে পারিস্ গোবরা! গাঁয়ে কী ভাচাতি ছিল না কোথা হতে এক রাজরাণী ভাচাতি জুটিয়েছিস তাকে আবার পৌছে দিতে যেতে হবে।"

গোবর্দ্ধন হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল তুই দেখলি বুঝি তাকে। সত্যিই মাইরী রাজরাণীই বটে। অদৃষ্ট খারাপ তাই ভাচা ভান্‌চে। গোবর্দ্ধনের নিকট একে একে সকল কথা জানিয়া লইলাম। গ্রামের মেয়েদের চরকা শিখাইতে যাইয়া গোবর্দ্ধনের সহিত তাহার পরিচয়। কানাইদার দাদার গোয়াল ঘরের পাশে একটি চালা ঘরে বৌদি বাস করে। গোবর্দ্ধনের আদেশ মত বৌদি সূতা কাটে কিন্তু সূতা কাটায় তাহার নাকি আস্থা নাই। গোবর্দ্ধনের সাহায্য ন

লইলে তাহার দিন চলা ভার। অথচ গান্ধীজীর আদেশ না শুনিলে গোবর্দ্ধন তাহাকে সাহায্য করিতে পারিবে না জানিয়া বাধ্য হইয়া সে সূতা কাটে। গোবর্দ্ধন, ধান সিদ্ধ করিবার হাঁড়ি ও জ্বালানি সংগ্রহ করিয়া দেয়। এমনি কত কী প্রয়োজনীয় কাজ তাহাকে করিতে হয়, তাহার এক লম্বা ফিরিস্তি দিল তারপর হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—সাধে চরকা কাটে, না কাটলে এ সব জোগাড় করে দেবে কে শুনি ?

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম—ওঃ তুই না দিলে ওর যেন লোক জুটবে না, লোকের আবার অভাব ?

গোবর্দ্ধনকে প্রশ্ন করিলাম—আচ্ছা গোবরা তোর বৌদি সূতো কেটে কত ক'রে পায় রে।

গোবর্দ্ধন উত্তর করিল—সূতো মন দিয়ে কাটে কী যে পাবে ? গত মাসে একটাকা চৌদ্দ আনা পেয়েছে। তাও আমি এর তার সূতো হিসেবে গরমিল ক'রে ওর নামে জমা করে দিয়েছি তাই।

আমি ক্রোধের ভান করিয়া বলিলাম তুই এমন করিস কেন শুনি ? জানিস এক জনের মেহনত ক'রে কাটা সূতো অপরের নামে জমা করা নীতিবিরুদ্ধ।

গোবর্দ্ধন কাচু মাচু হইয়া জবাব করিল—তা জানব না কেন ? তবে কী জানিস অত নিয়ম ক'রে চললে ঠিক্ ঠিক গরীবের উপকার হয় না।

গরীব মেহনত ক'রবে তার ন্যায্য পয়সা পাবে। ফাঁকি দিয়ে পয়সা নেওয়া চুরির সামিল তা জানিস ?

গোবর্দ্ধন ঠোট উল্টাইয়া জবাব দিল—অত সব জানি না। অমন কড়াকড়ি করলে সে সূতো কাটবে না।

নাইবা কাটল।

না কাটলে আমি কী ক'রে যাব তার কাছে শুনি ?

এমনি যাবি তোকে কেউ ধ'রে রেখেছে ?

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল—তুইযে বুদ্ধিমান রে মাইরী এই সোজা কথাটা বুঝতে পারলি না, বিনা কাজে গেলে লোকে নিন্দে করবে যে।

লোক নিন্দার ভয় যে গোবর্দ্ধনের নাই তাহা আমি জানি, গোবর্দ্দনের মুখে এই নূতন কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। তাই ঠাট্টা করিয়া বলিলাম—তবু ভাল তোর এবার লোক নিন্দের ভয় হয়েছে।

গোবর্দ্ধন তৎপর জবাব করিল—আমার কেন হবে বৌদির নিজের হয়েছে। বৌদি তাইত বলে দিয়েছে—"তোমার চরকা ফরকা কী আছে ঐ নিয়ে এস ঠাকুর পো তা হলে লোকে পাঁচ কথা বলতে পারবে না।"

ক্রোধের ভান করিয়া বলিলাম—ওঃ তুই স্থতোকাটা শেখাবার ভান করে ওখানে যাস, জানিস্ এ রকম মিথ্যাচার করা একজন স্বেচ্ছাসেবকের পক্ষে অন্যায়।

গোবর্দ্ধনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল—অন্যায়টা কোথা শুনি ?

কপট কোপ দেখাইয়া বলিলাম—গান্ধীজী বলেছেন মিথ্যার পথে স্বরাজ লাভ হবে না। যে যথার্থ সত্যাগ্রহী সেই কেবল স্বাধীনতার সৈনিক হ'তে পারে।

গেবর্দ্ধন পুনরায় ভয়ে ভয়ে বলিল—তা একজন ভলেণ্টারী যদি অত নিয়ম না মানে, তাতে স্বরাজ আটকে যাবে বলছিস্ ? তোরা সব এত লোক রয়েছিস্—আমার উপর না হয় অতটা কড়াকড়ি নাই করলি। আমি না গেলে ওর দিন চলা দায় হবে।

তবে সে নিয়ম মত স্থতো কটলেই পারে।

কখন কাটবে শুনি—স্থতো কাটলে ত আর পেট ভরবে না ?

ও তাহলে তুইই ওকে প্রশ্রয় দিয়েছিস্ ?

না না সেই হিসেব ক'রে দেখিয়েছে ওতে পেট ভরে না। তাছাড়া বৌদি বলেছে স্বরাজ হোক আর না হোক তাতে তার কী এসে গেল। তাকে যখন ধান ভেনেই খেতে হবে।

বুঝিলাম—বৌদি তাহার স্বভাব সুলভ যুক্তি তর্কের দ্বারা গোবর্দ্ধনকে বুঝাইয়াছে চরকা কাটিয়া মানুষের পেট ভরে না।

গোবর্দ্ধনকে রহস্য করিয়া বলিলাম—তাই নাকি ? তবে তুই আশ্রমে রয়েছিস্ কেন শুনি ? বেরিয়ে গেলেই পারিস্।

গোবর্দ্ধন নির্বিকার চিত্তে উত্তর করিল—সে তুই আছিস্ তাই আছি, তা না হ'লে এই সব মানুষের কাছে কখনও মানুষ টিক্‌তে পারে ?

গোবর্দ্ধনের মনের কথা আমি জানি না, তা নয়! আমি আছি তাই সে আশ্রমের কাজে নিযুক্ত আছে। আশ্রম চালাইতে হইলে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। নিয়মগুলি অবশ্য আমরাই তৈরী করিয়াছি। কিন্তু হায় তখন কী জানিতাম যে নিয়মের বেড়া সৃষ্টি করিয়া সেই বেড়ার মধ্যে আমাদিকেই ঘুরিয়া মরিতে হইবে। আমাদেরই তৈরী নিয়ম আমাদেরই স্বাধীন সত্তাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। গোবর্দ্ধন আশ্রমে প্রায়ই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে। ঠিক সময় ফিরিতে, ঠিক সময় খাইতে বা ঠিক নিয়মে সে কাজ করিতে পারে না। আমিও নিয়মের বেড়াজাল হইতে পলাইয়া মাঝে মাঝে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি আমার মায়ের কাছে আসিয়া। বিশেষ করিয়া আমার চিরকালের অভ্যাস দিবানিদ্রাটী বাড়িতে আসিয়া সারিয়া যাই। বিভূতি দাদার আদর্শে আমাদের চলিতে হয়। তিনি একজন দমদম্ আশ্রমের শিক্ষাপ্রাপ্ত পাকা স্বদেশ সেবক। আজ একমাস ধরিয়া আশ্রমে লবণ হীণ খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে বিভূতি দা নিয়ম জারি করিয়াছে সব রকম অভ্যাস করা উচিত। স্বেচ্ছা সৈনিকদের কখন কী অবস্থায় পড়িতে হয় ঠিক নাই। গোবর্দ্ধন

কৃচ্ছ্র সাধন করিতে সিদ্ধ হস্ত, কিন্তু আইন মাফিক কৃচ্ছ্র সাধন করিতে সে নারাজ। তাহার ধারণা যখন যেরূপ জুটিবে তখন সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করা এবং ইচ্ছা মত কাজ কর্ম করা উচিত। এই জন্য বিভূতিদা গোবর্দ্ধনকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না। বিভূতিদার নিয়ম শৃঙ্খলা বোধ এত বাড়াবাড়ি ছিল যে আমার জীবনও হাঁপাইয়া উঠিত। কিন্তু সব সময় আমাকে তাহার নিয়ম মত চলিতে হইত না কারণ আমি মধ্যে মধ্যে অশ্রমের বাহিরে ভিন্ন গ্রামে বা সহরে যাইতাম। কেবল মাত্র যখন আশ্রমে থাকিতাম তখনই আশ্রমের নিয়মগুলি নিষ্ঠার সহিত পালন করিতাম। তথাপি আমার মনও বিদ্রোহ করিত, তাই এক একবার বাড়ীর কাজ আছে এই ছুতায় মায়ের কাছে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম। চরণে নূপুর হইয়া যে অলঙ্কার বাজিবে জানিয়া তৈয়ারী করিয়াছিলাম, তখন কী জানিতাম সেই নূপুরই নিগড় হইয়া প্রতিপদক্ষেপ আড়ষ্ট করিয়া দিবে। গোবর্দ্ধন প্রকৃতির সহজাত সন্তান। কোন কিছুর বন্ধনকে সে মানিয়া লইবার পাত্র নয়। আমি আছি তাই সে আশ্রমে আছে নতুবা সে আশ্রম ছাড়িয়া কবে চলিয়া যাইত। গোবর্দ্ধনের মত এতবড় সমব্যথী বন্ধু আর আমার কে আছে।

কানাইদার বৌ অবস্থার বিপাকে পড়িয়া না স্বেচ্ছায় এখানে আসিয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। নিশ্চই যখন সে এখানে আসিয়াছে আমি যে এখানে আছি তাহা সে জানে। বৌদি কেন, আমার নাম জানে না এদেশে খুব কম লোকই আছে। পরিচয় থাকা সত্বেও বৌদি আমার খোঁজ করিল না। অথচ গোবর্দ্ধনকে সে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। জানি গোবর্দ্ধনকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না। যাহারই কোন দুঃখ আছে গোবর্দ্ধনই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে।

হয়ত গোবর্দ্ধনই বৌদিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। তবুও মনটায় একটা অভিমান হইল। আমি কী এমন অপরাধ করিলাম যে আমার সহিত পরিচয় থাকা সত্বেও আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিল না। মৌগ্রাম ও হরিশপুর ত মাত্র আধ মাইল পথের ব্যবধান। বৌদি নিজে না আসিতে পারুক লোক মারফত বা গোবর্দ্ধনের মারফত খবর ত দিতে পারিত। এই সকল কথা মনে হইয়া মন অভিমানে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। হঠাৎ মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—গোবরা তোর বৌদি আমার কথা জানে রে—

গোবরা নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিল—তোর কথা কে জানে না শুনি?

গোবর্দ্ধনের এই কথায় তৃপ্ত হইতে পারিলাম না, সকলের জানার সহিত বৌদির জানা তথাৎ হইবে এ কথা ত গোবর্দ্ধনকে বলা যায় না। তবু ঐ উত্তরটী শুনিবার জন্য বলিলাম—তোর বৌদি আমার কথা কিছু জিগ্যেস করে—

তা আর করে না। একদিন যখন তোর কথা বলছিলুম তখন বৌদি শুনে কত কথাই বললে তুই শুনলে মাইরী চ'টে যাবি।

বৌদির কথা শুনিবার জন্য যেন আমি পাগল হইয়া গিয়াছিলাম—তাই উত্তর করলাম—না না চটব কেন বল্ না কী বলবি।

গোবর্দ্ধন যাহা বলিল তাহার মর্ম এই, বৌদি গোবর্দ্ধনকে বলিয়াছে—তাহার একজন দেবর ছিল—সেও আমারই মত দেশের কাজে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে—দেশের লোকের দুঃখ মোচন করবার ভার নিয়েই নাকি সে ঘর ছেড়েছে—কিন্তু এদিকে যে তার বৌদি একমুঠো ভাতের জন্য কত লোকের দাসীবৃত্তি ক'রে মরছে তা তার দেখবার সময় নাই।

হাসিয়া জবাব দিলাম—দূর বোকা কানাইদার আবার ভাই কোথায় যে স্বদেশী করতে বেরিয়ে যাবে ?

গোবরা বলিল—না না নিজের ভাই নয়—সে কলকাতায় যেখানে চাকরি করত কানাইদাও সেইখানে চাকরি করত। নিজের ভাই হতে যাবে কেন, এই পাতান ঠাকুরপো।

আমি বলিলাম—নিজের ঠাকুরপোই করে না আবার পাতান ঠাকুরপো।

গোবর্দ্ধনকে বোঝান কঠিন। উত্তর করিল—পাতানই বা হ'ল—যে স্বদেশী ক'রতে গেল তা চেনা লোকের সে যদি দুঃখু না ঘোচাতে পারে তবে যাদের চেনে না তাদের জন্যে ছুটে গেল কেন ?

তা কি ক'রে জানব বল গোবরা।

বৌদি কী বলে জানিস্।

কী ?

বলে দুঃখ ঘোচাবার তাদের গরজ ভারী, তারা নাম চায়। বৌদির দুঃখু মোচন করলে কটা লোকই বা জানবে। তাই সে জয়ঢাক পিটিয়ে দুঃখু মোচনের মেলা বসাতে গেছে।

গোবর্দ্ধনের মুখে বৌদির জবাব শুনিয়া মনে হইল কে যেন শাণিত ছুরী লইয়া হৃদয়ে বসাইয়া দিয়াছে। কী তীব্র তার ধার কী গভীর তার মর্মভেদ। জিজ্ঞাসা করিলাম বৌদি আর কী বলে রে গোবরা—

—বলে তোমাদের মাণিকবাবু না কী নাম, ওরা সব ঐ জাত। সুতো কাটার চেয়ে সুতো কাটার জয়ঢাক নিয়ে তারা পিটিয়ে বেড়ায় বেশী। বলে কী জানিস্—বলে "আমি যদি সুতো না কাটি তাতেও কী—তোমাদের খাতায় নাম লেখালেই ত হ'ল।"

ঝাঁ করিয়া মনে পড়িয়া গেল পাঁচশো লোকে চরকা কাটিতেছে অথচ সারা বছরে পঞ্চাশ খানা কাপড়ও হয় নাই। তবুও পাঁচশো লোকে যে চরকা কাটিতেছে এই কথা আমরা খবরে কাগজে বিজ্ঞাপনে ইস্তাহারে উচ্চৈস্বরে জনসাধারণে প্রচার করিতেছি। বৌদি গোবর্দ্ধনকে বলিয়াছে—ওদের কাজের চেয়ে কাজের ভানই বেশী।

গোবর্দ্ধনকে বলিতে পারিলাম না—তোমার বৌদিকে আমি চিনি—তোমার পরিচয়ের বহু পূর্বেই আমার তাহার সহিত পরিচয় আছে। মনের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম—কিসের পরিচয়? যদি পরিচয় হইয়াছে তবে এমন অচেনার ভান কেন? হ্যাঁ পরিচয় ঠিকই ছিল। সভ্যতার আবরণে কলুষ মন লইয়া তাহার সহিত পরিচয় করিতে গিয়াছিলাম। তখন ত জানিতাম না সে পরিচয়ের ভার কত দুর্বহ। পরিচয়ের ফাঁদে বৌদি যখন ধরা দিল—তখনও জানিতাম না, যে জাল ফেলিয়াছিলাম তাহাতে নিজেই জড়াইয়া যাইব। আজ নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়িয়াছি। গোয়াবাগানের হাস্যমুখী রূপসী বৌদির পরিবর্তে দেখি, জীবন যুদ্ধে পর্যুদস্ত সহায় সম্বলহীনা একটি নারী বৌদির মূর্তিতে দেখা দিল। তাহার আশ্রয় চাই একান্ত নির্ভর যোগ্য আশ্রয় চাই যে আশ্রয়ে সে দিন দিন মনোরমার মতই তাহার অনুপম রূপরাশী এবং অসীম গুণরাশী লইয়া একান্ত নির্ভয়ে থাকিতে পারে। কিন্তু হায়! সে আশ্রয় দিবার সাধ্য আমার নাই।

গোবর্দ্ধনকে গম্ভীর স্বরে বলিলাম—তুই আর ওখানে যেতে পাবি না। ওখানে গেলে তুই খারাপ হয়ে যাবি। ও তোকে আশ্রমের কাজ সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়ে তোর মন খারাপ করে দেবে।

গোবর্দ্ধন হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—সত্যি ওর আশ্রম

সম্বন্ধে খুবই ধারণা খারাপ। আমাকে বহুদিন বলেছে "কেন বাজে কাজে জীবনটা দিচ্ছ ঠাকুরপো" মাণিক বাবু দিতে পারে ও বিদ্বান লোক ওর খবরের কাগজে নাম বের হয়। ওকে দেশের লোক কত মানে।"

তা তুই কী উত্তর দিলি—

উত্তর আর কী দোব। বললুম মাণকে ব'লছে তাই করছি। আশ্রম ভাল কী মন্দ অত সব ভেবে দেখি নি। যাই বল্ মাণকে-বৌদি তোকে খুব পছন্দ করে।

গোবর্দ্ধনের কথায় আশ্চর্য হইয়া গেলাম—গোবর্দ্ধন একি কথা বলে! তাই বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কী করে জানলি।

বৌদি আশ্রমের খুঁটি নাটী সব জানতে চায় কিনা তখন তোর কথা খুব আগ্রহের সহিত জিগ্যেস করে। আমি যখন বলি—মাণকে না খেয়ে না দেয়ে কত পরিশ্রম করে তার ঠিকানা নাই। এই সব কথা শুনে বলে—মাণিক বাবুকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পার?

তাতে তুই কী বললি?

বললুম "সে কী দেখা করবে—। সে ত আর গোবরা নয় যে যার তার সঙ্গে দেখা করবে।" হ্যাঁ তবে এ কথাও বললুম "দেখা যে না করবে তা নয়, তবে একটা কারণ ত থাকা চাই।"

তোর বৌদি তা শুনে কী উত্তর করলে—

সে মাইরী তোর শুনে কাজ নাই। বৌদি খুব মজার লোক কিনা কথায় কথায় হাসি ঠাট্টা—

বেশ ত তাই বল্ না কী এমন হাসি ঠাট্টা করে বললে—

সে মাইরী শুনলে তুই বৌদির কাছে যেতে দিবি না।

কেন যেতে দেব না। তুই বলেই দেখ।

বললে মানিকবাবুকে বোলো "আমি দেখতে খুব সুন্দরী" শুধু এই কথা বললেই মাণিকবাবু ছুটে আসবে দরকার থাক্ আর না থাক্।

আমি কপট কোপ করিয়া বলিলাম—তোর বৌদির স্পর্দ্ধা ত কম নয়। এতে আমাকে শুধু অপমান করে নাই তোকে শুদ্ধ করেছে, অথচ তুই তার উপকার করিস্ কত।

আমাকে কী করে অপমান করল শুনি ?

ওরে গাধা এটা বুঝলি না। সে সুন্দরী মেয়ে ব'লে সে মনে করে তার রূপ দেখে সবাই কাজ করে।

গোবর্দ্ধন হি হি করিয়া হাসিয়া জবাব দিল—দূর তা মনে করতে যাবে কেন। তা ছাড়া তার রূপ আছে তার ঘরে আছে আমার কী ?

"আমার কী বই কী"; তুই ত রূপ দেখে সত্যিই ভুলে গেছিস তাই ত অপবের সুতো তার নামে জমা করিস্।

গোবর্দ্ধন আমার কথার ইঙ্গিৎ বুঝিতে পারিল না রাগতস্বরে বলিল—যে সুতো কাটতে পারে না তাকে কী গলায় ফাঁসি দিয়ে কাটাতে হবে।

আমি হাসিয়া বলিলাম—আচ্ছা আচ্ছা রাগ ক'রতে হবে না তোর বৌদির হ'য়ে না হয় আমিই সুতো কেটে দেব। কিন্তু তার আগে তার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।

৮

গোবর্দ্ধনের সহিত একদিন রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি বৌদির সহিত দেখা করিতে গেলাম। গোবর্দ্ধন সমবয়সী হইলেও অনেক

বিষয়ে সে এখনও ছেলে মানুষ আছে। একজন বিধবা যুবতির সহিত আমি যে অত্যন্ত গোপনে রাত্রির অন্ধকারে কেন দেখা করিতে যাইতেছি এ বিষয়ে তাহার কোন কৌতুহলও হইল না। এমন কি ইহার মধ্যে যে অশোভন কিছু থাকিতে পারে তাহাও তাহার মনে হইল না। পরন্তু সে উৎসাহ সহকারে বলিল—"এমন নিয়ে যাব মাণকে তোকে জন মনিষ্যি ত দূরের কথা, পশু পক্ষী পর্যন্ত জানতে পারবে না।" গোবর্দ্ধনের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম। এ যেন এক নূতন অভিজ্ঞতা। সূচিভেদ্য অন্ধকারে গ্রাম্যপথ ছাড়িয়া বিপথে বৌদির সহিত দেখা করিতে যাইতেছি। পথ ধরিয়া চলিলে পাছে কেহ দেখিতে পায় বা জানিতে পারে। কোন কিছু মানুষের মত দেখিলে গোবর্দ্ধন যাইয়া দেখিয়া আসে সে বস্তুটা কী। এমনি করিয়া বহু আয়াসে শঙ্কিত হৃদয়ে মাত্র আধ মাইল পথ দেড় মাইল ঘুরিয়া আমরা কানাইদার ঘরের নিকট আসিয়া পৌছিলাম। কানাইদার গৃহ হইতে সামান্য দূরে একটি ছোট কুঁড়ে ঘরে বৌদি বাস করে। ঘরটি কানাইদাদের গোয়ালের সন্নিকটে। ঐ ঘরে এক সময় একজন কানাইদাদের বাগ্দি চাকর সস্ত্রিক বাস করিত। কানাইদার দাদা দয়া করিয়া এখন ঐ কুঁড়ে ঘরটি বৌদিকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার বিনিময়ে বৌদি গোয়ালের গরুর পরিচর্যা করে। খড় কাটা হইতে গরুর আহার্য দেওয়া প্রভৃতি যত প্রকারের কাজ আছে তাহা করিতে হয়। বিনা বেতনে এমন একটী লোক পাওয়ায় কানাইদার দাদা খুব খুশী, তাই ঐ ঘরে থাকিতে দিতে কোন আপত্তি করে নাই আপত্তি করিবার কারণও কিছু নাই কারণ বৌদির গ্রাসাচ্ছাদনের ভার তাহাকে বহন করিতে হয় না। বৌদি ধান ভানিয়া প্রয়োজন মত এর তার বাড়িতে কাজ করিয়া তাহার জীবিকা অর্জন করে। গোবর্দ্ধন বৌদিব দরজায় ধাক্কা দিল। বৌদি দরজা খুলিয়া দিল। আমি ভয়ে

ভয়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। গোবর্দ্ধন বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল। আমি বলিলাম—গোবরা ভিতরে আয়। গোবর্দ্ধন বাহির হইতে উত্তর দিল—তুই বৌদির সহিত কথা সেরে নে। আমি বাইরে থেকে বরং দেখি যদি কেউ এসে পড়ে। গোবর্দ্ধনের কথায় আমি লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া যাইবার উপক্রম হইলাম। বৌদি দুষ্টুমির স্বরে হাসিয়া বলিল—আমি দরজা বন্ধ করে দিই গোবর ঠাকুরপো, এত রাত্রে দরজা খোলা দেখলে লোকে সন্দেহ ক'রবে, আর তুমি বরং দূর থেকে পাহারা দাও। কাছে পিঠে লোক থাকলে আলো দেখে এ দিকে আসতে পারে। এই বলিয়া সত্যই বৌদি দরজা বন্ধ করিয়া খিল দিল। ভয়ে আমার কণ্ঠ শুখাইয়া গেল। বৌদি যে এমন ছেলেমানুষি করিতে পারে তাহা কল্পনাও করি নাই। এখুনি যদি কেহ আসিয়া পড়ে এই চিন্তায় আমি আকুল হইয়া পড়িলাম—তাই ভীত কণ্ঠে বলিলাম—আজ আর থাক বৌদি আর একদিন আসা যাবে।

বৌদি খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল—সে দিন ত এমনি অবস্থাই হবে তবে আর একদিন কেন?

আমার মনে হইল সহস্র চক্ষু যেন উঁকি মারিয়া বৌদির গৃহ অভ্যন্তরে চাহিয়া আছে। এখুনি একটা উৎকট বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া যাইবে। আমি আর গ্রামে মুখ দেখাইতে পারিব না। রাত্রির গোপন অন্ধকারে আমি একজন তরুণীর গৃহে আসিয়াছি ইহার কীই বা কৈফিয়ৎ দিব। তাই ভীতকণ্ঠে বলিলাম—বৌদি তোমার দুটী পায়ে পড়ি আজকে আমাকে যেতে দাও।

বৌদি উৎকট পরিহাস করিয়া বলিল—কত সাধনায় আজ তোমার দেখা পেয়েছি। আজ কী তোমাকে ছাড়তে পারি চুপ ক'রে ভাল ছেলের মত ব'স তা না হ'লে চেঁচিয়ে গাঁয়ের লোক জড় ক'রব।

বৌদির কথায় আরও ভয় পাইয়া গেলাম। বসিতে পারিলাম না আবার বাহির হইয়া পালাইয়া যাইতে পারিলাম না। বৌদি সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল—ভয় কী, আমি কী আর সত্যিই চেঁচাতে যাচ্ছি—আমারও ত দুর্নামের ভয় আছে।

বৌদির দুর্নামের ভয় থাকিতে পারে এ কথা মনেও স্থান দিই নাই। এতক্ষণে বৌদির কথায় মনে মনে সাহস পাইলাম, দুর্নাম আমার একার হইবে না বৌদিরও হইবে। তবুও যেন তাহাকে পূরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না তাই বলিলাম—আচ্ছা বসছি, কী বলবে বল তাড়াতাড়ি।

বৌদি হাসিয়া বলিল—আমি কী বলব আবার, তুমি দেখা ক'রতে চেয়েছিলে তাই ডেকেছি এখন যা বলার তুমিই ত বলবে।

বৌদির এই কথায় কী জবাব দিব ভাবিয়া পাইলাম না। তবু বলিলাম—তোমার কী কিছুই বলার নাই।

বৌদি বলিল—আজ আমি দেড় বছর হ'ল এখানে এসেছি। আমার কথা থাকলে তোমার কাছে ত আমিই যেতে পারতুম। এখন তোমার কী কথা আছে তাই বল।

কথা আর-ছাই ভস্ম কী বলিব। বৌদিকে দেখিয়া মনে হইতেছে ও সেই রূপকথার রাক্ষসী আমার জীবন কাঠি মরণ কাঠি উহার হাতেই আছে। ইচ্ছা করিলেই ও আমাকে মারিতে পারে বা রাখিতে পারে।

বৌদি হাসিয়া বলিল—কই কথা কচ্ছ না যে। সেদিন তাড়িয়ে দিয়েছিনু বলে রাগ হয়েছে ?

বৌদির কথা শুনিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম তাহা হইলে সেদিনের কথা বৌদির মনে আছে। তবুও কিন্তু কথা বলিতে পারিলাম না আমার কণ্ঠ শুখাইয়া গিয়াছে। বৌদি আমার খুব নিকটে বসিয়া নিম্ন স্বরে বলিল—

আমার কথা সত্যি হল ত। এখন হাতে কলমে দেখিয়ে দিলুম 'বৌদি' হয়েও তোমার সাহায্য নেওয়া যায় না, এখন বল দেখি নেওয়া যায় ?

তখনকার কথা সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। একটু আগে এখানে আসিবার পূর্বেও সেই সব কথা মনে মনে কত বারই না স্মরণ করিয়াছি আর এখানে আসিতে না আসিতেই সেই সকল কথা এমন বাস্তবরূপ লইবে যে তাহা ভাবিতেও পারি নাই। গোয়াবাগানের বৌদি ও মৌগাঁয়ের বৌদি যেন ভিন্ন লোক। একজনকে ত্যাগ করিতে অন্তর হাহাকার করিয়া উঠে আর একজনকে ছাড়িয়া পালাইতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যাই।

বৌদি একবার উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একটী রেকাবিতে করিয়া সামান্য জল খাবার লইয়া আসিল।

আমি বলিলাম—আমি কিছু খেতে পারব না বৌদি—

বৌদি আর্দ্র কণ্ঠে বলিল—খেতে হবে বৈকি ঠাকুর পো। সেদিন না খেতে দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি বলে রাগ হয়েছে। আজ আর অনুকূল বাবুর পয়সার খাবার নয়, এ আমার গতরের মেহনতে হয়েছে। তুমি খেলে আজ আমায় মেহনত করা সার্থক হবে।

বৌদি আবার আগের মত হেঁয়ালী করিয়া কথা বলিতেছে। উত্তর করিলাম—আমি খেলে ত তোমার মেহনত বেড়ে যাবে বৌদি।

তাতেই ত আনন্দ। ভালবাসার জনের জন্য মেহনত করতেই ত আনন্দ। তুমি রোজ আসবে আমি রোজ খাওয়াব এতে আমার কষ্ট হবে না।

বৌদির পরিহাস বুঝিয়া ওঠা ভার। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম—ভারি ত ভালবাসা তোমার, আজ দেড বছর এসেছ তা একটা খবর পর্যন্ত দিতে পার নি। এখন আবার খুব আদিখ্যাতা দেখান হচ্ছে।

বৌদি দুষ্টুমির স্বরে বলিল—খবর দেব কী কত বড় লোক তুমি। খবর দিলেই কী আসতে। মেয়ে মানুষ দেখলে তোমাদের জাত যায়। আমি ত আর তোমার জাত মারতে পারি না। আর তাছাড়া যাবই বা কী ক'রে, তোমার সুনামের বেড়া টপকে যাওয়াও ত সোজা কথা নয়। তাই দূর থেকেই দেখে সুখে আছি।

তবে আজ দেখা করতে দিলে কেন শুনি?

কেন যে দিলাম পরে বলব। তুমি আসতে না চাইলেও গোবর-ঠাকুরপোকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠাতেই হত। যাক্ এখন খেয়ে নাও।

অত খাব না—গোবরাকে ডাকি।

তারও আছে। তাছাড়া সে আসবে না। বোধহয় সে নাই এখানে। তাকে বলে দিয়েছিনু "তোমার মাণিকবাবুকে পৌঁছে দিলেই হবে। তোমার নানা কাজে তোমাকে থাকতে হবে না।"

ভীতকণ্ঠে বলিলাম—গোবরাকে যেতে দিয়েছ কেন এখন কী হবে?

হবে আবার কী ভয় পেলে আমি দাঁড়িয়ে দিয়ে আসব।

খুব হয়েছে তোমাকে দাঁড়াতে হবে না। আমি চললুম।

বেশ যাও আমিও চীৎকার করে লোক জড় করি।

আহা কী যে কর বৌদি—বেশ বসছি কী বলবে বল?

আগে খাও।

আচ্ছা খাচ্ছি কী বলবে এবার বল।

দেশ সেবা কেমন হচ্ছে।

সে তোমাকে কী বলব।

মণিকার খবর কী?

মণিকা! কে সে!

এই অর্পণা যার জন্যে তোমাকে চিঠি দিয়েছিল।

সে চিঠি কোথায় পেলে।

তুমি না হয় জেলে গেছলে—তোমার বাক্স ত জেল যায় নাই।

আমার বাক্স তুমি খুলেছিলে—

আলবাৎ খুলেছি। আপনার লোকের বাক্স খুলব তাতে দোষের কী শুনি ? তা মণিকাকে ভুলে গেছ ?

অত কথার আমি জবাব দিতে পারি না।

আহা দেশ সেবা ক'রতে কতটা মূল্য দিয়েছ তাই জানতে চাচ্ছি।

ওকে তুমি মূল্য বলছ ?

বলব না। যাকে চাও তাকে ত্যাগ করা সোজা কথা ঠাকুর পো ? ঐ জন্যেই ত তোমাকে ভালবাসি।

মণিকাকে আমি ভালবাসি না।

না না গোপন করতে বলছি না। মণিকাসে মণিকার মত ভালবাসো, আমাকে আমার মত ভালবাস।

আমি তোমাকে বা মণিকাকে কাহাকেও ভালবাসি না।

সে আমি জানি। তা না হলে এত দুঃখুও তুমি আমাদের দিতে পার। তা আমাকে ভালবাসলে না হয় তোমার কলঙ্ক হবে কিন্তু মণিকা কি দোষ করলে শুনি ?

আর কিছু কথা আছে, না কেবল এই সবের জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে ?

না না অন্য কথা আছে সে কথা পরে হবে। তা মণিকাকে শাস্তি দিলে কেন ? তাকে বিয়ে ক'রে ত একটা মেয়ের দুঃখু ঘোচাতে পার।

সে কায়েতের মেয়ে।

এইটুকু যদি ভাঙতে না পারলে তবে কিসের দেশ সেবা।

মণিকাকে বিয়ে করলে তোমার কী লাভ শুনি ?

লাভ ! লাভ নয় ঠাকুরপো। একটা মানুষেরও যদি হৃদয়ের আগুন নিভোতে পার তার চেয়ে আর বেশী লাভ কী চাই।

মণিকার বিয়ে হয়ে গেছে।

কে বললে ?

আমাদের বাড়ীতে তার বাবা বিয়ের সময় নিমন্ত্রণ ক'রেছিল।

তারপর !

তারপর আর খবর জানি না।

তা হলে ভালবাসার সেখানেই শেষ—কী বল ?

তা জানি না।

তুমি তাকে ভুলতে পেরেছ ?

কবে ভুলে গেছি।

কে ভুলিয়ে দিলে।

সে কী আর তোমার জানতে বাকী আছে—বৌদি ?

থামো থামো অত সোজা করে দিও না কথাটাকে। আমাকে পেয়ে যদি মণিকাকে ভুলে যাও তবে আবার কাউকে পেলে আমাকে ভুলতে দেরী লাগবে না—কী বল ?

তোমাকে ভুলতে চাই না।

কী করে বুঝবো।

তাই ত দেশ সেবায় মন দিয়েছি সত্যিকারের মনে রাখবার মত একটা বেদনা জাগিয়ে রাখতে চাই ব'লে !

বৌদি চুপ করিয়া রহিল। মাটীর প্রদীপটা নিভু নিভু করিতেছে। বলিলাম বৌদি—আলোটা বাড়িয়ে দাও। বৌদি প্রদীপটা উস্‌কাইয়া দিয়া বলিল—কী আশ্চর্য ঠাকুরপো—এমনি বিধিলিপি যে কোথাকার

কে তুমি অকারণে ষ্টিমারে দেখা, কে ভেবেছিল সেদিন যে আমাদের জীবনে এমন একটা বেদনাময় অধ্যায় শুরু হবে।—আচ্ছা ঠাকুরপো আমি তোমার জীবনটা নষ্ট করে দিলাম কী বল ?

না বৌদি নষ্ট করে দিয়েছে কে বললে ? তুমিই ত আমাকে মৃত্যুহীন পথের যাত্রী ক'রে দিয়েছ। আমার কোন দুঃখ নাই। একমাত্র দুঃখ তোমার আমি কোন কাজেই লাগলুম না।

বৌদি চুপ করিয়া রহিল—গভীর রাত্রি ঘরের মধ্যে আর কেহ নাই। আমরা দুইটী মানুষ বসিয়া আছি। পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় ভাবে চিনি। উভয়ের মধ্যে কোথায় যেন কিছুই গোপন নাই—অথচ কী আশ্চর্য এত নিকটে থাকিয়াও যেন আমরা কত দূরে, এমন করিয়া চেনা থাকা সত্বেও যেন কত অপরিচিত। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে অতি গোপনে একটা কথা উঁকি মারিতেছে ইচ্ছা করিলেই আমরা উভয় উভয়কে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারি। কিন্তু কে যেন আমাদের সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া লইয়াছে—একান্ত আয়ত্তের বস্তুও সবল হস্তে গ্রহণ করিবার শক্তি নাই।

বৌদি পুনরায় বলিল—নষ্ট ক'রে দিলুম বই কী ঠাকুরপো। আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তুমি যে পথে চলেছ সে পথ তোমার নয়। ঐ পথে চলতে হ'লে যতখানি আঘাত পেতে হয় ততখানি আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা তোমার নাই।

সে কী বৌদি ! এই বয়সে আমি একটা এতবড় আশ্রম গ'ড়ে তুললুম—আমার আহ্বানে দেশে এত বড় সাড়া পড়ে গেল একি শক্তিহীনের কাজ ব'লছ ?

না শক্তিহীনের কাজ কে বলছে। তবে সেটা তোমার শক্তি কে বললে—?

তবে কার ?

যে মানুষটীর ইঙ্গিতে আসমুদ্র হিমাচল জেগে উঠেছে তার।

তবে কী আমি কিছুই নই ?

না মাণিক বাবু তুমি কিছুই নও। গঙ্গা যখন আসে তখন ঐরাবৎকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায় আবার একটা তুচ্ছ তৃণকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাই ব'লে তৃণ যদি ভাবে আমি ঐরাবৎ তাই বললেই কী সে ঐরাবৎ হয়ে যাবে ?

আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

এখন বুঝতে পারবে না পরে বুঝতে পারবে।

বৌদি তোমাকে দেখলে আর এ সব কাজে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না।

বৌদি হাসিয়া বলিল—আর আমাকে না দেখলে আদৌ কাজে মন বসে না কী বল ?

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলিলাম—তা খানিকটা সত্যি। কিন্তু উপায় কী বলত ?

উপায় আবার কী ঐ নিয়তি। একে কে এড়াবে বল! এক ভাবা যায় আর ঘটে আর এক্। তুমি যে মনিকা হারা হ'য়ে বাড়ী ফিরছিলে পথে আমি যে আবার বাধা হবো কে জানত বল।

তা হ'লে আমি কি ক'রব বলত ?

তুমি লক্ষ্মী ছেলের মত যে ব্রত নিয়েছ তা সার্থক করার চেষ্টা ক'রবে।

তুমি যে বললে এতে আমি ব্যর্থ হব।

ব্যক্তিগত ভাবে হয় ত তুমি সার্থকতার কৃতিত্ব পাবে না। যেমন ঐরাবৎ ভেসে গেলেও পতিত পাবনী পতিত উদ্ধার ক'রেছিল ত!

তুমি এত সব ভাল ভাল কথা জানলে কী করে?

আমার বাবা যে মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন তাত আগেই বলেছি।

সত্যি বৌদি—এত যে করছি কিন্তু তৃপ্তি পাচ্ছি না। দেশ সেবা করবার ব্রত নিয়েছি। কেন নিয়েছি নিজেই জানি না। রাজসাহী গিয়েছিলুম প'ড়তে, মণিকা যে আমায় এমন ক'রে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে তাত জানতুম না। তখন মনে হ'লে মণিকাকে না পেলে জীবনের প্রয়োজনই বা কী? অথচ পাবার পথে বিরাট বাধা সে বাধা অতিক্রম করার সাধ্য আমার ছিল না। তাই তাকে ছেড়ে ভবিষ্যতকে বিসর্জন দিয়ে রাজসাহী ছেড়ে চ'লে এলুম। চলে আসতে বাধ্য হলুম এইজন্য যে আমার ভালবাসা যেন মাণিকার কোন ক্ষতি না ক'রতে পারে। তারপর কী কুক্ষনেই তোমার সঙ্গে দেখা। তুমি এসে মাণিকাকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালে। কেন যে তোমাকে ভাল লাগল আর কেনই যে তোমাকে এত আপনার লোক মনে হল জানি না। অথছ এখানেও কত বড় বাধা দেখ দেখি। রাত্রের অন্ধকারে গোপনে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছি। তুমি যে আমার কত নিজের লোক এ কথা ত কেউ জানে না। আর আমি একটা মিথ্যে সুনামের বেড়া সৃষ্টি ক'রে ক্রমশঃই তোমার নিকট হ'তে দূরে স'রে যাচ্ছি। বৌদি এই দুঃখু থেকে তুমি আমায় বাঁচাতে পার?

বৌদি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে জবাব দিল —ঠাকুর পো আমি মেয়ে মানুষ আমি তোমাকে এই দুঃখু হ'তে কি ক'রে বাঁচাই বল ত! এই যে দেড় বছর এখানে এসেছি তুমি খবর না

পাও আমি ত জানি তুমি আমার কত নিকটে। তোমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিই নাই কেন জান ?

কেন ?

কেবল তোমার দুঃখু বেড়ে যাবে অথচ আমার দুঃখের লাঘব হবে না। আচ্ছা ঠাকুরপো তুমি আশ্রম টাশ্রম এসব না ক'রে আর পাঁচজনের মত চ'লতে পার না ?

এ কথা কেন বলছ বৌদি ?

আমি আজ দেড় বছর ধ'রে তোমার সম্বন্ধে অনেক খবর রাখছি। কই কেউ ত বলছে না যে তুমি ভাল কাজ ক'রছ ?

তবে এত বড় প্রতিষ্ঠান কেমন করে গ'ড়ে তুললুম ?

তুমি কী গ'ড়েছ ঠাকুরপো। যে গড়বার সে গ'ড়েছে।

কে তবে ?

অজয় সরকারের টাকা আর পেছুতে তোমাদের কে গান্ধী আছে তার নাম ?

কিন্তু আমি না থাকলে এই দুটো জিনিষেই কী আশ্রম গড়া যেত ?

এই আশ্রম ক'রে কী লাভ ?

কিছু লাভ নাই বলছ ?

না লাভ নাই।

এ কথা কেন বলছ বৌদি ?

আশ্রমে মানুষ মানুষ হয় না ?

সে কী ?

হঁ্যা গো হঁ্যা আমার বাবার টাকায় মস্ত বড় ব্রহ্মচর্য আশ্রম চলছে। কিন্তু আমি আজ এখানে উঞ্ছবৃত্তি ক'রে থাচ্ছি। তোমার সঙ্গে যখন ষ্টীমারে দেখা তখন অভাবে প'ড়ে বাবার বাড়ী গেছলুম যদি

কিছু সাহায্য পাই। আশ্রমের অধ্যক্ষ উইল বার ক'রে স্পষ্ট দেখিয়ে দিলেন তাতে আশ্রমের বাইরে এমন কিছু অবশিষ্ট নাই যে আমাকে সাহায্য করা চলে। আশ্রমের অধ্যক্ষকে বললুম আমার বাবার সম্পত্তির আয়ে পঞ্চাশ জন ব্রহ্মচারীর খাওয়া পরা চলছে আর আমি তার মেয়ে হয়ে উপোস দেব। তা আপনারা দু এক জন ব্রহ্মচারী কমিয়ে আমাকে কিছু কিছু সাহায্য ক'রতে পারেন না? তাতে তিনি কী জবাব দিলেন জান?

কী?

বললেন। "তোমার বাবা যখন তোমার জন্য কিছু রেখে যান নাই তখন আমি কী ক'রতে পারি!"

আমি কেঁদে বলি "বাবা হয়ত এতটা দুঃখ আমি পাব ভাবেন নি। আর তাছাড়া আমার স্বামীও ত আপনাদের গুরুর শিষ্য।" তা শুনে অধ্যক্ষ বললেন—তোমার স্বামী ত আর ব্রহ্মচারী নয়। সে গার্হস্থ্য ধর্ম নিয়েছে।

আমি বললুম—তাও ত গুরুর আদেশেই নিয়েছেন নতুবা তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী।

আমার কথা শুনে অধ্যক্ষ হেসে উত্তর দিলেন—"গুরু যখন তাঁকে আদেশ ক'রেছেন তখন তাঁর গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করা উচিৎ। তাঁর কর্তব্য তাঁর স্ত্রীকে প্রতিপালন করা। তোমার পিতা মহৎ লোক ছিলেন তাই তিনি এই মহৎ কর্মে দান ক'রেছেন। আমরা ত তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ ক'রে দিতে পারি না।" তোমার দাদাও অবশ্য আমার জাগিদে তাদের কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলেন কিন্তু তাতে তারা কর্ণপাত করেনি।

আমি বৌদির কথায় আশ্চর্য হইয়া গেলাম। যাহার পিতার দানে দৈনিক পঞ্চাশ জন ব্রহ্মচারী নিশ্চিন্ত আরামে দিন যাপন করিতেছে আর তাহারই কন্যা কিনা এক মুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল।

বৌদি বলিয়া যাইতে লাগিল—মায়ের মৃত্যুর পর বাবা কেমন যেন উদাসীন হ'য়ে পড়েন। আমি যখন ছেলে মানুষ ছিলুম তখন থেকে তিনি ধ্যান ধারণা ক'রতে আরম্ভ করেন। তারপর তাঁর এক গুরু জুটলো, যে বাবাকে সম্পূর্ণ বশীভূত ক'রে আমাকে পথে বসিয়েছে। তোমার সঙ্গে যখন দেখা হ'ল ঠাকুরপো তখন কী দুঃখ নিয়ে কলকাতা ফিরছি তা মুখে বলা যায়না। তোমার দাদার আয় ত তোমার জানা ছিল সে আয়ে কোনরকমে চালাতে পাচ্ছিলুম না। তার উপর ঐ পোড়া পেটের বেদনায় মাঝে মাঝে কামাই হ'ত। অভাবের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে বাধ্য হ'য়ে তবে ভিক্ষে ক'রতে বেরিয়েছিলুম। যখন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসছি তখন ভাগ্যগুণে তোমার সঙ্গে পথে দেখা। ভাগ্যিস তখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঠাকুরপো নতুবা সেদিন ঘর ভাড়ার অভাবে ঘর ঢুকতে পারতুম না।

আমি নির্বাক হইয়া বৌদির বেদনা কাতর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বৌদি বলিয়া যাইতে লাগিল—এত কষ্টেও আমার দুঃখ ছিল না ঠাকুরপো—সবচেয়ে দুঃখু কী জান ?

জিজ্ঞাসা করিলাম—কী বৌদি ?

বৌদি নতমস্তকে ধীরে ধীরে উত্তর দিল—এই তোমার জীবনটা আমি ছারখার ক'রে দিলুম।

আমার জীবন ছারখার ক'রে দিলে, কী ক'রে ?

নোংরা বস্তিতে থাকতুম। নোংরা লোক কত নোংরা যুক্তি দিত তার ঠিক নাই। অভাবের জ্বালা তখন, তাই সেই সময় সহানুভূতির সঙ্গে যারা যা বলত—তা উপেক্ষা করতে পারিনি। একদিন বাড়ীওয়ালী এসে বললে—"বেশ ঠাকুরপোটি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছ

এখন বৌদি বলে বেশ দুপয়সা সাহায্য ক'রছে তারপর যখন চ'লে যাবে তখন কী ক'রে চলবে শুনি?" আমি বললুম—ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। বাড়ীওয়ালী হেসে জবাব দিল "মানুষ বশ ক'রতে শেখ ভাগ্যি ফিরে যাবে।" কথাটা শুনে আমি যেন কেমন হ'য়ে গেলুম। এই কথা বলে বাড়ীওয়ালী চলে গেল, কিন্তু সেই কয়টা কথা অহরহ আমার কানে বাজতে লাগল। আমার মনে হল সত্যিই ত তুমি ত চিরকাল আমার কাছে থাকবে না। কিসের বাঁধনে বেঁধে রাখব তোমাকে। কী সম্পর্কই বা তোমার সঙ্গে আমার। এই কথা ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে গেলুম। মনে হল যে কোন উপায়ে তোমাকে আমার কাছে বেঁধে রাখতেই হবে এই সর্বনাশা চিন্তা আমার মনকে পেয়ে বসল। তখন ভাল মন্দ বিচার করবার শক্তিও লোপ পেয়ে গেছে। এমনি ক'রে দিনের পর দিন আমার মনে যে আগুন জ্বলেছিল তার দাহতে অস্থির হ'য়ে উঠেছিলুম। সেদিন যে আমি তোমার গলা জড়িয়ে ধরেছিলুম এর জন্য যেন আমি দায়ী ছিলুম না। এ ক'রতে কে যেন আমাকে অহরহ ইঙ্গিত করছিল। আমাব এমন শক্তি ছিল না যে বাধা দিই। পোড়া পেটের জন্য তোমাকে বশ ক'রতে গেলুম ঠাকুরপো অথচ এমন যুক্তি কেউ দিল না সেদিন যে সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তোমার দাদার কোলে মাথা রেখে বিষ খেয়ে মরি।

আমি অবাক হইয়া বৌদির কথা শুনিতে লাগিলাম।

বৌদি বলিয়া যাইতে লাগিল—তুমি সেদিন যখন আমার কাছে আর ফিরে এলে না তখন ঠিক করলুম আর এ জীবন রাখব না। কিন্তু কী আশ্চর্য ঠাকুরপো তোমাকে আবার ফিরে পাব এই মনে ক'রে সেদিন মরতে পারি নাই।

বৌদি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল—সেই

ফিরেও এলে, আমার হয়েই ফিরে এলে কিন্তু কী অভিশাপ বলত ফিরে এসে আবার আমার আরও জ্বালা বাড়িয়ে দিলে। না ঠাকুরপো আশ্রম টাশ্রম ছেড়ে দাও তুমি, যাতে তুমি সুখী হও এ আমাকে দেখতেই হবে।

উত্তর দিলাম—আশ্রম কী দোষ করলে বৌদি। আশ্রমের দুএকটা মানুষ খারাপ হ'লেই কী আশ্রম খারাপ হয়ে গেল।

না—না ঠাকুরপো যেখানে হৃদয় নাই সেখানে কল্যাণ নাই। তোমাদের আশ্রমে যেদিন কাপড় বিলি হয় সেদিন আমিও গেছলুম কাপড় মাগতে। কিন্তু তোমরা ফিরিয়ে দিয়েছিলে। বলেছিলে—"ও খেটে খেতে পারে ওকে কাপড় দেওয়া যায় না।" অথচ সেদিন একটা দুলে বাগ্দির বুড়ী সে তার আশ্রমের মাগা কাপড় জোর ক'রে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে কী বললে জান?

কী বললে?

"বললে আমরা ছোট লোকের মেয়ে পাঁচ জায়গায় মাগতে যেতে পারব। তাছাড়া বয়েস হয়েছে ছেঁড়া কাপড়ে চালিয়ে নিতে পারব। কিন্তু রাজ রাজ্যেশ্বরী মা আমার—তোর যে সারা অঙ্গ ঢেকে কাপড় পরতে হবে, তুই এই রূপ নিয়ে কার দুয়ারে হাত পাততে যাবি মা—নে মা গরীব ছোট জাতের মেয়ে ব'লে আমার দেওয়া কাপড় ফিরিয়ে দিস্ না।" আমি তার দান মাথা পেতে সেদিন নিয়েছিলুম ঠাকুরপো। দুঃখু ঘুচুতে তোমরা পারবে না ঠাকুরপো। কেন মিথ্যে আমায় কষ্ট দিচ্ছ। আমার আজীবন খেদ থেকে যাবে তুমি আমার জন্য সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছ।

আমি অভিমান ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলাম—বৌদি আমি তোমার এতই পর যে এমন কাপড়ের অভাব হয়েছিল অথচ আমি এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আমাকে জানালে না তুমি?

বৌদি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—জানিয়ে লাভ ?

অন্ততঃ একটা কাপড় ত দিতে পারতুম।

তা পারতে, কিন্তু অত্যন্ত গোপনে। মানুষের দুঃখ ঘোচাতে হ'লে গোপনের কিছু নাই। হ্যাঁ তুমি যদি দশজনের সামনে এসে আমার কাছে বৌদি বলে দাঁড়িয়ে কাপড় দিতে পার তবে একটা কেন দশটা কাপড় মাথায় তুলে নেব। কিন্তু তোমার গোপন দান আমি কিছুতেই নিতে পারব না।

বৌদির কথার জবাব খুঁজিয়া পাইলাম না। বেশ বুঝতে পারিলাম আমি কোন মতেই বৌদির দুঃখ ঘুচাইতে পারিব না।

বৌদি হাসিয়া বলিল—কই সাড়া দিচ্ছ না যে—তাহ্‌লে কাল সকালে কাপড় সন্দেশ নিয়ে বৌদির তত্ত্ব নিতে আসছ—কী বল ?

কী জবাব দিব ভাবিয়া পাইলাম না তাই চুপ করিয়া রহিলাম।

বৌদি সস্নেহে বলিল—যে কাজ পারা যায় না সেই কাজের ব্রত নিয়েছ। দুঃখ মোচন কী আর সোজা কাজ ঠাকুরপো ? দুঃখ যে কী বস্তু তাই জান না, আর সেই দুঃখ তোমরা লাঘব ক'রবে। দুঃখকে আগে চেন তবে ঐ কাজে হাত দিও।

বৌদির প্রতিটী বাক্য হৃদয়ের পরতে পরতে বেদনায় বিঁধিয়া উঠিতেছে। মানুষের বেদনায় গান যেন বৌদির কণ্ঠে করুন সুরে ভাসিয়া আসিতেছে। আমি নির্বাক বিস্ময়ে সেই বেদনার মূর্ত প্রতীক্ বৌদির দিকে চাহিয়া আছি। কিছুক্ষণ পরে বৌদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বৌদি আমাকে কী ক'রতে হবে বল ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটা কাপড় দিলে যদি দুঃখ ঘোচান যেত, তবে আমি তোমাকে বলতুম ঐ কাজেই জীবন দাও গে। কিন্তু দুঃখকে ত ঐ দিক থেকে

দেখলে হবে না ঠাকুরপো, তুমি কী ভাবছ আমার কাপড়ের অভাব হ'তে পারে ?

বৌদির নূতন প্রশ্নে ধাঁধা লাগিয়া গেল। একখণ্ড বস্ত্রের জন্য যাহাকে ছুলেবাগ্দির দান গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সে যদি বলে তাহার কাপড়ের অভাব নাই তবে কী বুঝিব হয় সে আগাগোড়া যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা অথবা তাহার কোন সঞ্চয় আছে। কিন্তু আমি ত জানি বৌদির কোন সঞ্চয়ই নাই।

তাই বলিলাম—বৌদি কাপড়ের দুঃখ ত তোমার আছে এবং তা সংগ্রহ করবার মত ত তোমার কোন পুঁজি নাই। তবে তুমি বলছ কেন যে কাপড়ের দুঃখ তোমার দুঃখই নয়।

বৌদি মধুর হাসিতে ঘরের বাতাসকে মধুময় করিয়া বলিল—ওগো মশায় পুঁজী আমার এমন আছে যে তোমাদের দশটা আশ্রমের লোককে আমি কাপড় পরাতে পারি। কাপড়ের অভাব আমার নাই। কাপড় যোগাড় করার মত ধন আমার আছে। তবে লোকের গচ্ছিত ধন ভাঙ্গাবার ইচ্ছে নাই তাই এই সব দুঃখ পেতে হচ্ছে।

বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলাম। তবে কী বৌদির কাছে কাহারও কোন গচ্ছিত সঞ্চিত ধন আছে। যাহা এত কষ্টেও বৌদি তাহা যক্ষের মত আঁকাড়াইয়া বসিয়া আছে। কী এমন ধন এবং কাহারই বা সে ধন ? তাই কৌতুহল পরবশ হইয়া বলিলাম—কার কী ধন তোমার কাছে লুকোন আছে বৌদি ?

বৌদি ঠিক তেমনি হাসিয়া জবাব দিল—কার আবার আমার নিজের ?

তোমার নিজের সঞ্চয় থাকতে এত দুঃখ পাচ্ছ।

কী করবো অন্যকে দান করে বসে আছি যে। যাকে দান করেছি সে যদি কোন দিন এসে চায়, তখন কী জবাব দেব ?

বৌদির কথা বুঝিতে পারিলাম না। তাই আবেগের সহিত বলিলাম—ওসব হেঁয়ালী রাখ, স্পষ্ট করে আমায় বুঝিয়ে দাও।

বৌদি হাসিয়া বলিল—সেই কথা বলব বলেই ত ডেকেছি। তুমি আমার আপনার লোক। তাই তোমার কাছে যুক্তি নেব বলেই ত ডেকেছি—যার জিনিষ তাকে ফেরত দেওয়া ঠিক হবে কিনা ? না দান করা জিনিষ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের কাজে লাগাব ? আর তাছাড়া যাকে দান করেছি, সে যদি সে দান না নেয় তবে তখনই বা আমি করব কী ?

আমি অধৈর্য হইয়া বলিলাম কী—জিনিষ কাকে দিয়েছ তুমি শীগ্‌গীরি বল বৌদি—তোমার দুটী পায়ে পড়ি এমন করে তুমি কথার মার প্যাঁচ কর না।

বৌদি গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—খুব দামী জিনিষ—যাকে দিতে চেয়েছি সেও ভয়ে রাখতে চাইছে না। এদিকে আমার হয়েছে মরণ। চোরে টের পেয়েছে আমার কাছে সেই দামী জিনিষটী আছে। আমি অসহায় মেয়ে মানুষ হয়ে সেই অমূল্য সম্পদটী লুকাই কী ক'রে। এখন চোরের হাত হ'তে কী ক'রে সেই সম্পদ রক্ষা করি বলত ?

বৌদি কি বলিতে চায় কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কী এমন মূল্যবান জিনিষ আছে যে চোরে তাহার নিকট হইতে চুরি করিতে পারে। এমন কী মূল্যবান জিনিষ যে দানগ্রহিতা পর্যন্ত ভয়ে সে জিনিষ রাখিতে সাহস করে নাই। সোজা কথাকে বাঁকা করিয়া বলা বৌদির একটা স্বভাব কিন্তু হাল্কা কথাকে সে কোন দিন গুরুতর করিয়া বলে না বরং গুরুতর ঘটনাকে সে তুচ্ছ করিয়া দেখিতেই অভ্যস্ত। তাহার দুংখ ও অভাব যে কী এই ঘরে ঢুকিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। দু একটা কাঁসার থালা বাটি ছাড়া

অধিকাংশই মাটির তৈজসপত্র। ঘরের ভিতর একটি দড়ি টাঙ্গান আছে তাহার উপর দু একখানা ঈষৎ মলিন ছিন্ন বস্ত্র ঝুলিতেছে। একটি বাক্স আছে কিন্তু তাহার মধ্যে কী আছে তাহা আমার অজানা নাই। কারণ সেই বাক্স আমি কানাইদার বাসা বাড়ীতে নিত্য দেখিয়াছি। অথচ কী আশ্চর্য এই দরিদ্র মানুষটির নিকট কী এমন মূল্যবান বস্তু আছে যাহা খোয়া যাইবার ভয়ে শঙ্কিত হৃদয়ে সে দিন যাপন করিতেছে। তাই বলিলাম—বৌদি খুলে বল আমার দ্বারা যদি কোন প্রতিবিধান থাকে তবে আমি তা করবই—তাতে যে মূল্যই আমাকে দিতে হোক।

বৌদিকে দেখিয়া মনে হইল যে যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতেছে। আমার কথা শুনিয়া বৌদি বলিল—সেই জন্যইত তোমাকে ডেকেছি ঠাকুর পো—পারবে আমাকে রক্ষা করতে এ বিপদ হতে ?

আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি আমার সাধ্যে থাকলে নিশ্চয়ই করব।

বৌদি আকুল কণ্ঠে বলিল—রক্ষা করতে পার না পার তোমাকে বলতেই হবে। আর তোমাকে বলব বলেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছি। তুমিও যেমন আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অস্থির হয়েছিলে আমিও তেমনি মনে মনে তোমাকেই ডাকছিলুম। তুমি ছাড়া আর আমার কে নিজের লোক আছে এখানে ঠাকুর পো—যাকে আমার দুঃখের কথা জানাই। বল ঠাকুরপো এই বিপদে আমার পাসে এসে দাঁড়াবে ?

প্রতিজ্ঞা করিলাম—কোন চিন্তা তোমার নাই আমি শপথ করে বলছি আমার সাহায্য তুমি পাবে।

বৌদি হাঁপাইতেছে, সে যেন অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে। তাই সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—বাঁচালে ঠাকুব পো আমাকে বাঁচালে। গোয়াবাগান ছেড়ে নিশ্চিন্ত হতে এলুম মানুষের ভয়ে, আর সেই আপদ্

এখানেও জুটলো ঠাকুর পো—এই বলিয়া বৌদি অঞ্চলের প্রান্ত হইতে একটি ক্ষুদ্র পত্র বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। পত্রখানি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

প্রিয়তমাসু

গোবরে পদ্মফুল ফোটে এই রূপ কথা শোনা যায়, কিন্তু সত্যই ফোটে তাহা বিশ্বাস করিতাম না। মৌগাঁয়ে যেদিন তোমাকে দেখি সেদিন বুঝিতে পারিলাম যে এ কথা সত্য। আমি তোমাকে দেখিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছি। তোমার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম তুমি মৃত কানাই বাবুর স্ত্রী। তোমার আর কেহ নাই। তুমি অত্যন্ত অভাবের মধ্যে দিন কাটাইতেছ। ইহার কিন্তু কোন প্রয়োজন নাই। তোমার মত অপরূপ রূপসীর ইঙ্গিতে কত রাজমুকুট মাথা হইতে খসিয়া পড়িতে পারে তাহা বোধ হয় তোমার অবিদিত নাই। ভগবান তোমার এই অনুপম সৌন্দর্য বৃথা সৃষ্টি করেন নাই। ইহার ব্যবহার করিলে ভগবানের ইচ্ছাই পূরণ করা হইবে। আমি তোমার দুঃখের অংশীদার হইতে চাই। আমার বাবা জমিদার। আমি বর্তমানে পড়িবার খরচ বাবদ মাসিক দুইশত টাকা পাই। বর্তমানে কলিকাতায় বাসা লইলে ঐ টাকায় আমাদের কোন প্রকারে চলিয়া যাইবে। বাবার অবর্তমানে আমি তাহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধীকারী হইব। তখন আমরা মহা সুখে দিন যাপন করিতে পারিব। আমি তোমাকে কলিকাতায় লইয়া যাইব সেখানে তোমাকে বিধবা বিবাহ করিয়া পত্নীয় মর্যাদা দিব। আশা করি তুমি আমার এ প্রস্তাবে রাজী হইবে। তোমার মতামত জানিতে পারিলে আমি সকল ব্যবস্থা ঠিক করিতে পারি। ইতি

তোমারই শ্রীকল্যাণ কুমার ভট্টাচার্য্য।

খোকার চিঠি! খোকার চরিত্রের কথা গোবর্দ্ধনের নিকট কিছু কিছু শুনিয়াছি কিন্তু তাহার ধৃষ্টতা যে এতদূর পৌঁছিতে পারে বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

পত্র পড়া হইল বৌদি বলল—আগে আগে পত্র দিত, এখন সে আসতে আরম্ভ ক'রেছে।

সে কী বৌদি! তুমি বাধা দিচ্ছ না?

বাধা দেব কী করে ঠাকুর পো! এতে ত আমি বাঁচতে পারব না।

তবে তুমি তাকে আসতে প্রশ্রয় দিচ্ছ—

না দিয়ে উপায় কী?

কেন যদি বাধা দাও তাহলে সে কী করবে?

সোজাপথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরবে। তখন সে অত্যন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠবে। বাধা দিয়ে ত আমি বাঁচতে পারব না ঠাকুর পো। এরা অনুকূল বাবুর জাত নয়। এরা তাদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা তোমার জানা নাই। তাই তাকে আসতে বাধা দিই নাই।

তুমি জান এতে তোমার সর্বনাশ বাড়ছে বই কমছে না।

তা আর জানি না। পরশু দিন জোর করে সে আমার হাত ধরে টেনেছিল। আমি ভাবলুম এতে যদি বাধা দিই তাতে আমার কোন সুবিধা হবে না। কেবল গাঁয়ের লোক জড় হয়ে আমার কলঙ্ক প্রচার করবে। তাই তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছি "তুমি কলিকাতায় ঘর দেখে এস গে এসে আমাকে নিয়ে যেও।"

যদি ঘর দেখে এসে তোমাকে নিয়ে যেতে চায় তুমি কী ক'রবে?

তাইত তোমাকে ডেকেছি।

বৌদি আমার শরণ লইয়াছে। যে বৌদিকে দুঃখের দিনে সাহায্য

করিব বলিয়া দুঃখ মোচনের ব্রত লইয়াছিলাম আজ সেই দুঃখ মোচনের ডাক পড়িয়াছে। আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম।

বৌদি বলিল—চুপ ক'রে রইলে যে ঠাকুর পো ?

উত্তর করিলাম—আমাকে কী করতে হবে।

বৌদি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলা—আমাকে বাঁচাতে হবে। আমার ভার নিতে হবে।

বৌদির কথায় আমি ভয় পাইয়া গেলাম এই অনাত্মীয় অথচ পরম আত্মীয় নারীটির ভার লইতে পারি এ কথা যেন আমার কল্পনার অতীত। ভালবাসার মধ্যে এতখানি বোঝা আছে তাহা জানিতাম না। আজ ভালবাসার ডাক আসিয়াছে আজ তাহার অগ্নি পরীক্ষার দিন। যে ভালবাসাকে এত দিন দিন পরম বস্তু মনে করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছি আজ তাহাই যে দুঃসহ রুদ্র-রূপে দেখা দিবে তাহাত কোন দিন ভাবি নাই। খোকার শক্তিকে এ ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারিব না তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। বৌদিকে রক্ষা করিবার পবিত্র দায়িত্ব স্কন্ধে লইবার মত শক্তিও আমার নাই তাহাও বেশ বুঝিতে পারিলাম। যে মিথ্যা সুনামের জালে জড়াইয়া পড়িয়াছি সেই জাল কাটিয়া বাহির হইবার ক্ষমতাও আমার নাই। গোয়াবাগানে যে কাজ সহজ ছিল হরিশপুরে মোটেই সে কাজ সহজ নহে। এ অবস্থায় কী করা উচিৎ তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। আমি বিমূঢ় স্বরে বলিলাম—কী করতে হবে বৌদি ?

বৌদি উত্তেজনায় আমার একটী হাত ধরিয়া লইল—তারপর করুণ সুরে বলিল—এর যদি উত্তর দিতে পাবব তবে তোমাকে ডাকি ? আমি বৌদির হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম—আমাকে দু'একদিন ভেবে দেখতে হবে। তারপর তোমার কথায় জবাব দেব।

বৌদি উঠিয়া দাঁড়াইল! ধীর এবং সংযত কণ্ঠে বলিল—অনেক রাত হয়ে গেছে ঠাকুরপো—তবে আজ এস, যদি ভেবে কিছু পথ বার করতে পার আমাকে জানিও। এই বলিয়া কুটীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আমার দু'একটা কথা জানিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিলাম বৌদি আর আমার কথায় জবাব দিবে না। আমার দুর্বলতা সে ধরিয়া ফেলিয়াছে। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হরিশপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

পরের দিন গোবর্দ্ধন ছোট্ট একটা চিঠি আমার হাতে গুঁজিয়া দিল। খুলিয়া দেখি বৌদির পত্র।

"চললুম ঠাকুর পো। আমাকে রক্ষা করার জন্য অনাবশ্যক ভাবনার তোমার দরকার নাই। দুর্বলের হাতে আত্মসমর্পন করার চেয়ে সবলের হাতে আত্মসমর্পন করা ঢের বেশী নিরাপদ। তুমি তোমার দুঃখ মোচনের ব্রত নিশ্চিন্ত হ'য়ে চালিয়ে যাও। খবরের কাগজে তোমাদের মহৎ কর্ম দেখার কৌতুহল নিয়ে গেলাম। আমি তোমাকে যে ভালবাসার কথা এত ফেণাইয়া ফেণাইয়া বলিয়া আসিয়াছি তাহা মিথ্যা জানিও দুর্বল ব্যক্তিকে কোন নারী ভালবাসে না এই সত্য কথাটা বুঝিতে শেখ। আমি জানি তুমি এত দুর্বল যে আমার বিপদে কোন দিন সাহায্য করিতে পারিবে না! ভাবিবার জন্য সময় চাহিয়াছ তাহা তোমার আত্মরক্ষার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তোমাকে চিন্তা হইতে মুক্তি দিলাম। আমার কথা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিও। ইতি

তোমার বৌদি।

গোবর্দ্ধনকে ডাকিয়া বলিলাম—গোবরা শীগ্‌গীর একবার বৌদির কাছে যেয়ে ব'লে আয় আমি আজ রাত্রে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

গোবর্দ্ধন জবাব দিল—সে তোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে আছে কিনা? আজ ভোরে সে কলকাতা চ'লে গেছে।

কার সঙ্গে গেল?

একাই গেল, আমি কেবল টিকিট ক'রে ইষ্টিশনে তুলে দিয়ে এলুম।

তুই তাকে চলে যেতে বাধা দিলি না?

বাধা দেব কিরে মাইরী সে যা ফাঁপরে পড়েছিল তুইও ত জানিস্। খোকার জ্বালায় তাকে পালাতে হল বইত নয়? নইলে বেশ ছিল এখানে।

আমার যে তার সঙ্গে কথা ছিল গোবরা?

কী কথা সে আমি জানি। তোর মুরোদ কী যে এই সব ঝঞ্ঝাট পোয়াস্।

তুই জানিস্ বৌদির সেখানে কেউ নাই!

বৌদি সব বলেছে—সেইজন্যই ত আমি যেতে চেয়েছিলাম তার সঙ্গে। বললুম আমাকে নিয়ে চল, বৌদি "আমি মুটে মজুর খেটে খাওয়াব তোমাকে। আমার সাত কুলে কেউ নাই আর যখন তোমারও সাত কূলে কেউ নাই।"

বৌদি কী বললে—

বললে "না তোমাকে নিয়ে গেলে মাণিক বাবু রাগ করবে।"

তুই সে কথায় কী উত্তর দিলি?

গোবরা হাসিয়া বলিল—আমি বললুম—আমি কী মাণকের কেনা? আমার যেখানে খুসী যেতে পারি। তখন বৌদি বললে—"না গোবর ঠাকুর পো—তোমাকে আমি নিয়ে যেতে পারি না। মাণিক বাবু তোমাদের মেয়ে মানুষের অধম—তার কাছে তোমার মত একজন শক্ত লোক থাকা দরকার।"—তারপর কী বললে জানিস?

কী বললে ?

বললে "আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্য কর তুমি, মাণিক বাবুকে ছেড়ে যাবে না কোথাও ?" বাধ্য হয়ে তাই করতে হল। তোদের যে দু'জনের এত ভাব আচ্ছা পাজী ত তুই;কোন দিন বলিস নাই আমাকে—অথচ আমি তোর পরাণের বন্ধু।

তুই কার কাছে শুনলি ?

বৌদি সব বলেছে। আর বলবেইবা না কেন শুনি ? আমি ত আর কাউকে বলতে যাচ্ছি না ঃ

আমাদের গোপন কথা বৌদি গোবর্দ্ধনের কাছে গোপন রাখে নাই। এই কথা প্রকাশ করিয়া কি যে তাহার লাভ হইল বুঝিতে পারিলাম না। ভয় হইল গোবর্দ্ধন পাছে প্রকাশ করিয়া দেয়। তাই ভয়ে ভয়ে বলিলাম—এসব কথা যেন বলিস্ না কারও কাছে গোবরা।

গোবর্দ্ধন হি হি করিয়া বলিল—এত যদি ফীয়ার তবে ডুবে ডুবে লাভ করতে গেছিল কেন শুনি ?

গোবর্দ্ধনের উপর চটিয়া গেলাম রাগিয়া বলিলাম—সব কথাতেই তোর ফুক্কুড়ি।

গোবর্দ্ধন পূর্ববৎ হাসিয়া বলিল—তুই লাভ্ করবি আর আমি ফুক্কুড়ি করতে পারব না তুই ত বেশ লোকরে—। ভয় নাই থ্রোট কাটিং করলেও গোবর্দ্ধন শর্মা একথা প্রকাশ করবে না। বৌদির গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করেছি।

নিশ্চিন্ত হইলাম। জানি গোবর্দ্ধনের ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

(৯)

খোকার বাবা জমীদার মধুসূদন ভট্টাচার্য কলিকাতার অনেক দেনা করিয়া দেনার ভয়ে গ্রামের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কলিকাতায়

উত্তমর্ণের তাগাদায় নাকি তিনি অস্থির হইয়া গত্যন্তর না দেখিয়া অবশেষে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রামের বাড়ীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কলিকাতায় একদিন যিনি দুর্বিপাকে পড়িয়া গ্রামে আসিয়াছেন সকলে ভাবিয়াছিল সেই বিপদ কাটিয়া গেলে মধুসূদন ভট্টাচার্য আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু মধুসূদন ভট্টাচার্য মহাশয় আর কলিকাতা ফিরিয়া গেলেন না। কারণ বার্ষিক চার হাজার টাকা জমীদারীর আয়ে কলিকাতায় বসবাস করা ঠিক হয় নাই একথা তিনি বুঝিতে পারিলেন। গ্রামে আসিয়া গ্রাম্য মাতব্বরদের এবং তিনকড়ি চাটুয্যের সাহায্যে তিনি জমিদারী দেখা শোনা করিতে লাগিলেন। দেনাগ্রস্ত জমীদারের পয়সাই তখন একমাত্র কাম্য হইয়া দাঁড়াইল। প্রজাদের খাজনা বাকী প'ড়িলে সময় না দিয়া নালিশ করিয়া নীলাম করিয়া খাস করিতে লাগিল। আবার দাতা সাজিয়া পুনরায় সেলামী লইয়া সেই জমী সেই সকল প্রজাদিগকেই ফিরাইয়া দিতে লাগিল। যে ক্ষেত্রে প্রজারা সেলামী দিতে অক্ষম হইল সেই ক্ষেত্রে সেই সকল জমী আগের মলিক প্রজাদের মধ্যেই অর্দ্ধেক-ভাগে বিলি করিতে লাগিল। সেই অর্দ্ধেক আয় হইতে খাজনার চতুর্গুণ জমীদারের তহবিলে জমা হইতে লাগিল। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই মধুসূদন ভট্টাচার্য মহাশয় তাহার অবস্থা ফিরাইয়া লইলেন। একদিকে প্রজাদিগকে পরোক্ষে শোষণ করিয়া অপরদিকে প্রজাদের জমী 'আমি নষ্ট হ'তে দিই না' এইরূপ প্রচার করিয়া নিজের সুনাম যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। এই উপায়ে আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বর্তমানে তিনি ধানের একচেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। অভাবের সময় ধান ধার দিয়া অথবা টাকা ধার দিয়া ফসল উৎপন্ন হইলে ধার দেওয়া সেই ধান সুদ সমেত গোলাজাত

করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে ভট্টাচার্য মহাশয় বছরের শেষে বেশ একটী মোটা মুনাফা করিতে লাগিলেন।—

কিন্তু মুস্কিল হইল তাঁহার আমাদের আশ্রমটীকে লইয়া। আশ্রমের সেবকরা তাহার এই ফাঁকীবাজীর কথা ক্রমাগত প্রচার করিয়া লোক সমক্ষে তাহাকে হেয় করিতে লাগিল। তাই জমীদারের যত আক্রোশ পড়িল আশ্রমটীর উপর আর সর্বাপেক্ষা বেশী আক্রোশ পড়িল আমার ও গোবর্দ্ধনের উপর। তাই আমাদের উচ্ছেদ করিবার জন্য ভট্টাচার্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন এই বিষয়ে পুলিশও তাহার সহায় হইল। কারণ এতবড় একটা রাজনৈতিক আড্ডা ভাঙ্গিয়া দিতে না পারায় দারোগাদিগকে ঘন ঘন বদলি করা হইতেছিল।

সেদিন ছিল শ্রাবণ মাস। খুব ভোরে মা আমাকে জাগাইয়া বলিল—"ওরে মাণিক পুলিশে বাড়ী ঘিরে ফেলেছে কী হবে বাবা?" মাকে কী আর সান্ত্বনা দিব। বলিলাম—মা এই দুঃখ ত সাধ করেই মাথায় নিয়েছি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর যাতে আমি এই দুঃখ জয় করতে পারি। মা কেমন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ভীতবিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন—ওরে তোকে যে ওরা মারবে। ওরা গোবারকে ধরে কীরূপ পীড়ন করছে জানলা দিয়ে দ্যাখ—।

জানালা দিয়া উঁকী মারিয়া দেখিলাম গোবর্দ্ধনের দুইটী হাত ধরিয়া দুইজন কনেষ্টবল ক্রমাগত মোচড় দিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া জ্ঞানহারা হইয়া গেলাম—দ্রুত দরজা খুলিয়া পুলিশদের নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিলাম "কেন তোমরা গোবারাকে মারছ, কোন আইনে তোমাদের মারবার অধিকার দিয়েছে?" দ্রুত গতিতে দুইজন কনেষ্টবল আমাকে ধরিয়া ফেলিল। দারোগা মুখ ভেঙচাইয়া বলিল—চল একবারে গারদে ঢুকিয়ে তারপর আইনের বইটা বার ক'রব। নিস্ফল রোষে দারোগার

দিকে চাহিলাম। তারপর বাড়ী খানাতল্লাসী হইতে লাগিল। তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস চলিতে লাগিল। নির্মম হইয়া প্রয়োজনীয় জিনিষ সকল ছড়াইয়া দিতে লাগিল। ছুরি দিয়া বালিসগুলি ফাড়িয়া উঠানে ছুঁড়িয়া দিতে লাগিল। মা পাগলের মত একবার দারোগার পায়ে একবার জমীদারের পায়ে পড়িতে লাগিলেন। গ্রামের আর কোন লোক ভয়ে এদিকে আসে নাই। এইরূপে খানাতল্লাস শেষ করিয়া আমাকে ও গোবর্দ্ধনকে পেছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া থানায় লইয়া গেল। থানায় লইয়া যাইবার সময় তিনকড়ি পৈশাচিক হাসিতে বলিল—"যাও মনের সুখে আশ্রমে বাস করগে।"

মধুসূদন ভট্টাচার্যের বন্দুক চুরির মকদ্দমায় আমার ও গোবর্দ্ধনের দেড় বছর করিয়া জেল হইয়া গেল। নমিতাদির বাবা অনেক চেষ্টা করিয়াও আমাদের খালাস করিতে পারিল না। সেই দুঃখের দিনে, মিথ্যার জয়গৌরবের দিনে—দুর্বলের প্রতি প্রবলের পীড়নের দিনে নমিতাদির দীপ্ত মহিমা আমার পাশে না দাঁড়াইলে আমি ভাঙ্গিয়া পড়িতাম। রায় শুনিয়া নমিতাদি পাশে আসে দাঁড়াইয়া বলিল—যান্ মনীবাবু দেশের জন্য এর চেয়ে ঢের দুঃখ মাথায় পেতে নিতে হবে। মায়ের জন্য চিন্তা নাই আমি তাকে দেখব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে জেল খেটে ফিরে আসুন। নমিতাদির প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল আর একবার কারাগারের দুঃখ ভুলাইয়া দিল।

১০

দেড় বছর পরে জেল হইতে গোবর্দ্ধন ও আমি হরিশপুরে ফিরিলাম। আশ্রমের ঘরটী দখল করিয়া জমীদার একটি মাইনার ইস্কুল করিয়া দিয়াছে। জমীদারের ভয়ে আমাদের নিকট সেদিন আর কেহ অভ্যর্থনা করিতে আসিল না। এতদিনের সাধনার সিদ্ধির খাতার শূন্য হিসাব

জমা হইল। কেমন করিয়া আবার এই আশ্রম গড়িব বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কী আশ্চর্য পরের দিন প্রভাত হইতেই দলে দলে ভিন্ন গ্রাম হইতে ছেলেরা আসিয়া অভিনন্দন জানাইতে লাগিল। 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে' এই কথা বলিয়া নেতৃত্ব লইবার আহ্বান জানাইল। জেল খাটার দুঃখ, মানুষের নীচতার দুঃখ তাহাদের আহ্বানে ভুলিয়া গেলাম। এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে দুর্দম গতিতে সামনে ঠেলিয়া দিতে লাগিল। পেছু ফিরিবার আমার আর কোন শক্তি রহিল না। তাহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়া আবার উচ্চ কণ্ঠে বলিলাম—"না না দেশ সেবার ব্রত আমাকে উদযাপন করতেই হবে। এস তোমরা আমাকে সাহায্য কর। আমার যাহা সাধ্য তাহা নিশ্চয় করিব। আমি কোন দিন কর্তব্যের ত্রুটি করিব না।"

কেবল গোবর্দ্ধন পশ্চাৎ হইতে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—খোকার বাবাকে পারবি কী? যা সাংঘাতিক মাইরী লোকটা। গোবর্দ্ধনের অহেতুক ভীতিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। সে দিনের সেই আহ্বানে মা আমাকে কোন বাধা দেন নাই। কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন পারবি কী বাবা—ওরা কী মানুষ? ওরা মানুষ হ'লে বাধা দিতুম না। কিন্তু সয়তানের সঙ্গে তুই দুধের ছেলে পারবি কী বাবা।"

বেণার বৌ আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে দিনের সেই অসহায় ক্ষুদ্র একটি বালিকা শিক্ষা এবং সহবতের জৌলুসে অপূর্ব মাধুরী লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। শুভ্র খদ্দরে কী চমৎকার না তাহাকে মানাইয়াছে। ষ্টেসেন হইতে নামিয়াই আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল—মাণিকদা ভাল আছেন ত?

বেণীর বৌ আমাকে মাণিকদা বলিতেছে, নেহাৎ কানে না শুনিলে বিশ্বাস করা যায় না। আমি অবাক হইয়া বেণীর বৌয়ের দিকে চাহিলাম।

অধ্যক্ষ বসু তাহার নাম করণ করিয়াছেন 'অনিন্দিতা'। বেণীর বৌয়ের দিকে চাহিয়া মনে হইল সার্থক নাম করণ করা হইয়াছে।

অনিন্দিতা নমিতাদির একখানি চিঠি আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া পা বাড়াইয়া দিল। আজ আর বেণীর বৌয়ের সঙ্কুচিত পদক্ষেপ নাই। মাটির পৃথিবীতে সচ্ছন্দ গতিতে সে হাঁটিতে শিখিয়া আসিয়াছে। মুগ্ধ হৃদয়ে তাহাকে অনুসরণ করিলাম।

অনিন্দিতার অনুপ্রেরণায় আমরা আবার নূতন উদ্যমে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার কাজে লাগিয়া গেলাম। অনিন্দিতা গ্রামের মেয়েদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল। 'মহাত্মা গান্ধী-কী জয়' গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার মুখে মুখে ধ্বনিত হইল। সাগরের উদ্বেলিত জোয়ারের মত সমস্ত উপকূল ভাসাইয়া যেন এক নূতন বন্যা আমাদের প্রাণের দুয়ারে ধাক্কা দিল। কাহারও সাধ্য নাই সেই বন্যার গতিরোধ করিতে পারে। আর্তমানবের মূর্ত প্রতীক উদাত্ত কণ্ঠে আমাদের ডাক দিলেন—"দরিদ্রের লবণের উপরেও ইংরাজের শোষণ যন্ত্র বসান আছে। ইংরাজ দরিদ্রের প্রতি অন্নমুষ্টি হইতে কর আদায় করিতেছে। এই শোষণ যে কোন শক্তিতে বাধা দিতে হইবে।" মহাত্মাজীর আহ্বানে সমগ্র ভারত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভারতের আপামর-জনসাধারণ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে মহাত্মা বলিয়া অভিহিত করিল। দিকে দিকে দিকপাল সকল মহাত্মার পতাকাতলে আসিয়া জড় হইল। লবণ সত্যাগ্রহ, করবন্ধ আন্দোলন, মাদক দ্রব্য বর্জন করিতে পিকিটিং করিয়া দলে দলে লোকে কারাবরণ করিল। এত বড় বন্যার একটা ঢেউ আমাদের হরিশপুরেও আসিয়া পৌঁছিল। আমরাও আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

অনিন্দিতা ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল।

হরিশপুরে একটী লোকও চৌকীদারী ট্যাক্স দিল না। রায়সাহেব মধুস্থদন ভট্ট্যাচার্য গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি কাহাকেও ট্যাক্স দেওয়াইতে রাজী করাইতে পারিলেন না। পিটুনী পুলিশ, সৈন্যদল হরিশপুরের গ্রামবাসীদের ভয় দেখাইয়াও সংকল্পচ্যুত করিতে পারিল না। তারপরে শুরু হইল অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা। মধুস্থদন ভট্টাচার্যের সহযোগে গ্রামের লোকের অস্থাবর ক্রোক করা হইল। কিন্তু আশ্চর্য এই ক্রোকী মাল লইয়া যাইবার জন্য ইংরাজ সরকার মধুস্থদন ভট্টাচার্যের দুইটী গোগাড়ী ছাড়া আর কোন যানবাহন সংগ্রহ করিতে পারিল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া হুকুম দিলেন ঐ দুইটি গরুর গাড়ীতে মূল্যবান দ্রব্য বোঝাই করিয়া এবং গরু, ছাগল যাহা গ্রামে আছে তাহা তাড়াইয়া থানায় লইয়া যাইতে। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে পুলিশ কর্তব্যে মন দিল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া ক্রোকী মাল থানায় যখন যাত্রা করিয়াছে তখন অনিন্দিতা গ্রামের ও আশ্রমের যুবক যুবতিদের লইয়া পথে সত্যাগ্রহ করিল। ইংরাজ স্বৈরাচারের তাণ্ডব শুরু হইল। লাঠি ও বেটনের আঘাতে সত্যাগ্রহীদের জর্জরিত করা হইল। সন্ধ্যাবেলায় অস্তমান সূর্যের বক্তিম আভার সহিত সত্যাগ্রহী নর-নারীর রক্তে সেদিন হরিশপুরের ধুলি লাল হইয়া গেল। বন্দেমাতরম মুখরিত হরিশপুরের নর-নারী সেদিন ভারতের মুক্তি সাধনায় সকলের কণ্ঠে কণ্ঠ-মিলাইল।

এক বৎসর পরে আমরা সকলে জেল হইতে মুক্তি পাইলাম। মা এই অবকাশে আমাকে মুক্তি দিয়া স্বর্গারোহন করিয়াছেন। কিছুদিন হইতেই মায়ের সামান্য সামান্য অসুখ হইতেছিল। তাই প্রায়ই ছটুর বাড়ীতে তিনি থাকিতেন। জেল হইতে ফিরিয়া মায়ের খবর পাইলাম।

তিনি আমার জন্য আশীর্বাদ রাখিয়া গিয়াছেন যেন আমি দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারি। মায়ের আশীর্বাদ মাথায় লইয়া আবার আমরা আশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করিলাম। আমরা সকলে গান্ধী আরুইন চুক্তির সাফল্যের জন্য একান্ত আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

দুর্যোধনের মত মহাবলীকেও দুর্বল অঙ্গের জন্য কুরুক্ষেত্রে জীবন দিতে হইয়াছিল। ভীম যখন এই মহাশূরকে কোনরূপেই শৌর্যে বীর্যে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না তখন অলক্ষ্যে থাকিয়া নিয়তি ভীমকে দুর্যোধনের দুর্বল অঙ্গ দেখাইয়া দিল। মহানন্দে ভীম সেই অঙ্গে আঘাত করিয়া দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করিল। যে অনিন্দিতার যশঃসৌরভে চতুর্দিক আমোদিত, যাহার নেতৃত্বে হরিশপুরের নরনারী নির্বিশেষে সংঘবদ্ধ। মধুসূদন ভটাচার্যের মত জমীদার যাহার বিপক্ষাচরণ করিতে সাহস পায় না সেই অনিন্দিতাকে নিয়তির নির্মম বিধানে এই কঠিন ধরিত্রী হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল তাহার করুণ ইতিহাস স্মরণ করিলে আজও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

অমল নামে একটি সুন্দর বালক আমাদের আশ্রমে হাজির হইল। ছেলেটিকে দেখিলেই মনে হয়—যেকোন কাজের যোগ্যতা ইহার আছে। মধুসূদন ভট্টাচার্যের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হইলেও বর্তমানে তাহার সহিত জমীদার বাড়ীর কোন সম্পর্ক ছিল না। ছেলেটির আদর্শনিষ্ঠা দেখিলে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। আশ্রমের খুঁটিনাটি নিয়ম আমরা যদি না পালন করিতে পারিতাম তবে অমল আমাদের ছাড়িয়া কথা কহিত না। একবার গ্রামের ছেলেরা থিয়েটার করিয়াছিল তাহাতে সে ঘোর বিরোধিতা করে, সর্বাপেক্ষা মুস্কিলে ফেলিয়াছিল আমাকে। আমি থিয়েটারে বাধা দিই নাই তদুপরি আমি থিয়েটারের দিন তাহাদের প্রমটারের কাজ করিয়াছিলাম এই জন্য অমল আমার বিরুদ্ধে আশ্রমের

পরিচালক মণ্ডলীর নিকট অভিযোগ করিয়াছিল। যাহাদের আদর্শে সে বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে তাহারাই যদি দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয় তবে তাহারা আশ্রমে থাকে কী করিয়া? এমন কী অমল প্রায়োপবেশন করিয়া আমাদিগকে কর্তব্য পালনে বাধ্য করিবে এই অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছিল। আমলের এই অতিরিক্ত আশ্রম নিষ্ঠা দেখিয়া সেদিন মনে মনে বিরক্ত হইলেও আশ্রমের মর্যাদার জন্য আমি ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলাম। অমল আশ্চর্য নিয়মানুবর্তিতার সহিত আশ্রমের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিত। জেলে যাইয়াও এই ছেলেটিকে জেলেব নিয়মকানুন মানিতে কখনও অবহেলা করিতে দেখি নাই। অমলের কর্তব্য নিষ্ঠায় আশ্রমের সকলেই সশঙ্কিত থাকিত। অর্থাৎ অনেকক্ষেত্রে আমরা বাধ্য হইয়া অমলের জন্যই নিয়ম মাফিক চলিতাম।

অনিন্দিতা অমলকে খুবই পছন্দ করিত। দমদমে নাকি এইরূপ একটী ছেলে আছে যাহার প্রশংসায় সেখানের অধ্যক্ষ পঞ্চমুখ। তাহার তুলনা দিয়া অনিন্দিতা অমলের পক্ষাবলম্বন করিত। অল্পদিনের মধ্যেই অমল আশ্রমের ছেলেদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিল, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নাইট-স্কুল স্থাপনে ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতায় সে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইয়া উঠিল। আমার যদিও অমলের এই অতিরিক্ত নীতি বাগীশতা পছন্দ হয় নাই তবুও আমি এই লইয়া কোন মতামত কোনদিন প্রকাশ করি নাই। কারণ আমি জানিতাম কোন দুরূহ কাজের ভার দিতে হইলে অমলকেই ডাকিতে হইবে। আমাদের আদেশকে সে বেদবাক্য মনে করিত এবং সকল সময়েই সে আমাদের আদেশ শুনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিত। এইরূপ নিষ্ঠাবান বাহনের উপর আমরা কেহই শেষ পর্যন্ত বিরূপ থাকিতে পারিতাম না।

অনিন্দিতা ভিন্নগ্রামে কোথাও গেলে সচরাচর অমলকে সঙ্গে লইত।

কারণ আশ্রমের মত এমন পুত চরিত্রের বালক কমই আছে এই ছিল অনিন্দিতার ধারণা, আমরাও অনিন্দিতার ধারণাকে কোন দিন ভুল বলিয়া মনে করি নাই। কিন্তু কেন জানি না গোবর্দ্ধন অমলকে দু চক্ষে দেখিতে পারিত না। গোবর্দ্ধন মাঝে মাঝে বলিত—"মাণকে, এই ছোঁড়াটা বড্ড বাড়াবাড়ি ক'রছে। একে না সরালে আশ্রমের মঙ্গল নাই।" গোবর্দ্ধনের বিরক্তির কারণ বুঝিতাম, কারণ সে বাঁধাধরার মধ্যে একদম থাকিতে পারিত না—এইজন্য অমল মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করিত। প্রায় বলিত "এটা আশ্রম গোবর্দ্ধনদা, এটা যেন ভুলে যাবেন না।"

গ্রামের বাগ্দি-দুলেরা ছিল গোবর্দ্ধনের সর্বাপেক্ষা আপনজন। অমল যখন এই সকল বাগ্দিদের মদ খাওয়া লইয়া গালাগালি দিত এবং অনুযোগ করিত "গোবর্দ্ধনদা যদি বলে—তবে একদিনে ওরা মদ ছেড়ে দেয়। অথচ গোবর্দ্ধনদা এক দিনও তাদের মদ ছাড়ার কথা বলে না।" এইরূপ কথায় গোবর্দ্ধন বলিত—"দ্যাখ অমল ওদের খবর তুই কী জানিস্ বলত। মদ ছাড়া ওদের আর কী আনন্দ করবার আছে? ওদের যা দুঃখু ওদিকে মদ্ ছাড়িয়ে দিলে—ওরা হাসতে ভুলে যাবে।"

অমল বলিত—"কেন ওরা মদের বদল ভাল ভাল জিনিষ খেতে পারে। সেই পয়সায় দুধ মাছ এই সব খেতে পারে।"

গোবর্দ্ধন এই আর্বাচীনের কথায় সব সময় জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করিত না। অনিন্দিতাও অনেক বিষয়ে অমলের মতই অতিরিক্ত আদর্শনিষ্ঠা দেখাইত। এক এক সময় উভয়ের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আমাদের সকলের অসহ্য হইয়া উঠিত।

অনিন্দিতা তাহার নিজের বাড়ীতে থাকিত। শৈল নামে একটা আশ্রয়হীনা বালিকা অনিন্দিতার কাছে থাকিত। শৈল অত্যন্ত

গোবেচারা ধরণের মেয়ে। সাধারণ মেয়েদের মত সকল বিষয়ে সে সচেতন নয়। জড়বুদ্ধি না হইলেও সকল কথা সহজভাবে সে বুঝিতে পারিত না। আশ্রমের বা গ্রামের সকল লোকেই তাহাকে স্নেহ করিত। মেয়েটি বালবিধবা—তাহারও কোন নিকট আত্মীয় না থাকায় অনিন্দিতার নিকট সে আশ্রয় লইয়াছে। যদিও শৈলকে সকলে বোকা বলিয়া মনে করিত তথাপি আমি তাহাকে কোনদিন সেরূপ মনে করি নাই। দুঃখের ভারে সে বালিকা নুইয়া পড়িয়াছে তাই এ জগতে আর সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিত না। শৈলর প্রয়োজনীয় কোন কথা থাকিলে সে অতি সঙ্কোচে কেবলমাত্র আমাকেই জানাইত। এই নিরীহ মেয়েটীও অমলকে পছন্দ করিত না। একদিন শৈল চুপি চুপি আমাকে বলিল—"মাণিকদা অমলদার ব্যবহার বেশ ভাল লাগছে না। অনাবশ্যক সে অনিন্দিতাদির ঘরে এসে সময় কাটায়। আপনি তাকে বারণ করে দেবেন।"

আমি বলিলাম—"শৈল, অমল ত অনাবশ্যক সময় কাটাবার ছেলে। নয়।"

শৈল বলিল—কাজের অছিলাতেই সে সেখানে থাকে।

তা অনিন্দিতা কিছু বলে না?

আগে মাঝে মাঝে বলত কিন্তু এখনও সেও যেন চায়—অমলদা কোন না কোন কাজে সেখানে থাকে

শৈল ঠিক কী ইঙ্গিত করিতে চায় বুঝিতে পারিলাম না। তাহার কথার মধ্যে কী যেন একটা আভাব আছে যাহা আমার ধরা উচিৎ। কিন্তু শৈল এমনভাবে সাধারণতঃ কথা বলে যে তাহার গুরুত্বপূর্ণ কথাও হাল্কা করিয়া লওয়া আমাদের অভ্যাস। যদিও সে বয়সে যুবতি তথাপি আমরা তাহাকে অপরিণত মস্তিস্কের একটী বালিকা বলিয়াই মনে

করিতাম। তাই শৈলকে বলিলাম—না শৈল, তাতে এমন কিছু দোষ নাই। আর তাছাড়া আমি তাকে যদি কিছু বলি তবে সে দুঃখু পাবে এবং অনিন্দিতাও অপমান বোধ ক'রবে।

শৈল উত্তেজিত হইয়া বলিল—থাক্ দুঃখু। এখন থেকে যদি না সাবধান হওয়া যায় তবে অনিন্দিতাদির কপালে অনেক দুঃখু আছে।

শৈলর কথা শুনিয়া অপরিণত মস্তিষ্কের মেয়ের কথা বলিয়া আর মনে করিতে পারিলাম না। তাই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলাম—কী দুঃখু পেতে পারে শৈল?

শৈল আর আমার কথার জবাব দিল না। কেবল বলিল—আমি যা বলার বললুম—তখন যেন আমাকে দোষ পেতে না হয়, এরপর যা ভাল বোঝেন ক'রবেন।

অমলকে ডাকাইয়া বলিলাম—অমল তুমি অনাবশ্যক অনিন্দিতার বাড়ী যাবে না।

অমল উত্তর করিল—কেন বলুন ত?

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—এমনি বলছিলুম।

অমল বলিল—আমি বিনা কাজে যাই না।

আমি বলিলাম—বেশ ত সে কাজ আর কাউকে দিয়ে করিয়ে নিলেই হয়।

অমল আমার কথায় জ্বলিয়া গেল, বলিল—মাণিকদা আপনার এমন ছোট মন জানতুম না।

দৃঢ় কণ্ঠে বলিলাম—ছোট মনের কথা নয়। এতে তোমার এবং আশ্রমের উভয়েরই কল্যাণ হবে।

অমল পুনরায় জোরের সহিত বলিল—কারণ না দেখালে আমি যাওয়া বন্ধ ক'রব না। এতে আমি নিজেই ছোট হ'য়ে যাব।

অমলের একগুঁয়েমি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। ইতিপূর্বে কখনও সে আমার আদেশ অমান্য করে নাই।

অমলকে বলিলাম—আমার যাহা বলা কর্তব্য—তাহা বলিয়াছি এখন সে কথা শোন না শোন তোমার ইচ্ছা।

পরের দিন অনিন্দিতা আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। অনিন্দিতার বাড়ী গেলাম। খুব সম্ভব অনিন্দিতার শাশুড়ি মারা যাইবার পর এই আমি প্রথম তাহার বাটীতে পদার্পণ করিলাম। দেখিলাম অনিন্দিতাও বেশ উত্তেজিত হইয়া আছে। অনিন্দিতা আমাকে বলিল—মাণিকদা আপনি অমলবাবুকে আমার এখানে আসতে নিষেধ ক'রেছেন?

না ঠিক নিষেধ করি নি। তবে যাতায়াত কম ক'রতে বলেছি।

এতে আপনি কী ইঙ্গিত ক'রেছেন বুঝতে পারছেন?

এতে তোমারই কল্যাণ হবে বোন।

আমার কিসে কল্যাণ হবে আমি জানি না?

হয়ত জান, হয়ত জানও না। যাক্ তোমাকেও বলছি তুমিও তাকে আর প্রশ্রয় দিও না।

অনিন্দিতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিল—মাণিকদা আপনাকে ঠিক এমনটা ভাবি নি।

আমি হাসিয়া বলিলাম—"এতটা ছোট আমি" এইটা ভাব নি কী বল?

অনিন্দিতা থতমত খাইয়া বলিল—না তা বলছি না। কিন্তু আপনি আমাকে অবিশ্বাস ক'রবেন এ কথা আমি ভাবতেও পারি না।

একটুও অবিশ্বাস ক'রলে যদি তোমার কল্যাণ হয় তাতে দোষ কী অনিন্দিতা।

অনিন্দিতা ঘাড় বাঁকিয়া বলিল—দোষ নাই? আপনি আমাকে

মন্দ ভাববেন আর আমি তাই সহ্য করব? আপনার অধিকারের ত একটা সীমা আছে।

বুঝিলাম অনিন্দিতা আমার কথা শুনিবে না। তথাপি দৃঢ় কণ্ঠে বলিলাম—অনিন্দিতা মনে রেখ, আজ আমার জন্যই তুমি এত বড় হ'তে পেরেছ। আমি চাই তুমি আরও বড় হও। এমন কিছু আমি ক'রতে দিতে পারি না। যাতে তুমি লোক চক্ষে হেয় হয়ে যাও। আন্য কেউ হলে বলতুম না। তোমার সুনাম দুর্ণামের উপর আমার অনেকখানি নির্ভর করেছে। আমার কথা না শুনলে তোমাকে দমদমের আশ্রমে পাঠিয়ে দেব।

আমি এরূপ কঠিন ভাবে কথা বলিতে পারি অনন্দিতার তাহা অবিদিত ছিল। অনিন্দিতা আমার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—আমি মেয়ে মানুষ তাই আপনি আমাকে আজ অপমান ক'রলেন।

সস্নেহে বলিলাম—রাগ ক'রনা বোন। এতে তোমার কল্যাণই হবে তোমার উপর আমার এমন অধিকার নাই যে তোমাকে বাধা দিতে পারি তুমি আমার আশ্রিতও নয়। ইচ্ছে ক'রলে তুমি স্বাধীন ভাবে চলতে পার। কিন্তু মনে রেখে তুমি অনিন্দিতা হলেও বেণীর বৌ। এই বলিয়া অনিন্দিতার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম।

১১

খুব সম্ভব ইহার ছয় মাস পরে একদিন থানার দারোগা আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেম। থানায় লোকেরা এখন আর আগের মত ভীতির বস্তু নহে। পুলিশের অনেকেই এখন বরং আমাদের শ্রদ্ধা করিয়া চলে। আমি সন্ধার কিছু পরে থানায় হাজির হইলাম। থানার দারোগা বাবু আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া একটা চেয়ারে বসাইলেন। তার পর অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন—মাণিক বাবু—একটা সাংঘাতিক খুন হ'য়ে গেছে

আমার থানায়। যদিও আমি আপনার ক্ষতি ক'রতে চাই না তবুও খুব সম্ভব আপনি জড়িয়ে প'ড়বেন এই মকর্দমায়।

দারোগার কথায় আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। আশ্চর্য হইয়া বলিলাম—খুন হ'য়েছে—কে খুন হয়েছে ?

দারোগা বাবু একজন কনেষ্টবলকে ডাকিয়া আসামীকে লইয়া আসিতে বলিলেন। একটু পরে অমলকে হাতকড়া দিয়া লইয়া আসিল।

দারোগা বাবু হাসিয়া বলিলেন—এই ভদ্রলোক কে চেনেন ?

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম—হ্যাঁ এ ত আমাদের আশ্রমের ছেলে—খুব চিনি।

দারোগা বাবু বলিলেন—খুনের কথা যে বলছিলুম এটী এরি কীর্ত্তি। এই বলিয়া অমলের স্বীকারোক্তির কাগজখানি আমার সামনে ধরিলেন।

একটী নিষ্পাপ যুবকের প্রথম অপরাধের স্বীকারোক্তি—কোথাও কিছু গোপন নাই।

"আমার নাম শ্রী অমল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পিতার নাম ৺ গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাড়ী নারায়নপুর থানা বোলপুর জেলা—বীরভূম, আমি এই নিহত মহিলাকে চিনি। আমি হরিশপুর আশ্রমে থাকিয়া দেশের সেবা করিয়া আসিতেছি। এই মহিলার নাম শ্রীমতী অনিন্দিতা নিয়োগী। ইহার স্বামীর নাম ৺ বেণীমাধব নিয়োগী। এই মহিলা ও আরও অনেকে আমরা আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে সৈনিকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। জীবনে একটি মাত্র পাপ ছাড়া আমি জ্ঞানতঃ কোন পাপ করি নাই। একটি পাপ করিলেও যে বৃহৎ পাপ আমি করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। ফাঁসী হইলেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। আমি যাহাকে ভালবাসিয়াছি এবং আমাকে যে ভালবাসিয়াছে তাহাকে আমি স্বহস্তে খুন করিয়াছি। যে আমাকে বিশ্বাস করিয়াছিল তাহার

প্রতিদানে আমি বিশ্বাস হন্তার কাজ করিয়াছি। অনিন্দিতার রূপে ও গুণে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম সত্য কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই আমাদের মধ্যে অবৈধ প্রণয় হইতে পারে। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, আমাদের মাণিকদা এ বিষয়ে আমাদের উভয়কে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার সতর্ক বাণী শুনি নাই। শুনিলে আজ এই পৈশচিক কার্যের আমি নায়ক হইতাম না। কিন্তু উপায় ছিল না। আমরা অধিকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়া ছিলাম। আমরা ভাবিয়া ছিলাম আমাদের গোপন প্রণয় কোনদিন প্রকাশ পাইবে না। অনিন্দিতার মত ভাল মেয়ের সংস্পর্শে কখনও আসি নাই। তাহার চরিত্র মাধুর্যে আমি বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অনিন্দিতা তখন নির্দোষ ছিল এখনও নির্দোষ আছে। তাহার নিষ্কলুষ জীবনকে আমিই অপবিত্র করিয়াছি। সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে—আমি কী একটা কাজে অনিন্দিতার নিকট গিয়াছি। কিন্তু কাজ শেষ না করিয়াই চলিয়া আসিতেছিলাম—রাত্রি বেশী হইয়া যাওয়ায় আমি চলিয়া আসিতেছিলাম অনিন্দিতা রাগ করিয়া বলিল "কাজ না সেরে চলে যাওয়া আমি পছন্দ করি না।" অনিন্দিতার এই কথায় আমি কেমন যেন জ্ঞান হারা হইয়া গেলাম। অনেক রাত্রি হইয়াছে গৃহমধ্যে অনিন্দিতা ও আমি আর কেহ নাই। অনিন্দিতার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। অনিন্দিতা আমাকে বাকী কাজ শেষ করিয়া যাইতে বলায় আমি তাহার সে কথার কদর্থ করিয়াছিলাম। অনিন্দিতার নিকট রাত্রি যাপন করি ইহাই বুঝি অনিন্দিতা চাহে। আমার ভিতরের পশু প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। আমি জ্ঞান হারা হইয়া অনিন্দিতাকে আমার নিকট টানিয়া লইলাম। অনিন্দিতা বাধা দিল, যতখানি শক্তি ছিল ততখানি শক্তিতে সে বাধা দিল। কিন্তু আমার দানবীর শক্তির কাছে সে

পারিয়া উঠিল না। অবশেষে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। পাশের ঘরে শৈল বলিয়া একটি মেয়ে থাকে। সে চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসে। জানাজানি হইবার ভয়ে আমি ছুটিয়া পলাইয়া যাই। এই ব্যাপারের পর তীব্র অনুশোচনায় আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। একটী পত্রে অনিন্দিতার নিকট ক্ষমা চাহিয়া পাঠাই। আমি লিখিয়াছিলাম—আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। পত্র পাইয়া অনিন্দিতা আমাকে ডাকিয়া পাঠায়। আমি তাহার ক্ষমাশীল মনের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। কিন্তু মনের বনে যে আগুন লাগিয়াছে তাহা আমি নিভাইতে পারি নাই। অনিন্দিতা আমাকে চলিয়া যাইতে নিষেধ করিল। ইহার পর অনিন্দিতাকে আমি এড়াইয়া এড়াইয়া চলিতাম। কিন্তু কী আশ্চর্য অনিন্দিতা পূর্বের মতই সহজ ভাবে মিশিত। তাহার এই ব্যবহারে মৌখিক ভাবে আমি বহুবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু তখনও জানিতে পারি নাই যে সামনে আমাদের দারুণ বিপদ অপেক্ষা করিতেছে।

সেদিন ছিল দারুণ বর্ষা—কী একটা কাজে অনিন্দিতার বাড়ীতে আমি আটাকাইয়া পড়িয়াছি। শৈল কোথায় গিয়াছিল ফিরিতে পারে নাই। মধ্যাহ্ন হইলেও ঘনঘটায় মনে হইতেছিল যেন এখুনি রাত্রি নামিয়া আসিবে। অনিন্দিতা ও আমি, মাত্র দুইজনে বসিয়া আছি। আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। সেই দিনের কথা বারংবার মনে পড়িয়া যাওয়ায় আমি আর সেখানে থাকা সমিচীন মনে করিলাম না। বৃষ্টিতে ভিজিয়াই আশ্রমে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

অনিন্দিতা বলিল "পাগল নাকি—এই বৃষ্টিতে মানুষ বের হয় কোথাও, তাছাড়া আপনি ত জলে প'ড়ে ন'ড়ে নাই। আমার কলুষ মন অনিন্দিতার এই কথা সহজ ভাবে গ্রহন করে নাই। তাহার কথার ভুল অর্থ করিয়াছিলাম 'অনিন্দিতা আমাকে চাহে'। তাই বলিলাম

অনিন্দিতা আমাকে ত তুমি জান আবার যদি অন্যায় করিয়া বসি।

অনিন্দিতা সক্রোধে উত্তর দিল—কী মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? নিশ্চয়ই আমার মস্তিষ্ক খারাপ হইয়া ছিল। আমি বিদ্যুৎ গতিতে আবার অনিন্দিতার হাত ধরিয়া টানি। অনিন্দিতা বাধা দিলেও সে কেমন যেন শক্তিহীন হইয়া পড়িল। কাঁদিয়া বলিল—আমাকে রক্ষা করুন অমল বাবু, আমাকে রক্ষা করুন। সেদিনও আমি সম্বিত ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। আর আমি বেশীদূর অগ্রসর হই নাই। কিন্তু কী আশ্চর্য দুই দুই বার এইরূপ ঘটনা ঘটিবার পরেও আমরা সাবধান হই নাই। দ্বিতীয় বারের ঐ ঘটনাকেও তুচ্ছ মনে করিয়া উপেক্ষা করিলাম। সে আমাকে ভয় বা এড়াইয়া চলিতে মোটেই চেষ্টা করে নাই করিলে তাহার এমন বিষময় পরিণতি হইত না। এমনি করিয়া আমরা পরস্পরের যেন আরও নিকটে আসিয়া পড়িলাম। মনে হইল অনিন্দিতাও যেন ঠিক আগের মত নাই। সে আমাকে আগের চেয়ে বেশী প্রশ্রয় দিতে লাগিল। ঠিক এমনি সময় শৈলর কথায় মাণিকদা আমাকে ও অনিন্দিতাকে সাবধান করিয়া দিলেন। আমরা উভয়ে মাণিকদার কথায় ক্ষুব্ধ হইলাম। এই লইয়া আলোচনা করিলাম। আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম আমরা স্ত্রী পুরুষে ভেদবুদ্ধি না রাখিয়া বন্ধুর মত বাকী জীবন কাটাইয়া দিব। দুনিয়ায় আদর্শ স্থাপন করিব স্ত্রী পুরুষে যে নিষ্কলুষ ভাবে মেশা যায় তাহা জগতকে দেখাইব কিন্তু হায় সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সক্ষম হই নাই। কিছুদিন পরে টের পাইলাম অনিন্দিতার সন্তান হইবে। ভয়ে কী করিব, কূলকিনারা করিতে পারিলাম না। অনিন্দিতা আমাকে অভিশাপ দিল। এই পাপের সমস্ত দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপাইয়া সে প্রতিবিধান করিতে

বলিল। আমার উপর তাহার যেটুকু অনুরাগ সৃষ্টি হইয়াছিল বেশ বুঝিতে পারিলাম—তাহা কাটিয়া গিয়াছে। অনিন্দিতা দিবা রাত্র কাঁদিয়া কাটিয়া আমাকে অস্থির করিয়া দিল। আশ্রমের মধ্যে সকলেই জানে আমি পূত চরিত্রের যুবক। আমি কোন অন্যায় করিতে পারি না। কেবল মাণিকদাই আমার দুর্বলতার সন্ধান পাইয়াছিলেন কিন্তু তিনিও ইহাকে অত গভীর ভাবে দেখেন নাই। তিনি যদি এই বিষয়ে আর কিছু দিন লক্ষ্য রাখিতেন তবে অনায়াসে আমাদের দুর্বলতা ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক নহেন।

আমরা যুক্তি করিলাম, মাণিকদাকে আমাদের বিপদের কথা বলিব, কিন্তু পারিলাম না। কারণ মানিকদাকে আমরা উভয়েই উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছিলাম "মাণিকদার ছোট মন তাই তিনি আমাদের এইরূপ হীন ভাবেন" আজ কোন মুখে এই নিন্দনীয় কথা বলিব। আমার কোন বন্ধু নাই যে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার পথ বাতলাইয়া দেয়। অনিন্দিতা সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর দিয়া বারংবার আমাকে এই বিষয়ে প্রতিকার করিতে তাগিদ দিতে লাগিল। অথচ কী করিব আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। অবশেষে যুক্তি করিলাম "উভয়ে এই স্থান হইতে চলিয়া যাইব তারপর কোন অপরিচিত স্থানে যাইয়া যাহা হোক ব্যবস্থা করা যাইবে। অনিন্দিতা কিন্তু সহজে রাজী হইল না। কিন্তু আমি বলিলাম অন্য স্থান আমি ও তুমি স্বামী স্ত্রী রূপে থাকিলে কেহ সন্দেহ করিবে না। অনিন্দিতা আর কোন উপায় না পাইয়া আমার কথায় অবশেষে সায় দিল।

আশ্রমের কর্মসূচী লইয়া আমরা কোন এক গ্রামের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। আমরা বহুদূর হাঁটিয়া অজয়ের তীরে উপস্থিত হইলাম। অনিন্দিতাকে আমার যেন জীবনের বোঝা মনে হইতে লাগিল।

অথচ তাহার কোন ভাবনা চিন্তা আছে বলিয়া মনে হইল না। সে আমাকে নির্ভর করিয়া পরম নিশ্চিন্তে অজয়ের কূলে এক গাছ তলায় আমার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। আমি আশ্রমে জীবনের অধিকাংশ সময় মানুষ হইয়াছি। সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার সহিত আমার কোন পরিচয় নাই। আশ্রমের সংশ্লিষ্ট লোক ছাড়া আমার কোন চেনা শোনা লোকও নাই যে আমি সেখানে যাইয়া দাঁড়াই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি উন্মাদ হইয়া যাইবার মত হইলাম। হঠাৎ মনে হইল অনিন্দিতাকে হত্যা করিয়া আমি যদি আত্মহত্যা করি তবে সব সঙ্কট দূর হইয়া যাইবে। এই চিন্তা আমাকে পাইয়া বসিল। আমি দৃঢ় মুষ্টিতে আমার কোলের উপর পরম নিশ্চিন্তে যে নিদ্রা যাইতেছে সেই আনন্দিতার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলাম। অনিন্দিতা অমানুষিক শক্তিতে আমার বজ্রমুষ্টি ছাড়াইয়া উঠিয়া বসিল—ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল "অমল তুমি! আমাকে খুন ক'রবে? তুমি—"এই বলিয়া ভয়ে সে অজয়ের তীর ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিল। আমি ইহাতে আরও ভয় পাইলাম। মনে হইয়া গেল আমার এই হীন কাজ প্রভাত না হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে তাই পাগলের মত অনিন্দিতার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলাম। আমি নিজের জীবনও যখন শেষ করিব স্থির করিয়াছি তখন আমার ভয় কী। আমি অনিন্দিতাকে মুক্তি দিতে পারিতাম কিন্তু অনিন্দিতা বাঁচিয়া থাকিলে আমার হীন কাজের কথা প্রকাশ পাইয়া পড়িবে, তাই তাহাকে রেহাই দিতে পারিলাম না। আমি তখন পাগল হইয়া গিয়াছি। মনে হইতেছিল অনিন্দিতা আমার ভীষণতম শত্রু, যত কিছু ভয় তাহা হইতেই।

অল্পক্ষনেই অনিন্দিতাকে ধরিয়া ফেলিলাম। অনিন্দিতা ভয়ে আমার বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। আমার ভাবিবার অবকাশ ছিল না। আমি

শ্বাস রোধ করিয়া তাহার জীবনদীপ স্বহস্তে নির্বাপিত করিয়াছি। তাহার পর কী হইয়াছে আমি জানি না। প্রত্যূষে দেখি গ্রামের লোকেরা আমাকে বাঁধিয়া ও অনিন্দিতার শবদেহ লইয়া থানায় হাজির করিল।

আমি যাহা বলিয়াছি তাহার একটি কথাও মিথ্যা নহে। আমি স্বহস্তে অনিন্দিতাকে খুন করিয়াছি। আমি অপরাধী। ফাঁসিই আমার একমাত্র যোগ্য শাস্তি।"

দারোগাবাবু বলিলেন—ষ্টেট্‌মেণ্টে আপনার মত লোকের নাম রয়েছে। কিছু না হ'লেও আপনার সুনাম নষ্ট হ'য়ে যাবে।

আমি বলিলাম—কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

দারোগাবাবু উত্তর করিলেন—এ সব ব্যাপার বড় কঠিন মশায়। এখানে এক রকম ব'লল। আবার হাকিমের কাছে আর এক রকম বলবে। এখন এই তাজা খুন ক'রে এসেছে তাই বাঁচবার ইচ্ছা নাই। যত দিন যাবে তত ও প্রকৃতিস্থ হবে। তাছাড়া দূর সম্পর্কের হলেও গ্রামের জমীদার ওর আত্মীয়। তিনি এই সুযোগে আপনাকে কায়দায় ফেলতে ছাড়বেন না ব'লেই মনে হয়।

আমি ভীত কণ্ঠে বলিলাম—দারোগাবাবু শেষে আমি খুনের দায়ে প'ড়ব। জীবনভোর পরের মঙ্গল ছাড়া কোন কাজ করিনি। আপনি এর থেকে আমায় অব্যাহতি দিতে পারেন না ?

দারোগাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন পরে বলিলেন—আপনাকে এই ব্যাপারে জড়াতে চাই না। আপনার মত ভাল মানুষকে হাঙ্গামায় জড়িয়ে আমি শান্তি পাব না। বিশেষ ক'রে আমার স্ত্রী চান না যে আপনি এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন।

আমি দারোগাবাবুর মুখের দিকে চাহিলাম। দারোগাবাবু হাসিয়া

বলিলেন—হ্যাঁ মশায় হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধ। আরে – মশায় 'স্বদেশী' এখন পুলিশের ঘরে পর্যন্ত ঢুকে গেছে। মানে আমার স্ত্রী পুত্র সবাই আপনাদের শিষ্য। কেবল আমার চাকরি যাবার ভয়ে ওদের মিশতে দিই না। আমার স্ত্রী আবার ভয়ানক স্বদেশী—ওর কে খুড়তুত ভাই আছে তিনি নাকি মানিকতলা বোমার মামলার আসামী ছিলেন, সেই গরবে তিনি মাটীতে পা দিয়ে হাটেন না। যাক্ আপনাকে কী ক'রে ছাড়া যায় ভেবে দেখি। আচ্ছা এক কাজ ক'রতে পারেন, কিছুদিনের জন্য এখান হ'তে চ'লে যেত্তে পারেন ?

তাতে কী সুবিধা হবে।

শুধু চ'লে গেলে চ'লবে না। আশ্রমের লোককে সাক্ষী দিতে হবে যেন আপনি প্রায় একমাস হ'ল চেঞ্জে গেছেন। এরূপ সাক্ষী দেওয়াতে পারবেন ? তা হলে আপনার কোন ভয় থাকবে না।

আমি চিন্তিত হইয়া বলিলাম—কিন্তু এই মিছে কথা বলতে অনুরোধ করবো কী করে।

দারোগাবাবু দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—এই সবের জন্যই ত মরেছেন। ঐ ব্যাটা খুনে আপনাদের আশ্রমে না থাকলে এত বড় হত্যাকাণ্ড হত না। আপনারা সব নিজেদিকে কেষ্টবিষ্টু মনে করেন তাই আর ছোট হ'তে মন চায় না। এই যে খুনটা হল এটা ত কঠোর নীতি মেনে চলার প্রতিক্রিয়া।

আমি দারোগাবাবুর কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলাম না। তাই প্রশ্ন করলাম—আপনার কথার মানে বুঝতে পারলুম না।

দারোগাবাবু হাসিয়া জবাব দিলেন—আপনি হলেও ওকে খুন করতেন।

আমি দারোগাবাবুর কথায় মনে মনে চটিয়া গেলাম। কিন্তু তাহার

কথায় প্রত্যুত্তর দিতে সাহস হইল না। বিরক্তি দমন করিয়া কোন মতে বলিলাম—আমাদের সম্বন্ধে এত খারাপ ধারণা আপনার দারোগাবাবু।

দারোগাবাবু হাসিয়া বলিলেন—খারাপ হবে কেন? তা হলে কী আপনাকে ছেড়ে দিই। মানে আশ্রম টাশ্রম করে আপনারা এমন একটা সুনামের পর্ব্বতে দাঁড়িয়ে আছেন যে, সেখান হতে নামার সাধ্য নাই আপনাদের, অর্থাৎ লোক নিন্দাকে আপনাদের খুব ভয়। তাই নিন্দার টুঁটি টিপে মেরে দিতে চান। এই যেমন অমল করেছে। নইলে মশায় হামেসাই এইরূপ নৈতিক ত্রুটী বিচ্যুতি হচ্ছে, তাই বলে কে কবে খুন করেছে কাকে। যাক্ অপরাধ বিজ্ঞান চর্চার এটা সময় নয়। আপনি আজই তল্পী গুটিয়ে একদম বাংলা দেশ ছেড়ে পালান। আমি গোবর্দ্ধন ছাড়া আর কারও বড় একটা সাক্ষ্য নেব না, আপনার সম্বন্ধে। গোবর্দ্ধনকে ব'লে যাবেন, সে যেন না ভয় পায়। তাছাড়া অমলের ষ্টেটমেণ্টও আমি ফালতু কাগজে লিখেছি। সুবিধা মত ওটাকে তৈরী করতে হবে। আপনার নাম ত বাদ দিতেই হবে। আবার বুড়ো বয়সে চাকরির ভয়টাও আছে। যান শীগ্‌গীরি পালান, ভাগ্যে থাকে দেশ স্বাধীন হবে। এই মকর্দমা সেসেনে যাবার আগে যেন ফিরবেন না।

একপ্রকার জোর করিয়া দারোগাবাবু আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন। অনিন্দিতায় মত মেয়েকে নিষ্ঠুর ভাবে অমল হত্যা করিয়াছে! উভয়েই আমার হাতে গড়া মানুষ। মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল—তিনি অশ্রু সজল নয়নে বলিয়াছিলেন—"দেখিস বাবা আজ আমার কথা শুনলি না কিন্তু এই বেণীরে বৌয়ের জন্য তোকে একদিন ভুগতে হবে।" কিন্তু এমন করিয়া ভুগিতে হইবে স্বপ্নেও স্থান দিই নাই। ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বেণীর বৌকে মনে পড়িয়া গেল। সেদিন যদি তাহাকে আমার আশ্রয়ে টানিয়া না আনিতাম তবে হয়ত এই নিষ্পাপ শিশু আরও বহুদিন

পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করিতে পারিত। খোকার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া আমরা সেদিন তাহাকে জমীদারের বাড়ীতে পাঠাইতে সাহস করি নাই। সেখানে থাকিলে বেণীর বৌয়ের কতটুকু বিপদই বা হইত। বড়জোর সেখানে তাহাকে নারীধর্ম বিসর্জ্জন দিতে হইত। কিন্তু আমি কী তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম? আমার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার নারীধর্ম্ম ত নষ্ট হইলই সেই সঙ্গে অকালে তাহাকে এই সুন্দরী ধরণীর আলো-বাতাস হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। আমি নিজেকে কোন মতেই সান্ত্বনা দিতে পারিলাম না। অমল অনিন্দিতাকে হত্যা করে নাই, আমিই ইহার হত্যার কারণ। অসহায়া বালিকা পরম নিশ্চিন্তে অজয়ের কূলে তাহার হত্যাকারীকে আপনজন মনে করিয়া পরম নিশ্চিন্তে ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিল। যখন দেখিল সেই আপনজন তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন সে অজয়ের কূলে কূলে দৌড়াইতেছে। সে কী একবারও তার মাণিকদার কথা তখন ভাবে নাই। সেই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে কী তাহার একবারও মনে হয় নাই যে, এই হত্যাকারী মাণিকদার আশ্রয়ে থাকিয়া লালিত পালিত হইয়াছে। অমলকে ত সে বিশ্বাস করিত না, যদি আমি অমলকে বিশ্বাস না করিতাম। অনিন্দিতা, আমার কল্পনার নারী মূর্ত্তি অনিন্দিতা—ক্ষুদ্র বেণীর বৌ, জ্ঞানে কর্মে সুষমায় মহিমান্বিতা হইয়া অনিন্দিতায় রূপায়িত হইয়াছে, আজ তাহাকে সামান্য ভুলের জন্য কী ভীষণ মূল্যই না দিতে হইয়াছে। বৌদি আমাকে বলিয়াছে আমার দুঃখ মোচনের ক্ষমতা নাই—কিন্তু আমি এত দুর্বল যে অনিন্দিতাকে আমি রক্ষা করিতে পারিলাম না। রক্ষা করা দূরে থাক, জীবনের ভয়ে, কলঙ্কের ভয়ে কাপুরুষের মত আমি পলাইয়া যাইতেছি।

বাড়ী ফিরিয়া গোবর্দ্ধনকে সব কথা বলিলাম। গোবর্দ্ধন সব শুনিয়া

হতবুদ্ধি হইয়া গেল। আমি বলিলাম—গোবরা আমাকে এখুনি পালাতে হবে। দারোগাবাবু যে দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন এই খুব। গোবর্দ্ধন ও আমি তৎক্ষণাৎ ষ্টেসেনে রওনা হইলাম। গোবর্দ্ধনকে বলিলাম—তোর মন যায় আশ্রমে থাকবি নয়ত যেখানে খুশী থাকিস। আমার আশ্রমের সাধ মিটে গেছে। আমি কোথায় থাকব ঠিক নাই তবে যেখানেই থাকি পত্র দেব। তুই এখানের সব ঘটনার খবর দিস্।

গোবর্দ্ধন দুনিয়াটাকে হাল্কা করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত। আজ সেই গোবর্দ্ধনের মনও চিন্তাকুল দেখিলাম। বেণীর বৌ আমার চেয়ে তাহার বেশী স্নেহের কিন্তু সে একবারও তাহার নাম উচ্চারণ করিল না। আমি ভাগলপুর গামী ট্রেণে চড়িয়া বসিলাম। গোবর্দ্ধন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। আমি ট্রেণের পর ট্রেণ বদল করিয়া পরের দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে চুনার ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলাম। ষ্টেশনে একটী একা ভাড়া করিয়া চুনার সহর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। একরাত্রি একদিন যাত্রা করিয়া ক্লান্তি বোধ করিলেও এখানে আসিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

একাওয়ালা বলিল—কাঁহা যাইয়েগা বাবু?

উত্তর করিলাম—এখানে এই প্রথম আসিয়াছি যদি বিদেশী লোকের জন্য কোন আশ্রয় থাকে সেখানে লইয়া চল।

একাওয়ালা—বহুৎ আচ্ছা বলিয়া আমাকে সহরের উপকণ্ঠে একটি বাড়ীর সামনে নামাইয়া দিল। একাওয়ালা বাড়ীর মালিক এক বৃদ্ধা মহিলার সহিত কথা বলিয়া আমাকে দোতলার উপর ছোট্ট একটি ঘর দেখাইয়া দিল। একাওয়ালা ভাড়া ও বকসিস লইয়া চলিয়া গেল।

বাড়ীওয়ালী হিন্দিতে আমাকে বলিল—কলিকাতা হইতে এক বারবিলাসিনী এই সমুচ্চ মোকাম ভাড়া লইয়াছে। তবে তাহার সব

কামরা দরকার লাগে না। তাই একটি কামরা এখন দিলাম। তিনি কাশীজী গিয়াছেন ফিরিয়া যদি নারাজ হন তবে আপনাকে অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে হইবে।" বাড়ীওয়ালী এই বলিয়া অবশ্য আশ্বাস দিল—যে "ঐ জনানী খুব ভাল আদমি আছে হয়ত গররাজী না হইতেও পারে।" আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি সঙ্গে কোন বিছানাপত্র পর্যন্ত আনি নাই। বাড়ীওয়ালী দয়া করিয়া একটী খাটিয়া ও একটী কম্বল আমার ঘরে পাঠাইয়া দিল।

১২

ভগবান আছে কিনা এই লইয়া কোনদিন মাথা ঘামাই নাই। ব্রাহ্মণের ছেলে কোন দিন ত্রিসন্ধ্যা বা গায়ত্রীজপ করি নাই। রাজসাহীতে মণিকার ঠাকুরমায়ের তাগিদে ঐ কর্মটী সেখানে নিত্য করিতে হইত। রাজসাহী ছাড়িয়া আর ত্রিসন্ধ্যা ত দূরে থাক সামান্য ভগবানের নামও কোন দিন লই নাই। চুনারে আসিয়াও আমার চিন্তা গেল না। ভয়ানক একটা উদ্বেগ ও ভয় আমাকে কাতর করিয়া দিল। সন্ধ্যার পর গঙ্গা স্নান করিয়া কেন জানি না পতিত উদ্ধারিনী গঙ্গার স্তব করিলাম এবং বহুদিন পরে গঙ্গাগর্ভে দাঁড়াইয়া সন্ধাহ্নিক করিলাম। ভয় হইতেই ভগবানের উৎপত্তি। সেদিন আমি প্রাণভয়ে ভগবানের নাম লইয়া ছিলাম।

বাজারে যাইয়া সামান্য পুরি তরকারী খাইয়া ছোট্ট কুটরীতে খাটিয়ায় শুইয়া নিদ্রার আয়োজন করিলাম। গভীর রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দ্বিতলে, অন্য এক কক্ষে কে চমৎকার গান করিতেছে। বুঝিতে পারিলাম কলিকাতার সেই বারবিলাসিনী যাহার সহিত, আগামি প্রত্যুষে এই কক্ষে থাকিবার অধিকার লইয়া একটা বোঝাপড়া হইবে। তাহারই কণ্ঠ বিনিঃসৃত সুন্দর তান মান লয় সহযোগে একটী হিন্দী ঠুংরীর শব্দ ভাসিয়া

আসিতেছে।—"মেঘের দিকে চাহিয়া চাতক হাজার চীৎকার করুক বর্ষা কিছু চাতকের কথায় আসে না। আর চাতকের প্রয়োজন না থাকিলেও মেঘ করুণা ধারায় গলিয়া পড়ে। কিন্তু যে পিপাসার্ত তাহার ত তাহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না।" যিনি গান করিতেছেন তাহার গানে দখল আছে বুঝিলাম, সুন্দর কণ্ঠে অতি দরদের সহিত গান করিতেছে। গান শুনিয়া কিন্তু তৃপ্তি পাইলাম না, একে বারবণিতার কণ্ঠ নিঃসৃত গান তার উপর এই সুকণ্ঠির করুণার উপর আমার এখানে থাকা না থাকা নির্ভর করিতেছে। গানের পর গান চলিতে লাগিল। সুরের মাদকতায় সব ভুলিয়া গেলাম।

প্রত্যুষে এক বামাকণ্ঠের বাজখাঁই আলাপে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গত যামিনীতে যে কণ্ঠ হইতে মধু ঝরিয়া পড়িয়াছিল এই কণ্ঠ যদি তাহার হয় তবে ত রক্ষা নাই। গান শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম এমন যাহার কণ্ঠ নিশ্চয়ই সে করুণাময়ী। এই ঘর ছাড়া মানুষকে সে ঘর ছাড়া নাও করিতে পারে। চোখ মেলিয়া দেখি এক মধ্যবয়স্কা বাঙ্গালী মহিলা সম্মার্জনী হস্তে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তারস্বরে চীৎকার করিতেছে—এ আপদ কোথা হ'তে জুটলো গো। ও—মা সারা রাত ধ'রে এই মিনসে টা এখানে শুয়ে আছে। ওমা ভয়ে যে গা জল হয়ে যাচ্ছে। ওমা কী করি গো—এ মুখ পোড়া না ব'লে না ক'য়ে কোথা হ'তে জুটলো গো—। তার পর হিন্দিভাষায় বাড়ী ওয়ালীকে সম্বোধন করিয়া ডাকিতে লাগিল—এই বাড়ী ওয়ালী—ঘর কে না বোলকে না কয়কে মরদ মানুষ ঢোকা হ্যায়। তোম আও এখানে দেখ্ যাও।"

কিছু দূরের একটী কক্ষ হইতে তীরস্কৃত কণ্ঠে কে যেন বলিল—এই সরসী পোড়ার মুখী—সকাল বেলায় এত চেঁচ্চিস কেন? একটু ঘুমুতে দিবি—না?"

সরসী নীরস কণ্ঠে আরও জোরে চীৎকার করিয়া বলিল—ওমা এ ঘরে মরদ মানুষ যে।

উত্তর আসিল—মরদ মানুষে তোর আবার ভয় কবে থেকে হল। নে বাবুকে যত্ন ক'রে বসা, আজকের দিনটা তোর ভালই যাবে।

সরসী এই উত্তর পাইয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর উত্তরদাতৃর উদ্দ্যেশে বলিল—সকাল বেলায় তোমার রং প'ড়েছে যেমন। তারপর আমার দিকে চোখ মুখ পাকাইয়া বলিল—তোম বাঙালী হ্যায় না, খোট্টা হ্যায়। এখানে কেন আয়া হ্যায়। এ ঘর বেবাক আমরা ভাড়া নেওয়া হ্যায়।

আমি করুণাময়ীর দিকে চাহিলাম। কী উত্তর দিব ভাবিতেছি কিন্তু করুণাময়ী অধৈর্য হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেয়া বাত বলতা নাই কেন? তোম বোবা হ্যায়?

আমি হাসিয়া বলিলাম—আমি আদৌ বোবা নহি, তবে [illegible] মত ঝান্নু বাক্‌বাদিনী নহি। তাই চুপ করিয়া আছি।

সরসী আমার কথার মর্ম বুঝিতে পারিল না। সক্রোধে বলিল—কী বললি মিনসে—আমি ঝাড়ুদারণী, বাগ্দিনী, ও—মা গো—মিনসের যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। আমাকে বলছে ঝাড়ুদারণী, আমাকে বলছে বাগ্দিনী, আমাকে বলছে মেথরাণী—

উত্তর আসিল—বেশ বলছে—সকালে চেঁচালে আরও বলবে।

আমি বলিলাম—না লক্ষ্মী তোমাকে আমি বাক্‌বাদিনী বলিয়াছি মানে—সরস্বতী—

সরসী খুশী হইয়া বলিল—তাই বল—একটু পষ্ট ক'র বলতে হয়। তবে আমার নাম লক্ষ্মীও নয় সরস্বতীও নয়। আমার নাম সরসী—

আমি বলিলাম—ও তাই নাকি ? কিন্তু আমার উপর চ'টে গেল কেন বলত সকাল বেলায়।

সরসী অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া বলিল—চটব না। তুমি হ'লে মরদ মানুষ, আর আমরা হলুম মেয়ে মানুষ। বিদেশে বিভূঁয়ে আমরা এখানে একলাটী আছি, তোমাকে বিশ্বাস কী বল ?

আমি বলিলাম—কিন্তু আমি ভদ্রলোকের ছেলে—

সরসী ঘাড় মুখ নাড়িয়া বলিল—তবে ত আরও বিশ্বাস নাই। ভদ্দনোকেরাই ত বজ্জাতের ধাড়ি। ছোট নোকেরা ভদ্দনোকের মত গলা কাটা নয়। ভদ্রলোক বলিয়া সরসী আমাকে বিশ্বাস করিতে সংশয় প্রকাশ করিল।

আমি বলিলাম—ভদ্রলোকে তোমার কী ক্ষতি করলে সরসী—

[illegible] উত্তেজিত হইয়া বলিল—ক্ষতি করে নাই ? আমার অনেক [illegible]ছে সকাল বেলায় তা তোমাকে কী বলব বলত, ভদ্দনোকের [illegible] উচ্চারণ করতে ঘেন্না হয়। তা সকাল হ'য়েছে এখন তুমি কোথায় থাক [illegible]খানে যাও। এটা মেয়ে মানুষের ঘর এখানে তোমার থাকা [illegible]

[illegible] করুণকণ্ঠে বলিলাম—ঐ যে কে তোমার কথা জবাব দিচ্ছে তাকে বল না আমার হ'য়ে। আমি দিন কয়েকের মত এখানে আশ্রয় চাই।

সরসী আরও উচ্চৈস্বরে বলিল—কী বললে—আচ্ছ্য়ি চাই। মরদ মানুষ হ'য়ে মেয়ে মানুষের কাছে আচ্ছ্য়ি চাইতে লজ্জা হল না। আচ্ছ্য়ি হবে না এখানে।

আমার কণ্ঠস্বর আরও করুণ করিয়া বলিলাম—তুমি দয়া করলেই হয়। বামুনের ছেলে আমি নিরাশ্রয়, এখন কোথাই যাই বল।

সরসী আমার কথা শুনিয়া গলিয়া গেল একমুখ হাসিয়া বলিল—তাই বলতে হয় এতক্ষণ, তুমি যে বললে ভদ্দনোক তা বামুনের ছেলে তুমি। আমি মনে করলুম ভদ্দনোক। তবে দেখি মাকে বলে যদি রাজী হয়। তবে নিজেকে হাত পুড়িয়ে খেতে হবে কিন্তু, আমরা কলকাতা হ'তে বামুন আনি নাই। মায়ের শখ হল অনেকদিন নিজের হাতে রেঁধে খাই নাই চুনারে যেয়ে আমরা গরীব মানুষের মত নিজে হাতে রেঁধে খাব। সরসী আরও নরম হইয়া বলিল—আচ্ছা আমি মাকে বুঝিয়ে বলব। ভালই হল তুমি ত বাংলা দেশের লোক। এরা কেঁওড় মেওড় কথা বলে। তবু যাক কথা ক'য়ে আরাম হবে। যতই হোক তুমি আমাদের দেশের লোক, বিপদ আপদ হ'লে তুমি যতটা ক'রবে এরা কী তত ক'রবে। ভালই হল। তা বাবু ভাল মানুষের মত থেক। আমাকে যেন আবার দোষ পেতে না হয়। আমাদের দেশের লোক আবার যা নিমকহারাম্।

আমি সরসীর সকল কথায় সায় দেওয়ায় সে খুসী হইয়া চলিয়া গেল। আমিও দুর্গা নাম জপ করিতে করিতে গঙ্গাতীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

চুনারের দৃশ্য খুবই মনোরম। গঙ্গার তীরে চুনার দুর্গ অবস্থিত, দুর্গের একদিকে গা ঘেঁসিয়া গঙ্গা কলকল ধ্বনিতে বহিয়া যাইতেছে। নাতিউচ্চ একটী পাহাড়ের শিখর দেশে চুনার দুর্গ অবস্থিত। যদিও দুর্গ বলিয়া এখন আর কিছুই নাই তথাপি পাষাণ অট্টালিকা সেই পুরাণ দিনের স্মৃতি বহন করিতেছে। অদূরে ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী। শ্যামল শোভায় নবাগতের চিত্ত আকৃষ্ট করে।

বেশ কিছুক্ষণ গঙ্গার তীরে তীরে বেড়াইয়া আন্দাজ বেলা নটার সময় আস্তানায় ফিরিলাম। ঘরে আসিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম

দেখি আমার কক্ষের সামনে বারান্দায় একটী নূতন উনান করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র সকল কাছেই রাখা আছে। কিছু চা চিনি এবং একটী পাত্রে দুগ্ধ রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে চাউল, ডাল, ঘি, তৈল সকলই প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজান রহিয়াছে। আর সরসী অদূরে চিৎকার করিয়া বলিতেছে—আমি বামুন মনে ক'রে আচ্ছ্রয় দিলুম—ত এখনও আসার নাম নাই—বুঝলে মা বামুন ফামুন আর মানব না। ব'লব এ বেলার মত খেয়ে দেয়ে বিদেয় হও। আমি বাপু অত ঝক্কি পোয়াতে পারব না।

অন্তরালবর্তিনী মহিলা উত্তর দিল—তুইই ত ঝঞ্ঝাট বাড়ালি—আমি হ'লে তখুনি বিদেয় ক'রে দিতুম।

সরসী ঝঙ্কার দিয়া বলিল—আর ব'ল না মা—তবু যদি আমি তোমাকে না দেখতুম। কাঙ্গাল গরীব দেখলে রাস্তার লোককে ঘরে ঢোকাও—তোমাকে আর বলতে হবে না।

সরসীর মা সকৌতুকে বলিল—তা তোর সে লোক কাঙ্গাল গরীব কী—যে আমি রাস্তা থেকে ডেকে আনব ?

সরসী বলিল—কাঙ্গাল গরীব নাই বা হ'ল বামুন যে গো মা—কথায় বলে সাতরাজার ধ'নে বামুন ভিখিরী। এই বলিয়া আমি আসিয়াছি কিনা সরসী খোঁজ লইতে আসিল। আমাকে বারান্দার সামনে দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিল—ওমা এই যে ফিরেছেন। কী আক্কেল গো আপনার। মাকে বললুম আজ যদি কপাল গুণে বামুন পেলুম ত তার চা সেবা হলে আমরা চা খাব। বামুনের আগে খাই কী ক'রে। তা আমি যা বলি—মা তাই মান্তি করে। আপনার কী আক্কেল গো এত বেলা হ'ল আমরা একফোঁটা চা মুখে দিতে পেলুম না। মায়ের কী—তার অত বেজার বিরক্ত নাই। কী মানুষই না তাকে ভগবান গ'ড়েছে। চা খেতে না

পেয়ে কোথা রাগ হবে, তা না আমাকে রাগাবার জন্যে বলছে—ও সরসী—আজ তোর বামুনের ভীম একাদশী, আজ সে জল গ্রহণ ক'রবে না। কেন মিছে বেলা করছিস। হ্যাঁগো বামুনের ছেলে আজ ভীম একাদশী ?

আমি হাসিয়া জবাব দিলাম—তা ত জানি না। পাঁজীটা আনতে ভুলে গেছি। তোমার মায়ের কাছে জেনে এস ত ?

সরসী অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া বলিল—সে কি গো বামুন হ'য়ে পাঁজী আনেন নি। আর আমরা পাঁজী এনেছি। তা আজ যদি একাদশী তা স্পষ্ট ক'রে বলুন ?

আমি হাসিয়া বলিলাম—একাদশী আমি করি না।

সরসী হাসিয়া বলিল—বাঁচালেন বাবা। চায়ের জন্য মাথা ধ'রে গেছে। পোড়া অভ্যেস সকাল বেলায় এক ফোঁটা না হ'লেই নয় মায়ের আমায় অভ্যেস টভ্যেস নাই কিছু, হ'ল তাও ভাল, না হ'ল তাও ভাল। এমনি মানুষই হ'তে হয়।

আমি বলিলাম—সরসী তোমরা চা ক'রে খেলে না কেন ? আমি তেমন বামুন নই যে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রতে হবে।

সরসী জীব কাটিয়া বলিল—সে কী গো বামুনের আবার ছোট বড় আছে। জাতসাপ, তার ছোট বড় সবারই সমান বিষ। মানুষের কত ভাগ্যে তবে আপনাদের সেবা নেওয়া যায়।

সরসীর সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের খবর জানি না। সরসীর মনিবেরও পরিচয় জানি না। ব্রাহ্মণের উপর সরসীর ভক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি শুধু আহারের সুবন্দোবস্তেয় নহে, 'তুমি' ছাড়িয়া আপনি বলিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু সরসীর মনিবের কোন পরিচয় পাইলাম না। যাহা হোক ব্রাহ্মণ বলিয়া এখানে আশ্রয় পাইয়াছি। বেশী পয়সা কড়ি লইয়া

আসি নাই, ভাগ্য ক্রমে যদি আহারটা জুটিয়া যায় তবে মন্দ কী? এত বিপদেও ভগবানের করুণা আমার উপর আছে দেখিতেছি।

সরসীর অনুরোধে চা তৈরী করিলাম। সরসী অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। বাড়ীওয়ালীর মুখে শুনিয়াছি কলিকাতার কোন বারবনিতা বাড়ী ভাড়া লইয়াছে। কিন্তু বারবনিতার কোন আচার ব্যবহার দেখিলাম না। গত রাত্রিতে গান শুনিয়াছি ঠিক এবং প্রভাতে সরসীর প্রতি সরসীর মনিবের যে কৌতক পূর্ণ উত্তর শুনিলাম তাহাতে বুঝিয়াছিলাম সাধারণ ঘরের মহিলা ইহারা নহে। এত খানি বেলা হইয়া গেল কই সরসীর মনিব ত একবার কৌতুহল পরবশ হইয়াও আমার নিকট আসিল না। আসিবার কারণ অবশ্য কিছু ছিল না। কিন্তু যদি বারবনিতাই হয় তবে অপরিচিত আগন্তুক সম্বন্ধে এত খানি উদাসীনতাই বা তাহার কেন? কেন জানিনা সেদিন আমার ঐ মহিলাটির সম্বন্ধে প্রবল কৌতুহল হইয়াছিল। কিন্তু সে কৌতুহল মনের মধ্যেই রাখিয়াছিলাম এমন কী আকারে ইঙ্গিতেও সরসীর নিকট তাহার মনিবের সম্বন্ধে কৌতুহল প্রকাশ করি নাই।

অনভ্যস্ত হস্তে রান্না করিতে দেখিয়া সরসী নানা রূপ ঠাট্টা করিত। বলিত—মেয়ে মানুষেরও অধম এই সব পুরুষ মানুষরা। সরস আলাপে সারাদিন একরকম কাটিত মন্দ নয়। চুনারের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া কোনরূপে দিনের বাকী সময়টা কাটাইয়া দিতাম। সন্ধ্যায় যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম তখন শুনিতে পাইতাম সরসীর মনিব গানের রেওয়াজ করিতেছে। কী অপূর্ব কণ্ঠস্বর, কী দরদ দিয়াই না গান করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়া গানের চর্চা ছাড়িয়া দিয়াছি। সর্বপ্রকার সুকুমার শিল্প হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছি। শুষ্ক রাজনীতি করিয়া জীবন টাকে মরুভূমি করিয়াছি। মানুষ হইতে হইলে,

একটা গোটা মানুষ হইতে হইলে, জীবনে কত দিকে যে শিক্ষা করিবার বা উপভোগ করিবার আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরা দেশের জন্য যেমন একদিকে প্রাণ দেয়, অপরদিকে তেমনি জীবনকে কানায় কানায় উপভোগ করে। প্রাচ্যের, বিশেষ করিয়া ভারতের দর্শন, জীবনকে বঞ্চনার পথ যেমন করিয়া দেখাইয়াছে তাহা অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। এই বঞ্চিত জীবনকে একমাত্র 'সার্থক জীবন' এই কথাই ভাবিতে শিখিয়াছি। রাজার ছেলে গৌতম রাজত্ব ত্যাগ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু ঘরে ঘরে কত গৌতম যে ব্যর্থ জীবনের বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছে কে তাহার খবর রাখে। অমল অনিন্দিতাকে খুন করিয়াছে। কেন করিয়াছে বুঝিতে পারিতেছি। জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলির কোন দিনই যে অনুশীলন করে নাই, আশ্রমের কঠোর নীতিই যে জীবনের ব্রত বলিয়া লইয়াছিল, ভালবাসা বলিয়া তাই তাহার হৃদয়ে কিছু অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। কঠিন কর্তব্যের পরিবেশে প্রেমের স্থান কোথায়? প্রেম ত বাঁধা ধরা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার জিনিষ নহে। সে দুকূল ছাপাইয়া চারিদিক প্লাবিত করিয়া আপন খুশীমত সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যায়। সীমাহীনকে সীমার মধ্যে বাঁধা যায় না। তাই প্রেম গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। অমল নীতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ জীব তাই তার হৃদয়ে প্রেম অঙ্কুর লাভ করে নাই। অনিন্দিতাকে সে রক্তমাংসের ক্ষুধার তাগিদে আপনার আয়ত্বে আনিয়াছিল। কিন্তু তাহার ভয়াবহ পরিণতি দেখিয়া সে ভীষণ হইয়া উঠিল। তাই অনিন্দিতাকে হত্যা করিয়া বসিল। বিপদের মধ্যে আনন্দ আছে, দুঃখের মধ্যে যে সুখ আছে আঁধারের পাশে যে আলো আছে এ তত্ত্ব অমলের জানা ছিল না, জানা থাকিলে সে হত্যা করিতে পারিত না। কলঙ্কের পসরা মথায় করিয়া অনিন্দিতাকে লইয়া সে আর

একবার জীবন সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িত। অন্তঃপুর হইতে সঙ্গীতের সুমধুর স্বর শোনা যাইতেছে—

"প্রভু তুমি ভালবাস ব'লেই ত আমি অপরূপ করিয়া সাজিয়াছি। নতুবা আমার এ সজ্জায় প্রয়োজন কী? এই যে আমার কণ্ঠ, ইহার সার্থকতা কী যদি তোমাকে মুগ্ধ করিতে না পারিলাম। আমার যা কিছু দেখিতেছ ইহা তোমার চরণে নিবেদিত। আমি যে ভিখারীর মত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই তাহা তোমায় নৈবেদ্য ভরিয়া দিব বলিয়াই ত।"

গানের পর গান চলিতেছিল—মুগ্ধ হইয়া গান শুনিতেছিলাম। মনে হইল অনিন্দিতা যদি বারবনিতা হইত তবে তাহাতেই বা কী এমন দোষ ছিল। ফুল যদি অকালে ঝরিয়াই যায় তবে পুষ্প জীবনে সার্থকতা কী! অনিন্দিতা—আমাকে তোমার দুঃখের কথা, বেদনায় কথা, ভয়ের কথা, কেন বলিলে না। আমি যে তোমার জীবনকে প্রস্ফুটিত করিবার ভার লইয়াছিলাম—অকালে নিষ্ঠুর আততায়ীর হস্তে তুমি দলিত হও এ ত আমি চাহি নাই।

অন্তরাল বর্তিনী সুকন্ঠির সহিত আমার পরিচয় না হইলেও আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম তাহার করুণাও আমার উপর কম নহে। মনে মনে ভাবিতাম কলিকাতার কোন এক বারবনিতা আমার উপর এত দরদ কেন? কিন্তু এই লইয়া তখন আমার মাথা ঘামাইবার অবকাশ ছিল না।

সরসী প্রায়ই বলিত—মা এই রাঁধতে বললে—এই সব না খেলে সে আবার রাগ করবে। রান্না করিয়া কখনও খাই নাই তাই রান্না করিতে জানিতাম না। সরসী তাহার মায়ের হুকুমে দূরে বসিয়া রান্নার পদ্ধতি দেখাইয়া দিত। সরসীর দেব দ্বিজে অত্যন্ত ভক্তি। তাহার ধারণা এ জীবনে সে যে মহাপাতক করিয়াছে তাহা দেব দ্বিজের

সেবাতেই খণ্ডিত হইতে পারে। সেই জন্য কথায় কথায় আমার পায়ের ধূলা লইত বা আমাকে ভক্তির আতিশয্যে অস্থির করিয়া তুলিত। দিন কয়েক এইরূপে কাটিবার পর সরসী আসিয়া বলিল—মা বলছে তার কী ব্রত উদ্‌যাপন হয়েছে কিন্তু ব্রাহ্মণকে দান করা হয় নাই। তা আপনি কী আমাদের দান নেবেন?

সরসীর কথায় কী উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম। ইহাদের দয়ায় বেশ নিশ্চিন্তে খাওয়া-দাওয়া জুটিতেছে আবার ঋণের বোঝা বাড়ান কেন? তাই কী উত্তর দেওয়া উচিত তাহাই ভাবিতেছি।

সরসী চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি মাকে বলছিলুম সব বামুনে ত আমাদের দান নেয় না। তা আপনি নেবেন কী?

এরূপ করুণাময়ীদের আমি দান লইব না এ কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না। তাই সরসীর কথায় তৎপর জবাব দিলাম—আমি তেমন বামুন নই। আমি ত পূজা অর্চনার ধার ধারি না। তাছাড়া তোমাদের দেওয়া খাচ্ছি আর দান নিতে আপত্তি করব কেন?

সরসী বলিল—খাওয়া এক কথা আর দান নেওয়া আর এক কথা—মানে দানের সঙ্গে আমাদের পাপও ত আপনাকে নিতে হবে কিনা—এই ত শাস্ত্রে আছে।

আমি হাসিয়া সরসীকে বলিলাম—কী এমন পাপ ক'রেছ সরসী? যাও তোমার মাকে ব'ল খুব দান নেব। আমি যে পাপের বোঝা ব'য়ে বেড়াচ্ছি তার কাছে তোমাদের পাপ তুচ্ছ।

সরসী খুশী হইয়া বলিল—বল কী ঠাকুর তোমরা হ'লে বামুন—মানে দেবতা, তোমাদের আবার পাপ আছে। যাই মাকে বলিগে—তুমি দান দেবার ব্যবস্থা কর।

১৩

মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া সামান্য একটু নিদ্রা দিয়া চুনারের পাহাড় অভিমুখে বাহির হইলাম। সন্ধ্যার কিছু পরে বাড়ী ফিরিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যে আমার ঘরটী ভর্তি। ঘরটীর এক কোণে একটী নেয়ারের খাট পাতা হইয়াছে। খাটের উপর চমৎকার নূতন বিছানা পাতা। একটি মস্তবড় সুটকেশ ছোট একটী জল চৌকীর উপর রাখা আছে। সুটকেশের মধ্যে ধুতি-পাঞ্জাবী প্রভৃতি আমার সকল প্রয়োজনীয় জিনিষ ভরা। এরূপ অপূর্ব দানের কথা আদৌ ভাবি নাই বা দান দেওয়ার এমন পদ্ধতির কথাও শুনি নাই।

সরসী আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল—আপনার জন্য এই সব দান এনেছি বাবু। আমি নিজে কাশী হ'তে কিনে এনেছি। কেবল এই নেয়ারের খাটটা বড়ীওয়ালীর ছিল তার কাছ হ'তে কিনে নিয়েছি। এটা পুরোণো বলে মা খুঁত খুঁত ক'রছে।

আমি বললুম—তাতে কী, তাছাড়া তুমি মেয়ে মানুষ কাশী হ'তে কী অল্প সময়ে খাট কিনে আনতে পার। তবে এত সব জিনিষ দিতে গেলে কেন ?

সরসী বলিল—আমিও ভাবিনি বাবু। মা নিজে এই সব ফর্দ ক'রে দিলে। সুটকেশের মধ্যে আপনার জুতো কেনার টাকা আছে। ওটা ত মাপ না হ'লে হবে না। আপনি আবার খদ্দর পরেন তাই খদ্দরের কাপড়চোপড় এনেছি। আপনার একটা পরা পাঞ্জাবী নিয়ে গেছলুম সেই মাপেই জামা এনেছি। আর তাছাড়া সুটকেশে নগদ একশো এক টাকা আছে।

সরসীর মায়ের দান দিবার পদ্ধতি দেখিয়া আরও অবাক হইয়া গেলাম। ঠিক যে যে জিনিষের আমার দরকার সবগুলি যেন বিধাতা

অলক্ষে থাকিয়া সরসীর মায়ের মারফত পাঠাইয়া দিয়াছে। ভগবানের আমার উপর এতখানি করুণা তাহা ত ভাবি নাই। যে ভগবান সম্বন্ধে এত দিন মাথা ঘামাই নাই তাহার উদ্দেশ্যে মাথা নত না করিয়া পারিলাম না।

এইরূপে বেশ কয়দিন কাটিল। সরসী নিজে ত খোঁজ-খবর রাখিতই আবার অন্তঃপুর হইতে সরসীর মা যে আমার উপর সতর্ক স্নেহ দৃষ্টি রাখিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিতাম। কখনও সরসী আসিয়া বলিত—মা বারণ ক'রে দিয়েছে বাজারে যেন কিছু খাবেন না। এ দেশে খাবারে ঢাকা দেয় না, মাছি বসে। দরকার হলে কাশী হ'তে খাবার এনে দেব। আবার একদিন সরসী বলিল—মা বলছে এমনি শুধু শুধু বসে থাকতে যদি বিরক্ত লাগে—তবে বাবুকে জিজ্ঞেস করিস্—তা হ'লে কাশী হতে একটা চরকা এনে দেব। বসে বসে সুতো কাটবেন। খুব সম্ভব আমার খদ্দর প্রীতি দেখিয়াই সরসীর মা অন্তঃপুর হইতে কৌতুক করিয়া চরকার কথা বলিয়াছে।

সেদিন বৈকালে চুনারের দুর্গাবাড়ির অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি। চুনার হইতে প্রায় দুই মাইলের এই পথ, পাহাড়-ঘেরা গুহার মধ্যে সুন্দর দুর্গা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। অর্দ্ধপথ গিয়াছি দেখি—একটী অপূর্ব সুন্দরী রমণী নির্জ্জনে একটী পাথরের উপর বসিয়া গুণ গুণ শব্দে গান করিতেছে। ঠিক ঐ প্রস্তরটীর পাশ দিয়াই আমার রাস্তা, অন্য কোনপথে যাইবার যো নাই কারণ দুই দিকেই ঐ রূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরে রাস্তা অবরোধ করিয়া আছে। কিন্তু কাছে যাইয়া মনে হইলে এই রমণীকে যেন আমি কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু কোথায় দেখিতে পারি তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। চোখে চশমা, পায়ে মনোরম কারুকার্য করা নাগরা, হাতে সোনার চুড়ি, সীমন্তে সিন্দুর, চমৎকার বেনারসী কাপড় পরিয়া মনে হইতেছে যেন কোন শিল্পী একটী ছবি তৈরী করিয়া ঐ পাষাণের উপর বসাইয়া দিয়াছে।

এই শ্যামল বনশ্রীর মাঝে কৃচবরণ কন্যা কোন্ রাজপুত্রের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। আরও নিকটে যাইতেই বুঝিতে পারিলাম রমনীর বয়স তিরিশের কম নহে। চুনারে বহু বায়ুসেবী আসিয়া থাকে খুব সম্ভব ইনি তাহাদেরই কাহারও ঘরণী হইবেন।

আমি ঠিক তাহার কাছাকাছি হইতেই রমণী পরিষ্কার হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল—মাফ্ কিজিয়ে. বাবুজী কাঁহা জাঁতে হেঁ।

আমি হিন্দী আদৌ জানি না। বাঙ্গালীর মত বেশ-ভূষা হইলেও রমণী এই দেশীয় তাই আমার বাংলা ভাষা বুঝিতে পারিবে কিনা ভাবিয়া কোন-রূপে ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিলাম—আমি দুর্গামাই বাড়ীর দিকমে যাতা হায়। খুব সম্ভব আমার হিন্দীর দৌড় দেখিয়া রমণী হাসিল। তারপর সহাস্যে বলিল—হাম ভী যানে মাঙ্গতা, আপ হাম কো লে যাইয়ে গা? একেলা সামকো আগাড়ী যানে মে ডর লাগতা।

আমি কী উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। শাস্ত্রে আছে পথি নারী বিবর্জিতা। কিন্তু সে কোন নারী, নিশ্চয়ই এমন আধুনিক নারীর কথা শাস্ত্রকার বলেন নাই। মনের কোনে রস বলিয়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। নতুবা নির্জ্জন পাহাড় ঘেরা পথে যদি এমন সঙ্গিনী অযাচিতে উপস্থিত হয় তবে কোন পথিক তাহাকে অবহেলা করিতে পারে? কিন্তু বর্তমানে আমার মানসিক অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না। বিশেষ করিয়া স্ত্রীজাতি লইয়া আর ছেলে খেলা করিব না মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তাই এড়াইয়া যাইবার জন্য কোন প্রকার ভাঙ্গা হিন্দীতে জবাব দিলাম—মানে আপনি কী আমার মত দ্রুত হাঁটতে পারবেন? তাছাড়া হয়ত আমি দুর্গা বাড়ী অবধি নাও যেতে পারি। এমনি বেড়াতে এসেছি বইত নয়?

রমণী পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিল—আমিও বেড়াতে এসেছি।

দূর্গা বাড়ী অবধি যেতে হবে এমন কোন কথা নাই। আর জোরে হাঁটতে যাব কেন কী অভাগ্যি আমার, আপনি কী আস্তে হাঁটিতে পারেন না? রমণীর কথার মধ্যে খুব পরিচিতের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

আমি উত্তর দিলাম—তবে ইচ্ছে করলে যেতে পারেন।

রমণী উচ্চ পাথর হইতে কোনরূপে গড়াইয়া নামিয়া তাহার বস্ত্র সংযত কারিয়া বলিল—চলুন হাঁটা যাক্। আমি হাঁটিতে শুরু করিলাম। ইচ্ছা করিয়াই একটু দ্রুত যাইয়া রমণীকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিলাম।

রমণী উচ্চৈস্বরে বলিল—এই বুঝি আপনার আস্তে হাঁটা?

বাধ্য হইয়া দাঁড়াইতে হইল। রমণী নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিল আপনি বুঝি স্বদেশীওয়ালা?

উত্তর করিলাম—কেন বলুনত!

রমণী হাসিয়া উত্তর করিল—যা মোটা খদ্দর পরে আছেন।

রমণীর কথায় হাসিলাম কিন্তু কোন জবাব দিলাম না। সন্ধ্যার কিছু পরেই ফিরিলাম। রমণী সহরের রাস্তায় পড়িয়া একটি এক্কা লইয়া চলিয়া গেল। আমি বাড়ী ফিরিলাম।

কিছুক্ষণ পরে সরসী আসিয়া বলিল—মা জিজ্ঞেস করেছিলেন "আজ আপনি যে মেয়েটীর সঙ্গে বেড়াতে গেছলেন তাকে চেনেন না কী?"

আমি একজন মহিলার সঙ্গে ভ্রমণ করিরাছি তাহা সরসীর মা জানিল কী করিয়া! খুব সম্ভব আমাদের অগোচরে সেও বেড়াইতে যাইয়া লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। তাই জবাব দিলাম—কে আর হবে। চেনা কোনও কেউ নয়। সেও বেড়াচ্ছিল আমিও বেড়াচ্ছিলুম।

সরসী বলিল—মা বলছিল "বাবুকে বলে দিস দূর্গা বাড়ীর পথে ডাকিনীরা ঘুরে বেড়ায়। বাবুকে আবার গুণ করে ভেড়া বানিয়ে না দেয়।" সরসীর মারফত ছোট খাট কৌতুক তাহার মা করিয়া থাকে, আমিও

সেই সকল সরল কৌতুক উপভোগ করিয়া থাকি। কিন্তু আজিকার কৌতুক ভীষণ কৌতুক। কিন্তু আমিও কৌতুক করিয়া উত্তর দিলাম তোমার মাকে ব'লো সরসী—ডাকিনীদের আমিও চিনতে পারি। ভয়ের কোন কারণ নাই। সরসী হাসিয়া চলিয়া গেল।

পরের দিন কোন অদৃশ্য আকর্ষণে আবার দুর্গা বাড়ীর পথে পা বাড়াইয়া দিলাম। দেখি ঠিক সেই পাথরের উপর পূর্ব দিনের মহিলাটী তেমনি করিয়া বসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে।

আমি কাছে যাইতেই রমণী বলিল—আমিও ভাবছিলুম আপনি আসবেন এখুনি। কী বলুন? না এসে আপনার উপায় ছিল না।

আমি থতমত খাইয়া উত্তর করিলাম—না না আমি প্রায়ই এদিকেই আসি। রমণী হাসিয়া বলিল—তবে আমি যে গুণ করেছি এবং তার টানে আপনি এসেছেন এ কথা সত্যি নয়।

রমণী বলে কী! এযে সরসীর মায়ের কথার প্রতিধ্বনি। তবে কী এই মহিলাই সরসীর মা। আমি ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কিছু যদি না মনে করেন তবে জিজ্ঞসা করতে পারি কী, আপনার বাসাটা কোথায়?

রমণী হাসিয়া বলিল—কেন বাড়ী অবধি ধাওয়া করবেন না কি?

আমি লজ্জিত হইলাম এবং রমণীর ধৃষ্টতা দেখিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলাম। তাই উষ্ণ স্বরে বলিলাম—আমার অপরাধ হয়ে গেছে জিজ্ঞেস ক'রে।

না-না অপরাধ কেন। বলেন ত আজই আপনাকে বাড়ীতে নিয়ে যাব। আপনি কী আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে রাজী হবেন। চলুন না এখনি।

রমণীর সকল কথাই অস্বাভাবিক। তাহার ধৃষ্ট উক্তি আমাকে

সন্দেহাকুল করিয়া তুলিল। এ কোন শ্রেণীর নারী যাহার পথে অপরিচিত পুরুষের সহিত এই ধরণের হাসি ঠাট্টা করিতে বাধে না। যাহা হোক আমার অভদ্রতা দেখাইয়া লাভ নাই। তাই বলিলাম—আলাপ ত হল একদিন যাওয়া যাবে এখন।

রমণী হাসিয়া বলিল—জানতে পারলে বাড়ীতে রাগ করবে বুঝি?

আমি হাসিয়া জবাব দিলাম—বাড়ীতে আমার কেউ নাই।

তবে ত ভালই, আপনি ত আমার ওখানেই থাকতে পারেন?

আমি আপত্তি জানাইয়া বলিলাম—আমি যাহার আশ্রয়ে আছি, তিনি অত্যন্ত যত্ন করিয়া থাকেন, সেখানে আমার কোন অসুবিধা হয় না।

রমণী জিজ্ঞাসা করিল—কার আশ্রয়ে আছেন আমি জানতে পারি কী?

আমি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—যাহার আশ্রয়ে আছি তাহার পরিচয় আমার ঠিক জানা নাই।

রমণী ঠোট বাঁকাইয়া বলিল—ও-আপনার পরিচয় দেবার ইচ্ছা নাই তাই বলুন।

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম—তা কেন। আমি জানি না তাই বলছি।

রমণী পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বেশ আমিই না হয় আপনার অড্ডাটা দেখে আসি। সময় অসময়ে গল্প গুজব করা যাবে।

সরসীর মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল—ডাকিনী না হইলেও ইনি ডাকিনী সদৃশা। আমাকে ভেড়া না করিতে পারিলেও তাহার কথা অমান্য করিবার আমার শক্তি নাই। আর থাকিলেই বা কী এমন বেপরোয়া মেয়ে আমি কখনও দেখি নাই।

রমণী বলিল—চলুন আজ না বেড়িয়ে আপনার ওখানে আড্ডা দেওয়া যাবে। এই বলিয়া সে প্রস্তর হইতে নামিয়া পড়িল এবং সোজা হাঁটিতে

শুরু করিল। আমি এক প্রকার নিরুপায় হইয়া রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বাঁধা রাস্তায় পড়িতেই রমণী একা করিয়া আমাকেও একায় তুলিয়া লইল। আমার কোন আপত্তিই শুনিল না। একা আমার আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণী আগেই নামিয়া পড়িল। আমার নামা হইলে রমণী ভাড়া মিটাইয়া দিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এতক্ষণ ভাল করিয়া রমণীকে দেখি নাই। তাহার দিকে চাহিতেই মনে হইল সে যেন কী ভাবিতেছে। খুবই অন্যমনস্ক মনে হইল। আবার মনে হইল রমণী যেন কোন কিছু ঢাকিতে চাহিতেছে এমনি তাহার মুখ ভঙ্গী। অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া রমণী বলিল—যাই আগে বাড়ীর লোকের সঙ্গে আলাপ করে আসি—নইলে ভাল দেখায় না। এই বলিয়া সে দ্রুত বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। রমণী বাড়ীর মধ্যে যাক ইহা আমি চাহি নাই। কিন্তু সে নিষেধ শুনিবার পাত্রী নহে, তাই নিষেধ করি নাই। সে বাড়ীর ভিতর যাওয়ায় কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। বাড়ীর লোক কী মনে করিবে কে জানে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। আমি মুখ হাত ধুইবার জন্য বাহিরে গেলাম। নীচ তলায় কুয়া, সেখানে জল তোলা থাকে, সেখানে যাইয়া মুখ ধুইয়া ফিরিয়া দেখি—কে যেন আমার খাটে শুইয়া আছে। কাছে যাইয়া দেখিলাম কোন এক মহিলা শুইয়া আছে। বেশভূষা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম—যেই হোক আমার সাথী সেই রমণী নিশ্চয় নহে। আমার ঘরে ঢোকা ঠিক হইবে কিনা ভাবিতেছি এমন সময়ে—সেই মহিলা মধুর স্বরে ডাকিল—খুব যে লজ্জা দেখছি। মেয়ে মানুষকে এত ভয় করতে, শেখা হ'ল কবে শুনি? এসব শিক্ষা

বুঝি আশ্রমে থেকে হ'য়েছে। এই বলিয়া মহিলা খাটের উপর উঠিয়া বসিল।

মহিলাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম—এযে আমার বৌদি—আমার কানাইদার বৌ! এ কেমন করিয়া সম্ভব! সরসীর মায়ের কথা মত আমি ডাকিনীর কুহকে পড়ি নাই ত। আমার মস্তিষ্কের কোন গোলযোগ হয় নাই ত! এই স্থানে বৌদির দেখা পাইব এ যে কল্পনার অতীত। দীর্ঘ দশ বৎসর তাঁহার কোন খবরই জানি না। আর এখন অভাবনীয় ভাবে এই কক্ষে তাহাকে দেখিতেছি এ কথা কী ভাবা যায়।

বৌদি হাসিয়া বলিল—কী অবাক্ হয়ে গেলে যে ঠাকুরপো। আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলে না কি? আমাকে দেখে ডাকিনী বলে মনে হচ্ছে না কি?

আমি নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বৌদি হাসিয়া বলিল—কী মানুষ ভাই তুমি। আমার বাড়ীতে অতিথি হ'লে এতদিন. কিন্তু একদিনও জানতে ইচ্ছে হ'ল না যে, বাড়ীর মালিক কে? শেষে দুদিন ধ'রে এক সঙ্গে বেড়ালুম তাও চিনতে পারলে না।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—তুমি—তোমার সঙ্গে আমি এক্কায় চড়ে এলুম—বল কী! তা কখনও হতে পারে না।

বৌদি হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি আর আমি একসঙ্গে এক্কাতে এলুম। দেখলুম যখন দুদিনের মধ্যে চিনতে পারলে না তাই বাধ্য হে'য়ে সাবেকী পোষাকে দেখা করতে এলুম। তুমি ত আমাকে অত দামী পোষাক প'রতে দেখ নি কখনও।

আমি বৌদির কথায় সংশয় প্রকাশ করায় বৌদি বলিল—

হ্যাঁ গো হ্যাঁ—যে মানুষটীর বাড়ীতে অতিথি হয়েছ—যার সঙ্গে দুদিন ধ'রে বেড়ালে—আর যে মানুষটী এই ঘাটে ব'সে কথা ব'লছে এই তিনটি মানুষই এক। দেখছ ত মেয়ে মানুষরা কেমন বহুরূপীর বেশ ধ'রতে পারে। বৌদির কথায় আরও বিস্মিত হইলাম। এ কেমন করিয়া সম্ভব হয়। বৌদি ত এত সুন্দর গান জানিত না। আগে গান করিত বটে, কণ্ঠও মধুর ছিল, কিন্তু, তাহা ত এমন রাগরাগিনী সহযোগে গাহিতে শুনি নাই। সরসী বলিয়াছে তাহার মনিব ছাড়া দ্বিতীয় মহিলা আর কেহ নাই, যে অন্য কেহ গান করে। আর সীমন্তে সিন্দুর, হাত ভর্তি সোনার, চুড়ি আধুনিক পোষাকে সজ্জিতা মহিলাটী আমার সেই স্বল্পবাস পরিহিতা সহজ মানুষ বৌদি হইবে কী করিয়া? কই বৌদির কপালে ত সিন্দুর নাই। অথচ যাহার সহিত এই মাত্র বেড়াইয়া আসিলাম তাহার সীমন্তে সিন্দুর, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা দেখিয়াছি। তবে সেই মহিলা বৌদি হয় কেমন করিয়া। তবে তাহাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল বটে কোথায় যেন দেখিয়াছি। কিন্তু বৌদি হইলে কী চিনিতে দেরী লাগিত?

আমি বলিলাম—বৌদি তোমার এখনও সব কথাতেই রহস্য। আমি যখন বাড়ীর মালিককে দেখি নি তখন সে তুমি হতে পার কিন্তু যার সঙ্গে বেড়িয়ে এলুম সে অন্য মেয়ে।

বৌদি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—খুব ঠকিয়েছি কী বল—সিন্দুর আর চুড়িতেই চিনতে পারলে না। আজকাল বুঝি মেয়ে মানুষের দিকে ভাল করে চাওয়া হয় না, পাছে ব্রহ্মচর্য নষ্ট হ'য়ে যায়। যাক্ এতে আমি খুশীই হলুম। ভালবাসার লোক বেহাত হ'য়ে গেলে মেয়ে মানুষের বুকে বাজে কি না? সন্দেহ করার কিছুই নাই, মেয়ে মানুষ যতই খারাপ হ'ক, পথে ঘাটে

অপরিচিত মানুষ দেখলে তাই বলে গায়ে প'ড়ে কেউ আলাপ করে না আর রাস্তার মানুষ ঘর ঢুকলে তাকে জামাই আদরে সেবা-যত্ন নেয় না। আচ্ছা তোমার মনেও হল না বিদেশে বিভূঁয়ে এমন যত্ন করে রাজভোগ খাওয়াচ্ছে তার ত একটা কারণ চাই ?

আমি বলিলাম—সরসীর ব্রাহ্মণের উপর ভক্তি দেখে আমার সন্দেহ হ'য়ে থাকলেও কেটে গেছল ?

বৌদি হাসিয়া বলিল—খুব সংসারী বুদ্ধি দেখছি। এখনও আশ্রমের কাজই চলছে না বিয়ে থাওয়া করা হয়েছে ?

হাসিয়া বলিলাম—না বিয়ে করার অবসর পাই নাই। আর তাছাড়া বিয়ে কে দেয় বলত ?

বৌদি বলিল—কেন মা।

আমি বলিলাম—তিনি কবে মারা গেছেন।

বৌদি দুঃখিত হইয়া বলিল—সে কি তোমার মা মারা গেছেন ? তবে ত মুস্কিল। তুমি ত যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছ। তোমাকে আটকাবার লোক তা হ'লে আর কেউ নাই ?

আমি হাসিয়া বলিলাম—আমি ছেলে মানুষ না কি যে আমাকে আটকাতে হবে।

বৌদি উত্তেজিত হইয়া বলিল—ছেলে মানুষ না হলেও ছেলে মানুষের বেহদ্দ। যাক্ এখন অন্য সময় কথা পরে হবে। নাও চা তৈরী করে খেয়ে নাও। আমিও দেখি আমাদের রান্না বান্নার কত দূর ?

আমি রাস্তা আটকাইয়া বলিলাম—আবার আমি রাঁধতে যাচ্ছি। বাঁচালে এতদিনে,—রান্নার যা কষ্ট।

বৌদি হাসিয়া বলিল—তা এতদিন কষ্ট ক'রলে কেন ?

বাড়ীওয়ালী বললে—কলিকাতার কোন বারবনিতা এসেছে তাই আর—

বৌদি বলিল—বারবনিতারা বুঝি মানুষ নয়?

আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম—তা কেন? আমি জাত ফাত মানি না, তবে তারা খেতে দেবে কেন? তাই আর অনুরোধ করি নাই।

বৌদি মনে মনে খুশী হইল—বলিল—তা এখন আমাকে কী মনে হচ্ছে।

আমি বলিলাম—তুমি আমার বৌদি, আবার কী মনে হবে।

বৌদি বলিল—এই যে আমার ধন দৌলত টাকা কড়ি এসব দেখে কী মনে হ'চ্ছে।

সত্যই এই বিষয়ে আমি কিছুই ভাবি নাই। ইন্দ্রজালের মত বৌদি আমার সামনে কুয়াসা ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, এই সব ভাবিবার অবকাশ কোথায়? তাই উত্তর করিলাম—সে আমি কী ক'রে জানব?

বৌদি হাসিয়া বলিল—জানবার কৌতুহল হ'চ্ছে না।

আমিও হাসিয়া উত্তর করিলাম—হয়ত হচ্ছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি কেন? পরে জানলেই হবে।

বৌদি গম্ভীর হইয়া পড়িল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল—পথ ছাড়।

পথ ছাড়িয়া দিলাম, তারপর বলিলাম—আবার কখন দেখা হবে?

বৌদি যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে—কোনরূপে আমার দিকে মুখ ঘুরাইয়া বলিল—এখন ত আর ভিতর বার রইল না ঠাকুরপো, মন ক'রলেই ভিতরে যেতে পার। এই বলিয়া বৌদি ত্রস্তে বাহির হইয়া গেল।

বৌদির সহিত এই অভাবনীয় মিলনে আমি কেমন যেন বিহ্বল হইয়া গেলাম। এইরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না। ইহা যেন রূপকথার কাহিনী। খুনের দায়ে প্রাণভয়ে পালাইয়া আসিলাম আর বিধাতা কি না রঙ্গমঞ্চের অপর ধারে যতখানি সম্ভব আমার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এরূপ অসম্ভব ব্যাপার মানুষের ভাগ্যে ঘটে কি না জানা নাই। সেইদিন ধারণা হইল এইরূপ অঘটন ঘটাও সম্ভব। চুপ করিয়া খাটের উপর বসিয়া রহিলাম। বৌদির সম্বন্ধে অনেক কথা চিন্তা করিবার থাকিলেও সে বিষয়ে মন দিলাম না। বৌদিকে এখন যেমন দেখিলাম মনে হইতে লাগিল এমনই যেন চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি, তাই নূতন কোন জিজ্ঞাসা নাই। কিছুক্ষণ পরে সরসী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—ও ঠাকুরবাবু শীগ গীরি আসুন, মা কেমন ক'রছে—।

আমি সরসীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলাম—সরসী বলিয়া যাইতেছে—আজ মায়ের যেন কী হ'য়েছে। বেড়িয়ে এসে স্নান ক'রতে যেয়ে মাটীতে মাথা ঘষে সব সিন্দুর উঠিয়ে ফেলল,—তারপর স্নান ক'রে এসে মিহিপাড় ধুতি বের ক'রে প'রল। আমি জিজ্ঞেস করলুম ত হেসে বলল—"আমার স্বামী মরার খবর এসেছে,—আমি ত অবাক। তারপর আবার বাইরে বেরিয়ে গেল। খানিক বাদে ফিরে এসে মা যে আমার খাটের উপর প'ড়ল আর কোনমতে ওঠাতে পারি না। কেবল কাঁদছে আর মুচ্ছো যাচ্ছে। আমি মেয়ে মানুষ বিদেশে বিভূঁয়ে কী করি বলুন? আপনি একবার চলুন না, নাড়ীটা টিপে একবার দেখতেন।

আমি বলিলাম—আমার যাওয়া কী ঠিক হবে।

সরসী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—খুব ঠিক হবে। আর গেলেইবা এত আর গেরস্থর বৌ নয় যে কথা হবে। আপনি চলুন বাবু। এমন

মেয়েমানুষ ভদ্দনোকের ঘরেও জন্মায় না। কপালে ছিল কে খণ্ডন ক'রবে বলুন। তাই এই পথে এসে প'ড়েছে। আসুন বাবু শীগ্‌গীরি আসুন সেখানে এতক্ষণ আবার কী হ'চ্ছে কে জানে।

সরসীর পেছু পেছু যাইয়া বৌদির ঘরে প্রবেশ করিলাম—শুভ্র শয্যার উপর একগুচ্ছ যেন সোনার চাঁপা ছড়ান আছে। খাটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। বৌদি উপুড় হইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। আমি আস্তে আস্তে ডাকিলাম—বৌদি কাঁদছ কেন, কী হ'ল তোমার— ?

বৌদি উত্তর করিল না—। সরসীকে বলিলাম—তুমি একটু বাইরে যাও সরসী, এ আমার বৌদি হয়, আমাকে আজ চিনতে পেরে কাতর হ'য়ে প'ড়েছে। এখুনি সেরে যাবে। সরসী আমার কথা বিশ্বাস করিল কি না বোঝা গেল না। সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আমি বৌদির খাটের উপর বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। বৌদি যেমন কাঁদিতেছিল তেমনি কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ বৌদি আমার ডান হাতটী দৃঢ় মুষ্টিতে টানিয়া লইয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। অশোভন মনে হইলেও আমি বাধা দিলাম না। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুষ্টি শিথিল হইয়া গেল, বৌদি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এইরূপে সারা রাত্রি ধরিয়া মধ্যে মধ্যে জ্ঞান মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। সরসী নীচে একটা মাদুর পাতিয়া ভোরের সময় ঘুমাইয়া পড়িল। আমি সারা রাত জাগিয়া ভোরের সময় নিদ্রাভীভূত হইয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বুঝিতে পারি নাই। বেশ কিছুটা বেলা হইয়া গিয়াছে। জাগিয়া দেখি বৌদি স্নান করিয়া আমার পায়ের তলায় শুইয়া আছে। আমি উঠিয়া বসিলাম। বৌদি আমাকে উঠিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। আমি বলিলাম—উঠতে হবে না তুমি বরং একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর, সারা রাত খুব কষ্ট গেছে তোমার।

বৌদি বলিল—না এখন বেশ ভালই মনে হ'চ্ছে আর কোন কষ্ট হয় নাই। তোমাকে সারা রাত জাগিয়েছি। যাও স্নান ক'রে কিছু মুখে দাও, সারা রাত উপোস ক'রে আছ। এই বলিয়া বৌদি কাতর নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ঠাকুরপো আমি খাবার ক'রে দিলে খাবে ত ?

আমি বলিলাম—কেন খাব না—খুব খাব।

বৌদির দিকে চাহিলাম,—দেখি বৌদি পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া বিছানায় গড়াইয়া পড়িল

১৪

বৌদি যে বারবনিতার জীবন যাপন করিতেছে এবং সেই উপায়ে যে প্রচুর অর্থের মালিক এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাইলেও বৌদির ও সরসীর কথায় এবং তাহার মানসিক অবস্থা দেখিয়া আমার একটা ধোঁয়াটে আন্দাজ হইল। কিন্তু বৌদির উপর আমার কোনরূপ ঘৃণা হইল না। হয়ত কিছুদিন পূর্বে যদি বৌদির সহিত আমার দেখা হইত তবে আমি এই ব্যাপারটাকে এত সহজভাবে লইতে পারিতাম না কিন্তু অনিন্দিতা আমার দিব্যদৃষ্টি দিয়া গেছে। কীরূপ দুর্বল মুহূর্তে মানুষ অভাবনীয় কাজ করে সে শিক্ষা অনিন্দিতা জীবনের মূল্যে আমায় দিয়া গিয়াছে। যদিও বৌদির উপর আমার সেদিন ঘৃণা হয় নাই তবুও সেদিন মনে যে বেদনা পাইয়াছিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহার এই কাজকে দোষ দিবার কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও আমি যেন সমর্থনেরও কোন কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। বৌদি যে এত বড় একটা অপরাধ করিয়া বসিল এ কাহার দোষে ? তাহার নিজের না আমাদেরও অপরাধ আছে। অনিন্দিতার হত্যার পর আমার চিন্তার মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে।

আগে যখন কোন কিছু ভাবিতাম তখন যেন এক তরফা ভাবিতাম, যে অপরাধ করিয়াছে অপরাধের দায়িত্ব তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতাম। আজ সেই অপরাধের নূতন করিয়া বিচার করিয়া দেখিতেছি। যে অমল এতবড় নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করিল তাহারও কারণ খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং এই যুক্তিতে পৌছিয়াছি যে বাহ্যত অমল হত্যাকারী হইলেও আমার দায়িত্বও এড়াইবার উপায় নাই। তাই আমি নিজেকেও একজন অনিন্দিতার হত্যাকারী বলিয়া মনে করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। যে অনিন্দিতাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছি সেই অনিন্দিতা মৃত্যু বরণ করিয়া আমাকে যে আলোর সন্ধান দিয়া গেল তাহার স্বচ্ছ জ্যোতিতে আমার জীবন মন আলোকিত হইয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে এই ধরণীতে কোন কিছু মন্দ নাই, মন্দ থাকিতে পারে না, এমন কী ভাল মন্দ মিশিয়াও এ জগৎ স্মৃষ্টি হয় নাই। অখণ্ড ভালতে এই জগৎ পরিপূর্ণ।

স্নান করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে সরসী আসিয়া বলিল—মা এখন একটু ভাল আছে আপনাকে একবার ডাকছে। কেন জানি না। আমি বলিলাম—তোমার মাকে বলগে আমি এখন যেতে পারব না। তবে নেহাৎ দরকার হ'লে আমাকে ডেকো। মনে মনে যদিও বৌদির ডাকে মন সাড়া দিয়াছিল তবুও কেন জানি না মনের কোনে কোথায় যেন একটা ক্ষত লুকাইয়া আছে, বৌদির নিকট গেলে সেটী বাড়িয়া যাইবে। তাই বৌদির কাছে যাইতে মন চাহিল না—একটু একলা একটু নিরিবিলি থাকিতে ইচ্ছা হইল।

সরসী চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই দেখি বৌদি আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই সে মেঝেতে ধূলার উপর বসিয়া পড়িল। বৌদিকে দেখিয়া মনে হইল কে যেন তাহার সমস্ত শক্তি সমস্ত সুষমা হরণ করিয়া

লইয়াছে। গত রজনীতে যাহাকে শুভ্র শয্যায় একগুচ্ছ সোনার চাঁপা বলিয়া মনে হইয়াছিল আজ প্রভাতে তাহাকে ঝড়ে ওড়া ছিন্নমূল লতার মত মনে হইতেছে। যেন জীবনের সব কিছু অবলম্বন হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে আর যেন সে কোনদিন দাঁড়াইতে পারিবে না।

বৌদিকে নীচে বসিতে দেখিয়া বলিলাম—নীচে ব'সলে কেন বৌদি—খাটে এসে ব'স।

বৌদি অতি কষ্টে হাসিয়া বলিল—তোমার কাছে বসব? বল কী ঠাকুরপো, সে ভাগ্যি আমার আর হবে! যেখানে বসেছি এই যে আমার জায়গা। বৌদির মুখের দিকে চাহিলাম অবিরল ধারে তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। কী সান্ত্বনা দিব ভাবিয়া পাইলাম না। যদিও বৌদির অপরাধকে ক্ষমাই করিয়াছিলাম। ক্ষমার কথা দূরে থাক তাহাকে অপরাধী বলিয়া মনেও হয় নাই তবুও কোথায় যেন একটা বাধা একটা ব্যবধান আমাকে আর আগের মত তাহার নিকট টানিয়া আনিতেছে না। ঠিক যেন আগের মানুষটিকে খুজিয়া পাইতেছি না। যে বৌদি আমার সামনে বসিয়া আছে সেই বৌদির মধ্যে আমার আগের বৌদির কোন মিল আছে বলিয়া মনে হইতেছে না, তাই একান্ত নিবিড় ভাবে তাহাকে আপনার ভাবিতে কোথায় যেন বাধা মনে হইতেছে। যে বৌদিকে ভালবাসি আজ সে অপরাধের বোঝা মাথায় করিয়া আমার সামনে দাঁড়াইয়া আছে। সে ক্ষমা চায় কিনা জানি না, কিন্তু ভালবাসার দাবী লইয়া ক্ষমা বা তিরস্কারের অধিকার সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভালবাসার অনুভূতি আছে কিন্তু তাহার দাবী হারাইয়া তাহার স্থানে করুণা আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। তাই বৌদির বিগত জীবনের দুর্ভোগ যেন আমার মনের করুণার উদ্রেক করিয়াছে। মনে হইতেছে জীবন সংগ্রামে দেউলিয়া যে নারী—আমি তাহাকে

ভালবাসিতে যদি না পারি, আর আঘাত হানিব না। তাই সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলাম—বৌদি ছেলে মানুষের মত কাঁদতে আছে ?

আমার কথায় বৌদি আরও কাতর হইয়া পড়িল। আমি আর কোন কথা বলিলাম না। কান্নাই এখন বৌদির পরম সান্ত্বনা তাই তাহাকে কাঁদিতে আর নিষেধও করিলাম না।

বহুক্ষণ এইরূপে কাটিবার পর বৌদি জিজ্ঞাসা করিল—এখানে কী ক'রে এলে ?

আমি হাসিয়া বলিলাম—খুব সম্ভব ভগবান এনে দিয়েছে।

বৌদি বলিল—আমি যে আর তোমার কোনদিন দেখা পাব সে আশা করি নি। এমন দুর্ভাগ্যের দিনে আমার পোড়া মুখ নিয়ে তোমাকে আমি দেখা দোব এও আমি ভাবি নি ঠাকুরপো !

বৌদির কাছে আমার মনের ক্ষত যাহাতে প্রকাশ না হইয়া যায়, সেইরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বৌদির কথার উত্তর দিলাম—আমিও যে তোমার দেখা পাব বৌদি এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তুমি যে কত বড় অভিমান নিয়ে চলে এসেছ তা আমার মনে সব সময়েই জাগরূক আছে। স্বেচ্ছায় যে তুমি আমাকে দেখা দিতে না, তা আমি জানি। এখানে যে আমাদের দেখা হল তার জন্য তুমি দায়ী নও, আর আমিও প্রস্তুত ছিলুম না।

বৌদি মলিন হাসিয়া বলিল—ঠাকুরপো আমার কথা তুমি মনে রেখেছিলে— ?

হাসিয়া বলিলাম—তোমার কী মনে হয়।

বৌদি বিষাদমাখা কণ্ঠে বলিল—আমি যে আর কিছুই মনে করতে পারছি না ঠাকুরপো—এই কথা বলিয়া বৌদি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—

তোমাকে দেখার আগে আমি কেন পাগল হয়ে গেলুম না ঠাকুর পো। পাগল হ'য়ে যাওয়া যে ঢের ভাল ছিল।

আমি সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলাম—কেন তুমি মিছে কাঁদছ বৌদি আমি কিছুই মনে করি নি। আর তাছাড়া আমার মনে করার মত মনও আমি হারিয়ে ফেলেছি।

বৌদি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তোমার সারা রাত খাওয়া হয় নাই। যাও চা তৈরী ক'রে নিয়ে কিছু মুখে দাও।

আমি হাসিয়া বলিলাম—চা এখন আর খাব না—তুমি একটু সুস্থ হ'য়ে চা ক'রে দেবে—তবে খাব।

বৌদি কাঁদিল না কিন্তু কাঁদিতে পারিলে ভাল করিত—বৌদি কেমন যেন পাগলের মত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি ভয় পাইয়া গেলাম—মনে করিলাম বৌদি পাগল হইয়া যাইবে না ত? তাই বৌদিকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বলিলাম—চল না দুজনে মিলে চা করা যাক. আমিই তৈরী ক'রে নেব, তুমি আমাকে সাহায্য ক'রবে। মনে মনে ঠিক করিলাম আমার ব্যবহারে বৌদি যেন কোন ত্রুটী দেখিতে না পায়। বৌদির কাছে আমি ছোট হইতে পারিব না। তাই আরও তাগিদ দিয়া বলিলাম—ওঠ বৌদি চল চা করিগে—।

বৌদি আমার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি মানুষ, না দেবতা?

আমি হসিয়া বলিলাম—আমি মানুষও নই দেবতাও নই আমি তোমার মাণিক ঠাকুরপো। তোমার গোয়াবাগানের মাণিক ঠাকুরপো তোমার হরিশপুরের ঠাকুরপো—চুনারেও তোমার আমি সেই মাণিক ঠাকুরপো।

বৌদি যেন এই কথাটাই শুনিবার জন্য পিপাসিত কর্ণে অপেক্ষা করিতেছিল, আমার কথা শুনিয়া যেন কিছুটা সে সান্ত্বনা পাইল—অনেকটা

মনে জোর পাইল। তারপর ধীরে ধীরে উত্তর করিল—তা আমি জানি ঠাকুরপো, তোমার মত বড় মন কারই বা আছে। এই জানি বলেই ত নিজেকে গোপন রাখতে পারলুম না। মনে করেছিলুম এ মুখ আর তোমাকে দেখাব না কিন্তু পারলুম না ঠাকুরপো। আমি যে সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। যে শক্তির জোর গোয়াবাগান হ'তে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, যে শক্তির জোরে তোমার সাহায্যের অপেক্ষা না করে মৌগাঁ হতে চলে এসেছিলুম সে শক্তি সে আত্মনির্ভরতা আর আমার নাই। ইচ্ছে ক'রলে আমার এই পরিচয় তোমার কাছে গোপন রাখতেও পারতুম কিন্তু সে ইচ্ছেও হ'ল না। তোমাকে ত আমি কোন দিন ফাঁকি দিতে চাই নি, তবে আজ আবার ফাঁকি দেব কেন? তাই তোমার কাছে আমার নিজেকে গোপন রাখতে মন চাইল না। মনে হল তখন যেমন ফাঁকি দিই নি এখনও তেমনি কোন ফাঁকি কোন গোপনতা রাখব না তাতে যে শাস্তিই আমাকে পেতে হ'ক। বৌদি চোখের জলে এই সকল কথা বলিয়া যাইতেছে।

আমি বলিলাম—বৌদি তুমি বিশ্রাম করগে, আজ তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। রান্না বাড়া আজ আর থাক, বাজার হ'তে পূরী তরকারি যা হোক আনিয়ে খেলেই হবে। এই বলিয়া বৌদিকে একপ্রকার জোর করিয়া উঠাইয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিলাম। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে আমার চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিতেছিল আমি শুইয়া পড়িলাম।

মধ্যাহ্ন হইয়া গিয়াছে। চুনারের পাহাড় গুলা খর রৌদ্রে যেন সদ্যো বিধবার মত সমস্ত আভরণ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উপুড় হইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। মধ্যহ্নের উষ্ণ বাতাসে যেন তাহারই দীর্ঘ শ্বাস শোনা যাইতেছে। একটু পরে সরসী আসিয়া বলিল—বাবু আমার একটী কথা রাখবেন? এ জন্মে ত মহাপাতক ক'রে এসেছি পাতকের আর বাকী কী,

না হয় আরও পাতকী হব, তা আমার যদি একটী কথা রাখেন ত বলি।

আমি বলিলাম—কী কথা সরসী ?

সরসী জোড় হস্তে বলিল—মায়ের মুখে একটুও জল দিতে পারি নাই খালি ব'লছে "আমার নিজের লোককে যদি হাতে ক'রে খাওয়াতে না পারলুম তবে এ জীবন রাখব না।" তা বাবু আপনি ওর কে হন জানি না। মা আপনাকে ঠাকুরপো ব'লছে, তাহলে আপনি আমার কাকা বাবু হলেন, আপনাকে বাবু একটী বারের জন্য মায়ের হাতে খেতে হবে। দেশে যেয়ে না হয় প্রায়শ্চিত্ত ক'রবেন। তা না হ'লে মা কিছুতেই একফোঁটা জল খাবে না।

সরসীর কথায় হাসি পাইল বৌদির অপরাধকে অপরাধ বলিয়াও যদি মনে করিতাম তবে তাঁহার হাতে না খাওয়ার কথা ভাবিতেও পারিতাম না। এতদিন উহারাই সঙ্কোচ করিয়া আমাকে খাইতে দেয় নাই। আমিও তাহাদের এই অযাচিত সাহায্যের অধিক আর আশা করি নাই।' যদি তাহারা আমাকে স্বহস্তে খাদ্য পরিবেশন করিত তবুও তাহারা কী জাতি কেমন লোক কিছুই প্রশ্ন করিতাম না। তাই বলিলাম—সরসী প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কেন ? তোমরা কী মানুষ নও। খুব খাব একশবার খাব, তুমি বৌদিকে বলগে। সরসী ঢিপ করিয়া আমাকে প্রণাম করিল। তারপর বলিল—বাঁচালেন কাকা বাবু, আমার মাকে বাঁচালেন, আমাকে বাঁচালেন।

ভাতে ভাত করিয়া বৌদি আমাকে খাইতে দিয়া পাখা লইয়া পাশে বসিল, আমি বৌদির মনের বোঝা হাল্কা করিয়া দিবার জন্য বলিলাম—আজ যে বড় খাওয়াবার আগ্রহ দেখছি। গোয়াবাগানে সেদিন না খেতে দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলে মনে আছে, আজ ত তার আমি প্রতিশোধ নিতে পারতুম ?

বৌদি পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ স্বরে বলিল—প্রতিশোধ নিতে আর বাকী কী রাখলে ঠাকুরপো। মৌগাঁয়ে সামান্য খুদ-কুঁড়ো খাইয়ে যে তৃপ্তি পেয়েছি কই সে তৃপ্তি ত পেলুম না। তোমাকে খাইয়ে আজ কী মনে হ'চ্ছে জান?

কী মনে হ'চ্ছে বৌদি?

মনে হ'চ্ছে আমার অপরাধের স্বীকৃতি তোমার কাছে জোর ক'রে আদায় করে নিচ্ছি।

বৌদির কথাটা খানিকটা সত্য মনে হইল। আমার খাওয়া না খাওয়ার প্রশ্ন হইতেছে না কিন্তু বৌদির এই জিদের অন্য কোন হেতুই খুঁজিয়া পাইলাম না তাই উত্তর করিলাম খাইয়ে যদি তৃপ্তিই না পাও তবে তুমি জিদ ক'রতে গেলে কেন?

তৃপ্তি পাচ্ছি না কী বলছ ঠাকুরপো—আমি যতই ছোট হই না কেন, তুমি যে কত বড় তা ত আমার অজানা থেকে যেত?

আমি হাসিয়া বলিলাম—যত বড় ভাবছ তত বড় আমি নই। সরসীর সঙ্গে যুক্তি ক'রে এসেছি তোমার খাতির রাখবার জন্য না হয় দুদিন খাওয়াই গেল। তারপর বাড়ীতে যেয়ে রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত ক'রে শুদ্ধ হওয়া যাবে।

বৌদি হাসিয়া বলিল—তা তুমি পারবে না ঠাকুরপো তোমার মন এত ছোট নয় যে তুমি আমার হাতে খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে যাবে।

আমি কৌতুক করিয়া বলিলাম—আপন মানুষকে পর করারও ত একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাই প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে উপায় কী বল।

বৌদি আমার কথার মর্ম বুঝিতে পারিল না তাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। বৌদি আমার সহিত অতি সতর্কতার সহিত কথা কহিতেছে। পূর্বের সেই তেজ তাহার কথার মধ্যে আর

নাই। আজ যেন বৌদির কথা শুনিয়া মনে হইতেছে মৃতের কণ্ঠস্বর শুনিতেছি। তাই বৌদিকে আর দুঃখ দিবার ইচ্ছা হইল না। তাই বলিলাম—আমার কথা বুঝিতে পারলে না বৌদি—আমি যে তোমাকে ধ'রে রাখতে পারিনি তার প্রায়শ্চিত্ত ত ক'রতে হবে আমাকে।

বৌদি আমার কথায় খুসী হইয়া বলিল—কে বললে তুমি ধ'রে রাখতে পারনি। আমিই ত চ'লে এসেছি ঠাকুরপো।

আমি বলিলাম—তুমি ত এমনি আসনি। আমার শক্তির ওজন বুঝেই ত চ'লে এসেছ।

বৌদি আর কোন কথা বলিল না, কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। আমার আহার শেষ হইতেই উঠিয়া পড়িলাম। মধ্যাহ্ন সূর্য পশ্চিমে অনেকখানি হেলিয়া পড়িয়াছে। উষ্ণ বাতাসের হা হা দীর্ঘশ্বাস থামিয়া গিয়াছে, চুনারের পাহাড়গুলা যেন মূর্চ্ছা ভঙ্গে উঠিয়া বসিয়াছে। গোয়াবাগানের বৌদির মধ্যে যে অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাষ দেখিয়া আসিয়াছিলাম এখন মনে হইতেছে সে আগুন যেন নিভিয়া গিয়াছে। বৌদির বেদনাকাতর মুখমণ্ডলে সে দিনের অপূর্ব দীপ্তির আভাষ না থাকিলেও একবারে ম্লান হইয়া যায় নাই, অস্তমান সূর্যের রক্তিম আভার মতই বৌদির সুন্দর মুখমণ্ডল বেদনায় লাল হইয়া গিয়াছে। লীলা চঞ্চল চক্ষু দুইটী যেন ক্লান্ত হইয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। একটা উর্দ্ধমুখীন চাতক পিপাসায় আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যেন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বৌদিকে দেখিয়া মনে হইল আমার অতিপ্রিয় হারাণ বস্তুকে যখন খুঁজিয়া পাইলাম তখন সে বস্তুর প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে।

১৫

অল্প বেলা থাকিতেই বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলাম। কোন অজ্ঞাত আকর্ষণে সেই পাথরটার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পাথরটাকে

দেখিয়া মনে হইল যেন একটা নির্জীব পাষাণ মাত্র অথচ কী আশ্চর্য বিগত সন্ধ্যায় ঐ পাথরটাই যেন প্রাণবন্ত হইয়া আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল। পাথরটার নিকট আসিয়া কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। নিষ্প্রাণ পাষাণ হইলেও, মনে হইল যেন একটা জ্বালা রহিয়া রহিয়া ঐ পাষাণের মধ্যে গুমরাইয়া মরিতেছে। বাহির হইবার যেন পথ পায় নাই। সেদিন সেই কঠিন প্রস্তর খণ্ডটিকে যেন অতি কঠিন মনে হইয়াছিল।

ঘরে ফিরিলাম। একটু পরেই বৌদি চা ও জল খাবার লইয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। একটা মোড়া টানিয়া লইয়া বৌদি খাবারটা রাখিয়া হারিকেনের সলিতাটা একটু বাড়াইয়া দিল। বৌদি ঘরে ঢুকিলেও আমি তাহার আগমনকে যেন লক্ষ্যই করি নাই এইরূপ ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কেন জানি না কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে বৌদি বলিল—চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে—কখন থেকে চা এনে দাঁড়িয়ে আছি। কী হল তোমার ?

আমার যেন কিছুই হইতে পারে না, আমি যেন সমস্ত অতীত ভুলিয়া গিয়াছি বৌদি হয়ত তাহাই ভাবিয়াছিল। আমার মনে যে ঝড় উঠিয়াছে তাহার যাহাতে বহিঃপ্রকাশ না হয় তাই বলিলাম—কই দাও চা টা আমার হাতে, অবেলায় ভাত খেয়েছি খাবার আর কিছু খাব না। বৌদি চায়ের কাপটা আমার হাতে দিয়া খাবারের থালা লইয়া চলিয়া গেল। তাহার ব্যবহার দেখিয়া মনে হইল যেন নিত্য সে এমনি করিয়া চা জল খাবার আমার কাছে লইয়া আসে।

বৌদি চলিয়া যাইতেই মনটা ক্ষোভে ভরিয়া গেল। মনে হইল বৌদি যেন অবহেলা করিয়া চলিয়া গেল। যদিও তেমনটা মনে করিবার কোন কারণ ঘটে নাই তবুও মনে হইল বৌদির হাতে খাইয়া

তাহাকে কৃতার্থ করিতেছি অতএব চা ও খাবার খাইবার জন্য আবার সেইরূপ জিদ করিবে বা অনুযোগ করিবে। কিন্তু বৌদি সেরকম কিছু না করিয়া চলিয়া গেল। চা টা যেন আমাকে বিস্বাদ লাগিল, তাই চুমুক দিয়াই না খাইয়া রাখিয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে বৌদি আবার ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—রাত্রে কী খাবে ঠাকুর পো? আমার চায়ের বাটীতে চা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—চা খেলে না যে বড়, ঠাণ্ডা হয়ে গেছল? এই বলিয়া বৌদি বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই বৌদি আর এক কাপ চা লইয়া আসিয়া বলিল—নাও খেয়ে নাও আবার যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে না যায়।

বৌদির মুখের দিকে চাহিলাম। এত বড় যে একটা ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহার চিহ্নমাত্র মুখের মধ্যে পাইলাম না। এত অল্প সময়ের মধ্যেই বৌদি প্রকতিস্থ হইয়াছে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। অথচ আমার মনে কী দারুণ ঝড়ই না বহিতেছে যাগার গতিবোধ করিতে আমি কোন মতেই পারিতেছি না। কিন্তু বৌদির উপর রাগ করিবার অধিকার ত আমি নিজ হস্তে ছিন্ন করিয়াছি। মৌগ্রামে বৌদি কাতর হইয়া আমার সাহায্য চাহিয়াছিল আমি কাপুরুষের মত তাহাকে সাহায্য করিতে পারি নাই। তাই সেদিন বৌদি নিরাশ্রয় হইয়া পথে বাহির হইয়াছিল আজ যদি সে বিপথে চলিয়া থাকে তবে কোন অধিকারে তাহাকে ভৎর্সনা করিব। কিন্তু মানুষের মন এমনি স্বার্থপর যে নিজের ত্রুটী কোন দিনই সে বড় করিয়া দেখে না অথচ অপরের সামান্য ত্রুটীর জন্য জয়ঢাক পিটাইয়া প্রচার করে। মনে যে ঝড়ই উঠিয়া থাকুক আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম বৌদির নিকট তাহা কোন মতেই যেন প্রকাশ হইয়া না পড়ে। তাই রহস্য করিয়া বলিলাম—চা কাপটা ভাগ্যিস ঠাণ্ডা হ'তে দিয়েছিলুম তাই ত আবার চায়ের মালিকের দেখা

পাওয়া গেল। কথাটা বলিয়া নিজের কানেই যেন কেমন বিশ্রী শুনাইল।

বৌদি হাসিয়া বলিল—ওঃ কী আমি দুর্লভ বস্তু যে আমার দর্শন পাবার জন্য তোমাকে ব'সে থাকতে হবে, হুকুম করলেই হয় যখন বলবে তখনই হাজির হব।

বৌদির কথাটা বেশ মিষ্টি লাগিল। যেন এত মধুর কথা ইতিপূর্বে শুনি নাই। বৌদি মোড়াটা টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল—বল কী হুকুম ?

বৌদির কথার কী জবাব দিব কিন্তু একটা জবাব ত দিতে হইবে, তাই বলিলাম—আজ আর কিছু খাব না।

বৌদি আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল—বামুনের জাতই যখন গেছে তখন পেট ভ'রে খেতে দোষ কী। খাবে কী না খাবে ও সব ভাবনা ছেড়ে দাও এখন আমার হাতে, যতদিন এখানে আছ। এখন কী খাবে তাই বল ?

আমি বলিলাম যদি খেতেই হয় তবে সেটাও তুমিই ঠিক করবে। কখন কী খাবো আগে হ'তে ঠিক করার অভ্যাস নাই কোন দিন, খাবার সময় যা জোটে তাই খেয়ে থাকি।

বোদি হাসিয়া বলিল—তা আর বুঝতে পারছি না। বায়ু ভক্ষন ক'রে যদি বাঁচা যেত তবে তোমাদের আশ্রমের লোকেরা তাই চেষ্টা ক'রে দেখতো। যাক্ এটা যখন আশ্রম নয়, তখন আমার পছন্দ মতই খেতে হবে। আমি কিন্তু কোন মানা শুনব না। যাক একটা কথার জবাব দাও দেখি, এখানে কোন কর্মে আসা হয়েছে বলত ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বৌদি হাসিয়া বলিল—কী বেশেই আসা হ'য়েছিল। আশ্রমে

থাকলে কী শরীরের যত্নও নিতে নাই। কাশী হ'তে ফিরে দেখি তুমি শুয়ে। যেমন বেশ, তেমনি চেহারা। একটা বিছানা সঙ্গে নাই, দু'খানা কাপড় জামা বেশী সঙ্গে নাই, সুটকেসে যা পুঁজি আছে আমার এখানে না উঠলে বায়ু ভক্ষণের সাধ মিটত। কী ব্যাপার বলত ?

এ কথারও কোন জবাব দিলাম না। বৌদি উত্তেজিত হইয়া বলিল—কী জবাব দিচ্ছ না যে ? তারপর বৌদি মাথা দোলাইয়া বলিল—আমি যত ছোট হ'য়ে যাইনা কেন তোমার খবর নেবার দাবী হারাবার মত ছোট হ'য়ে যাই নি এ মনে রেখ।

আমি লজ্জিত হইয়া উত্তর করিলাম—ছোট হ'য়ে গেছ কই আমি ত তা মনে করি নি ?

তবে আমার কথার জবাব দিচ্ছ না যে বড় ?

হ্যাঁ ঠিক সাথ করে বেরিয়ে আসি নি। তাই সব জিনিষ গুছিয়ে আনা হয় নাই।

আসার উদ্দেশ্যটা কী শুনি ?

উদ্দেশ্য আবার কী, এমনি চলে এলুম।

বৌদি—মাথা নাড়িয়া আরও জোরের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কী যেন গোপন ক'রছ আমার কাছে, বল তুমি কেন অমন ক'রে চলে এসেছ ?

হাসিয়া জবাব করিলাম—সংসার আর ভাল লাগল না তাই এমনি বেরিয়ে পড়লুম। আমার এই সরল উত্তর বৌদি বিশ্বাস করিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল—আমি ঠিক যা ভেবেছি তাই হয়েছে। যে মানুষ এখুনি ফিরব ব'লে জেল খেটে ছমাস পরে ফিরে আসে, যে মানুষ মায়ের কাছে ফিরে যেয়ে মাকে কাঁদায়, সে

মানুষের মনের খবর ত আমার অজানা নাই। এত পাপের মধ্যেও যে ভগবান আমার প্রতি কৃপা ক'রে তোমাকে এখানে এনে দিয়েছেন এই আমার ভাগ্য ব'লতে হবে।

হাসিয়া বলিলাম—অর্থাৎ তোমার এখানে না এলে আমার অশেষ দুর্গতি হ'ত, কী বল?

বৌদি জিব কাটিয়া বলিল—তা কেন তবে তোমাকে আর ফিরে পেতুম না।

হাসিয়া বলিলাম—তার মানে?

বৌদি আবার মাথা নাড়িয়া বলিল—মানে আবার কী এতদিন গায়ে ছাইভস্ম মেখে লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে যেতে।

আমি বলিলাম—বেশ সন্ন্যাসী চিনেছ বৌদি, সাধুই যদি হতে পারব তবে গঙ্গার ধার ছেড়ে না ব'লে না ক'য়ে তোমার ঘরে হানা দিই। এতেও বুঝতে পারলে না যে কেমন সাধু, যে দিব্যি চোর্ব্যচোষ্য দুবেলা খ্যাটটী নিয়ে আর ঘর ছাড়বার নামটি পর্যন্ত করে না। তবে যদি বল এটা সাধুদের ভাণ্ডারা মনে করে দিব্য কায়েম হয়ে আড্ডা নিয়েছি, তা হ'লে বলার কিছু নাই।

বৌদি হাসিয়া বলিল—আর যাই কব আমার চোখ এড়িয়ে ফাঁকি দেবার জো নাই। যা রান্না ক'রতে তার সিকিও খেতে না। কী যেন অহরহ ভাবতে। সব সময়েই যেন একটা চিন্তা তোমাকে ব্যাকুল করে রাখত। এই দেখে আমি মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছিলুম। রোজই ভাবতুম আজ সকালে উঠে আর তোমাকে দেখতে পাব না। পাছে রাত্রে উঠে পালিয়ে যাও তাই সারা রাত জেগে কান খাড়া ক'রে থাকতুম। ক্রমশঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল তুমি আর এ সংসারে বুঝি বদ্ধ থাকবে না। তাই ত তোমাকে

ধ'রে রাখবার জন্য আত্মপ্রকাশ করতে হ'ল, নইলে এ পোড়া মুখ আর দেখায় কেউ ঠাকুর পো ?

বৌদিকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলাম—ভাগ্যিস তোমার কাছে এসে পড়েছিলুম। রোজই তপস্যায় যাব ঠিক করি কিন্তু প্রচুর আহারের ব্যবস্থা দেখে লোভ সামলাতে পারি না। শেষকালে একদিন দুর্গাবাড়ির জঙ্গলে তপস্যা ক'রতে যাব বলে স্থির ক'রে বেরিয়েছি, দেখি স্বর্গ হ'তে ইন্দ্র অমনি উর্বশীকে আমার ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য আগে হ'তেই পাঠিয়ে দিয়েছে। ইন্দ্র খুব হুঁশিয়ার লোক বলতে হবে, কেননা চোখ বুজলে যদি আর চোখ না খুলি, আর তপস্যার জোরে যদি ইন্দ্রত্ব দাবী ক'রে বসি।

বৌদি হাসিয়া বলিল—তারপর উর্বশীকে দেখে মাথা ঘুরে গেল কী বল ?

ঘুরে গেল ব'লে ঘুরে গেল। মনে মনে ভাবলুম উর্বশীর জন্যই ত তপস্যা করা, তাই যখন আগে ভাগে জুটে গেল তখন দূর ছাই আর মিথ্যে কৃচ্ছ্র সাধন ক'রে লাভ কী ? শেষকালে শুষ্ক শরীর দেখলে উর্বশী ত চ'টে যেতে পারে ?

বৌদি হাসিয়া বলিল—তা তপস্যার আগেই সিদ্ধি কী বল ?

তা বই কী।

তা হ'লে উর্বশীকে নিয়ে এরপর কী করবে ঠিক ক'রেছ ?

ও বিষয়ে এখনও সঠিক কিছু ভাবি নি। তবে শীঘ্রই ভেবে ঠিক করব।

তবু শুনিই না। না ভেবেই বল না ? উর্বশীকে নিয়ে কী—করা যেতে পারে।

ঐ দেখ অত সহজে এ কথার জবাব দেওয়া যায় ? উর্বশীর আগে

মনের খবর জানি। একে উর্বশী তাতে আবার সে মেয়ে মানুষ, অতএব বুঝতেই পারছ তার মনের খবর অত সহজে বের করা যাবে না।

বৌদি হাসিয়া বলিল—উর্বশীর মনের খবরটা না হয় আমিই বলি।

আমি কৌতুক করিয়া বলিলাম—তুমি! তুমি বলবে? তবে ত কাজটা আমার সোজা হ'য়ে গেল। আচ্ছা শোনা যাক তোমার কাছে উর্বশীর মনের খবর?

বৌদি হাসিয়া বলিল—উর্বশীর উপর ইন্দ্রদেবের হুকুম হ'ল, "মর্তলোকে এক ভীষণ সাধু উগ্র তপস্যার আয়োজন করিতেছে। বহুদিন হইতে এই তপস্বী আমার চিন্তার কারণ হইয়াছিল তবে তাহাকে নানা সিদ্ধাই দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছিলাম। এতদিন সে দুঃখ মোচনের ব্রত লইয়া গাঁয়ে গাঁয়ে কৃচ্ছ্র সাধনা করিয়া ফিরিয়াছে। ফলে তপস্যার কাজ অনেক খানি আগাইয়া গিয়াছে। এখন সে ঐ কাজে আর তুষ্ট নহে তাই বনে যাইয়া ঘোরতর তপস্যার জন্য চেষ্টা করিতেছে—অতএব সে ধ্যানে বসিবার পূর্বেই তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে হইবে।" উর্বশী ইন্দ্রের কথায় মনে মনে হাসিল। ইন্দ্রের কথামত সে বেহাগ রাগিনী ভাঁজিতে ভাঁজিতে তপস্বীর গতিপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তপস্বীরা একে মেয়ে মানুষের উপর হাড়ে চটা, তার উপর তপস্যার গোড়াতেই এই অযাত্রা—তাই ক্রোধে উর্বশীর পিছু পিছু ছুটিয়া গেল। উর্বশী কী করে আত্মরক্ষার জন্য ত্রিভুবন ঘুরিয়া কোন মতেই তপস্বীর ক্রোধাগ্নি হইতে রেহাই নাই দেখিয়া তপস্বীর নিকট আত্ম সমর্পন করিল।

এই বলিয়া বৌদি চুপ করিল।

আমি বলিলাম—তাত হ'ল এতে ত উর্বশীর মনের কথা জানা গেল না।

বৌদি অন্য মনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল—আমার প্রশ্নে সে বলিল ঠিক ত উর্বশীর মনের কথা জানা গেল না—হ্যাঁ উর্বশী মনে মনে ভাবল যখন তপস্বীর কাছে ধরাই দিতে হ'ল তখন তপস্বীর মনের খবরটা নিয়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

আমি হাসিয়া বলিলাম—হ'ল না হ'ল না, উর্বশীর মনের খবর বলা হ'ল না।

বৌদি রাগ করিয়া বলিল—বলা হ'ল না ত অমনি। নিশ্চয়ই সে তপস্বীর মনের খবব আগে জানবে—তারপর তার মনের কথা বলবে।

আমি বলিলাম—তা নয় উর্বশীর মনের খবর হ'চ্ছে। স্বর্গে ফিরে যেতে আর দেরী ক'রে লাভ কী—ও তপস্বী মানুষ ওকে এই সময় এক কাপ চা খাইয়ে বিদেয় ক'রে দিলেই হবে।

বৌদি উচ্চৈস্বরে বলিল—কথ্খন না। যতই হোক উর্বশী মেয়ে মানুষ। তপস্বীর তপঃক্লিষ্ট শরীর দেখে তার আর স্বর্গে ফিরে যেতে মন চাইছে না। এদিকে তপস্বীও তাকে নিয়ে ঘর ক'রবে কিনা সে বিষয়ে তপস্বী কোন উচ্চবাচ্য ক'রছে না। উর্বশী সেই জন্য মহা ফাঁপরে প'ড়েছে।

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঘরছাড়া লোককে নিয়ে উর্বশী ঘর ক'রতে চাইলে তার কপালে অনেক দুঃখু আছে।

কিন্তু কী করবে—ঘরছাড়া লোকটাকে ত আর পথে বসিয়ে দিতে পারে না।

কেন পারবে না শুনি এতদিন সে যেমন পথে পথে ঘুরছিল, তেমনি মরুক না ঘুরে।

বৌদি হাসিয়া বলিল—উর্বশীকে দেখে সে পথ ভুলে গেছে।

আমি বলিলাম—ব'য়ে গেছে ভুলে যেতে। আজই ইচ্ছে করলে সে পথে বেরিয়ে যেতে পারে।

বৌদি হাসিয়া বলিল—না গো না পারে না, উর্বশী ছেড়ে না দিলে পারে না।

আমি বলিলাম—তা খামকা খামকা উর্বশী ধ'রেই বা রাখবে কেন ?

বৌদি উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু পরে বলিল—তা বটে ঠাকুরপো খামকা খামকা উর্বশী ধ'রে রাখবেই বা কেন ? এই বলিয়া বৌদি উঠিয়া গেল। হাল্কা কথায় মনটা হাল্কা হইয়া গেলেও কোথায় যেন একটা চাপা বেদনা মাঝে মাঝে অনাবশ্যক হৃদয়টাকে ভারাক্রান্ত করিতেছে।

ঠিক করিলাম বৌদি তাহার জীবনের পরিবর্তন কাহিনী স্বেচ্ছায় নিজে না বলিলে আমি জানিতে চাহিব না এবং আমার কোন কথাও তাহাকে বলিব না। যে কয়দিন এখানে থাকি ততদিন সহজভাবেই মিশিব, এমন কিছু করিব না যাহাতে সে আঘাত পায়।

১৬

বৌদির সহিত যেন আমার সকল বন্ধন শিথিল হইয়া গেছে। আজ যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু বাঁধনের অভ্যাস বইত নয়। বাঁধা থাকা যাহার অভ্যাস তাহাকে মুক্তি দিলেও সে তখুনি যেমন ছুটিয়া পালায় না, তেমনি বৌদির সহিত আমার আগের বাঁধন শিথিল হইয়া গেলেও তখুনি তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে মন চাহিল না।

দুর্গাবাড়ীর পথে একদিন বেড়াইতে যাইয়া বৌদি ও আমি সেই পাথরটার নিকট আসিয়া পড়িলাম। পাথরটাকে দেখিলে আমি কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়ি। বৌদিকে বলিলাম বৌদি—এই পাথরটাকে দেখলে আমার কেমন যেন কষ্ট হয়।

বৌদি বলিল—পাষাণের দুর্ভাগ্য—না যে পাষাণী এই পাথরটাকে মনে পড়িয়ে দেয় তার দুর্ভাগ্য।

বৌদি সত্য কথাই বলিয়াছে, এই নিস্প্রাণ পাষাণ যেন একটা বেদনার স্মৃতির বাহক হইয়া দুঃসংবাদ বহিয়া আনিতেছে। উত্তর করিলাম সত্যি বৌদি—সেই পাষাণীর উপরই বোধ হয় আমার রাগ, তাই পাথরটাকে আমি সহ্য করতে পারি না।

বৌদি হাসিয়া বলিল—পাষাণীর উপর রাগের কারণটা শুনতে ইচ্ছে হ'চ্ছে।

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—হবে না—সে যে এমন ক'রে আমাকে আঘাত দেবে, তা ত ভাবিনি কোন দিন। ঐ পাথরটাই ত তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে নইলে—এই আঘাত আমাকে পেতে হত না।

বৌদি স্নিগ্ধ হাসিয়া বলিল—আঘাত না দিয়ে পাষাণী কী করতে পারত শুনি?

আমি সেইরূপ উত্তেজনার সহিত বলিলাম—কেন আর কোন পথ ছিল না।

বৌদি ধীর স্থির কণ্ঠে বলিল—আমি যদি বলি কোন পথ ছিল না।

আমি শ্লেষ করিয়া বলিলাম—তা ত তুমি বলবেই। কথাটা বলিয়া মনে মনে অনুতপ্ত হইলাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাটা কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

বৌদি বেদনাক্লিষ্ট স্বরে বলিল—যার দুঃখ সেই জানে ঠাকুরপো তুমি তার কী বুঝবে? আমার দুঃখ তুমি না জানলেও তোমার দুঃখ ত আমি জানি এবং জানি বলেই এই অবস্থায় আমাকে প'ড়তে হয়েছে।

বৌদির কথা শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। কোন সুদূর জগৎ হইতে যেন তাহার কণ্ঠ শোনা যাইতেছে, বৌদি না থামিয়া বলিয়া

যাইতেছে—ঠাকুরপো সেদিন তোমাকে আমার দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে সাহায্য ক'রতে ডেকেছিলাম। ডেকে কিন্তু তখনই ভুল বুঝতে পারলুম। গোয়াবাগানে যে জন্য তোমার সাহায্য নিতে পারিনি মৌগাঁয়েও দেখলুম সেই বাধা র'য়েছে বরং বাধা বেশী ক'রে বেড়েছে। তোমার সুনাম তখন দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ত তখন তোমাকে সেই সুনামের উচ্চ শিখর হতে নীচে ফেলে দিতে পারি না। দেশের নিকট হ'তে, তোমার মায়ের নিকট হ'তে, তোমাকে ত ছিনিয়ে নিতে পারি না। আমি ভেবে দেখলুম আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা মানেই তোমার আশা আকাঙ্খাকে শেষ করে দেওয়া। আগেই ত বলেছি আমার নিজের জন্য এ আমি কোনদিন পারতুম না। আর এই পোড়া রূপই আমার কাল হল। শত চেষ্টাতেও এই রূপটাকে লুকিয়ে রাখতে পারলুম না। তোমার দাদার অসুখের সময় যাদের বাড়ীতে কাজ করতুম তাদের বাড়ীর গিন্নী আমার রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেল—একদিন ডেকে আমার বেতন মিটিয়ে দিয়ে বললে—"তুমি ত জান মা আমরা ছেলে পুলে নিয়ে ঘর করি, তোমার মত কম বয়সী মেয়েকে রাখা কত বিপদ। নেহাত ঝি পাই নাই তাই রেখেছিলুম, এখন একজন পেয়েছি তাই জবাব দিলুম। কিছু মনে ক'র না মা।"

আবার এমন এক জায়গায় চাকরি জুটলো, তারা আবার এত ভাল মানুষ লোক যে আমার ছেঁড়া কাপড় দেখে তাদের দুঃখে হৃদয় বিগলিত হ'য়ে উঠল। তারা এমন কাপড় এনে দিলে যে তাদের বাড়ীর বৌয়েরাও সে কাপড় কোনদিনই পরে নাই। কী করি কাপড়টা চৌকাঠে নামিয়ে রেখে গোপনে তাদেরবাড়ী ছেড়ে চলে এলুম। তারপর সারা কলকাতায় চাকরির সন্ধানে ঘুরেছি সেই একই অবস্থা, কেউ রূপ দেখে ভয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে কেউ বা অতি আগ্রহে ঘরে পরম আদরে রাখতে চেয়েছে। বাধ্য হ'য়ে

মৌগাঁয়ে চ'লে এলুম। জানি সেখানে আমার কিছুই নাই তবু মনে মনে ভাবলুম শশুরের বাড়ী, অন্ততঃ সেখানে ইজ্জত নিয়ে বাঁচতে পারব। কিন্তু সেখানেও তাই। জমীদারের ছেলের চিঠি ত তোমাকে দেখিয়েছি কিন্তু আর সব কথা বলিনি। গোবর ঠাকুরপো সব জানে। ঐ মানুষটা না থাকলে আমি সেখানে দেড় বছর ত দূরের কথা একদিনও থাকতে পারতুম না।

বৌদি এই কয়টি কথা বলিয়া চুপ করিল। চুনারের পাহাড়ে সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে। প্রকৃতি যেন অভিমানিনী নারীর মত অভিমানে মুখ ঢাকিয়াছে। মৃদুমন্দ সান্ধ্য বাতাসে মনে হইতেছে সে যেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া হতাশায় কাঁদিতেছে। একটা অব্যক্ত বেদনায় আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। কণ্ঠ শুখাইয়া গিয়াছে বৌদির কথার উত্তর দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। বৌদিও যেন তাহার দুর্ভাগ্যের বোঝা আমার মাথায় চাপাইয়া দিয়া অনিন্দিতার মতই সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সামনে যে নারী দাঁড়াইয়া আছে সে যেন আমার দুর্ভাগ্যের সাক্ষী মাত্র।

বৌদি আবার বলিতে লাগিল—বুঝলে ঠাকুর পো এ ছাড়া আর পথ ছিল না অবশ্য একটা পথ ছিল সেটা হল মরণ। কিন্তু তাতেও বাধা প'ড়ল।

আমি কোন কথাই বলিলাম না। বলিবার আছেই বা কী! বৌদি যে অপরাধই করুক না কেন তাহাকে মরিতে বলিবার অধিকার আমার নাই অনিন্দিতার হত্যার পর আমি যেন ভিন্ন বুদ্ধিতে সমস্ত জিনিষ বিচার করিতে চেষ্টা করিতেছি। তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম —মরতে তুমি যাবে কেন?

বৌদি হাসিয়া বলিল—বলেছি ত সেখানেও আমার বাধা হ'ল। পোড়া মন এমনি অসম্ভব আশা করে বসল যে একদিন না একদিন

তোমাকে ফিরে পাব। এ'দিকে ফিরে পাবার পথে কখন নিজেই কাঁটা দিয়ে বসে আছি তা নিজেই টের পাই নি। এই যে তোমাকে আজ ফিরে পেয়েছি, কিন্তু সত্যই কী ফিরে পেয়েছি ?

বৌদির কথায় বেদনার মধ্যেও যেন আনন্দ বোধ করিলাম। বৌদিকে আপনার করিয়া পাইবার আকাঙ্খা ত আমারও কম ছিল না। যে নারী একান্ত আমারও কামনার ধন তাহাকে কাছে পাইয়াও ত পাওয়া হইল না। বৌদির সকল অপরাধ ভুলিয়া গেলাম। আমার জন্য এই রমণী কী অসম্ভব ত্যাগই না করিয়াছে। জীবন সংগ্রামে লড়িয়া লড়িয়া সে পর্যুদস্ত হইয়া অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

বৌদি বলিয়া যাইতে লাগিল—যদিও তোমাকে ফিরে পাব না জানি তবু যে তোমাকে ফের দেখতে পেয়েছি একেই আমি ভাগ্যি বলে মানি। দুঃখ মোচনের তুমি ব্রত নিয়েছিলে জানি, এ দুরূহ ব্রত তুমি কোন দিনই উদ্‌যাপন ক'রতে পারবে না কিন্তু তুমি আমার দুঃখের ভার লাঘব করবে ব'লেই ত এত বড় দুঃখ বরণ ক'রেছিলে একদিন। একি আমার কম গৌরব ঠাকুর পো। দুঃখীর দুঃখ মোচন ক'রতে না পার, তাদের অপরাধকে ক্ষমা করার মহৎ শিক্ষা লাভ করেছ সেই ভরসায় ত তোমাকে পরিচয় দিলুম ঠাকুর পো। সমস্ত সংগ্রামে আমি হেরে গেছি ঠাকুর পো। কেবল তোমাকে মানুষ ক'রতে পেরেছি এই খানেই ত আমার জয়। নতুবা আমি যদি গোয়াবাগানে বা মৌগাঁয়ে তোমাকে ধ'রে রাখতুম কী সাধ্য ছিল তুমি পালিয়ে যাও। আজ তোমার নাম দেশে দেশে ছড়িয়ে প'ড়েছে এতে আমার সুখ বেড়েছে ছাড়া কমে নাই। কিন্তু তোমার নামের জন্য আমাকে কতখানি মূল্য দিতে হয়েছে তা ত আজ দেখতে পাচ্ছ। ঠাকুর পো—তুমি আমার ছোটও বটে আবার আমার বড়ও বটে। আর পাঁচজনা পতিতার মত তুমি যেন আমাকে দেখ না, এইটাই আমি চাই।

আর একটি কামনা শুধু রইল মরার আগে যেন একবার তোমার দেখা পাই আর তোমার কোলে যেন মাথা রেখে মরতে পারি।

চুনারের পাহাড়ে ধীরে ধীরে রাত্রির কালো অন্ধকার নামিয়া আসিল এত কালো যে কোন কালে আলো ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই কালো আঁধারের বুক চিরিয়া একটী করুণ আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। পাষান ঘেরা চুনার সহরটা যেন বেদনায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

বৌদি আমার হাত ধরিয়া টান দিয়া বলিল—চল ঠাকুর পো অনেকটা রাত হ'য়ে গেছে।

১৭

সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিলাম না। অনিন্দিতার খুনের মামলা মাথায় জাঁকিয়া বসিয়া একটা দারুণ দুশ্চিন্তা অহরহ আমার মনকে পীড়া দিত। এই কয়দিন বৌদির পরিচয় পাইয়া সে দুশ্চিন্তা হইতে রেহাই পাইয়াছিলাম। আবার সেই সাংঘাতিক ভয়াবহ চিত্র আমার মনে উদিত হইয়া অস্থির করিয়া তুলিল। বৌদির নিকট আমার দুঃখের কাহিনী বলা হয় নাই। এত বড় একটা কলঙ্কের কথা বৌদির কাছে বলিতে লজ্জা হইয়াছিল। বৌদি আমাকে বলিয়াছিল—"আমার মত দুঃখ তুমি অহরহ দেখতে পাবে। তাদের দুঃখ যদি মোচন করতে পার তবে আমি আবার তোমার কাছে শরণ নেব।" কিন্তু হায় একটী মানুষেরও দুঃখ আমি ঘুচাইতে পারিলাম না। অনিন্দিতা শুধু নিজে মরে নাই সমস্ত নারী জাতিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে—ইহারা বিশ্বাস ঘাতক ইহাদের কথায় ভুলিয়া যেন আমার মত প্রায়শ্চিত্ত করিওনা।"

একটী নারী তাহার জীবন মূল্যে কী কঠিন নির্মম হস্তে আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। মৃত্যুর পর কী নির্মম প্রতিশোধই না সে লইয়াছে।

খুনের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেই বা আর কোন মুখে হরিশপুর ফিরিয়া যাইব। সমস্ত গ্রামের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও যে বেণীর বৌকে কাহারও করুণার উপর ছাড়িয়া দিই নাই. কই সেই বেণীর বৌকে ত রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমি নির্দোষ হইলে কী হইবে, দেশের লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? তিনকড়ির, খোকার, মধুসূদন ভট্টাচার্যের মুখে চাপা দিব কী করিয়া। না আমার আর হরিশপুরে ফেরা হইবে না। ফিরিতে চাহিলেও ফিরিবার উপায় নাই। অনিন্দিতা আমার সমস্ত অতীতকে তাহার সহিত লইয়া গিয়াছে, এতটুকুও অবশিষ্ট রাখে নাই যে, সেই মূলধন লইয়া আবার দেশ সেবার পসরা খুলিয়া বসিব। এইরূপ চিন্তায় মন অস্থির হইয়া পড়িল। আমি দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত দিশেহারা হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছি একটী মাত্র পথ যাহা সামানে পড়িয়া আছে সেই পথে চলিবার উপায় নাই। কে যেন পাষাণ প্রাচীর দিয়া সেই পথটীকেও রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

পাগলের মত বৌদির ঘরের দিকে ছুটিলাম। গভীর রাত্রি সমস্ত জগৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—কেবল আমি জাগিয়া আছি। অতি সন্তর্পনে বৌদির দরজায় ধাক্কা দিলাম। দরজা অর্গল বদ্ধ ছিল না দরজা খুলিয়া গেল। কৃষ্ণা-একাদশীর এক ফালি চাঁদের কিরণ, আমার মতই বৌদির মুখের দিকে তৃষ্ণার্ত নয়নে চাহিয়া আছে। অন্ধকারের মধ্যে ছোট্ট একটুকরা আলো বৌদির মুখে প্রতিফলিত হইয়াছে। মনে হইতেছে একটী রজনীগন্ধার ঝড়ে ওড়া পাপড়ি বাতাসে উড়িয়া আসিয়াছে। কোন অজ্ঞাত আকর্ষণে অতীতের সমস্ত বাধাকে ঠেলিয়া ধীরে ধীরে আমাকে টানিয়া আনিতেছে। আমাব আর কোন শক্তি নাই যে আকর্ষণের বিরুদ্ধে ফিরিয়া দাঁড়াই, আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

বৌদির মুখের কাছে মুখ নত করিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইলাম। একটু পরেই বৌদি ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিল। রক্ত গোলাপ দুইটী ওষ্ঠের স্পর্শ আমার সারা দেহে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। বৌদি ভয় খাইয়া গেল, ভীতস্বরে প্রশ্ন করিল—কে—কে তুমি— ?

উত্তর করিলাম—আমি চোর !

বৌদি আরও ভীত হইয়া বলিল—কী চাও তুমি—বল কী চুরি করতে এসেছ ?

উত্তর করিলাম—তোমাকে চুরি ক'রতে এসেছি।

বৌদি এতক্ষণে আমাকে চিনিতে পারিল—শিথিল বস্ত্র সংযত করিয়া ত্রস্তে উঠিয়া বলিল—ও ! তুমি ! তা চোরের মত রাত্রে চুরি ক'রতে হবে কেন ? তোমার জিনিষ তুমি নেবে তা এমন চোরের মত রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে আসতে হবে কেন ? প্রকাশ্য দিবালোকে দশজনার মাঝে তোমার জিনিষ তুমি নেবে। আমি বলি সত্যই বুঝি চোর ঢুকেছে।

আমি উত্তেজনায় তখনও কাঁপিতেছি—তাই কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম—হেঁয়ালী রাখ বৌদি—সোজা কথা, আমি পেতে চাই. তোমাকে—।

বৌদি হাসিয়া বলিল—সেই জন্যই ত দুয়ার বন্ধ করি নি ঠাকুরপো। জানি, তুমি তোমার জিনিষ ফিরে চাইবে।

বৌদির বাঁকা কথার অর্থবোধ করার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। আমি বলিলাম—আমি আর পারছি না বৌদি, আর সহ্য ক'রতে পারছি না তুমি আমার ভার নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত কর।

জননী যেমন শিশুকে কোলে টানিয়া শোয়াইয়া দেয়, বৌদি তেমনি করিয়া আমাকে তাহার শয্যার উপর শুয়াইয়া দিল। তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—কী হ'য়েছে তোমার বল ত ? ছিঃ এমন ক'রে অধৈর্য হ'তে

আছে ? আমি ত তোমারই, এর জন্য এমন ক'রে ভিক্ষে চাইতে হবে কেন তোমাকে ?

আমি বলিলাম—তুমি আমার হ'লেও আর তোমাকে আমি ছাড়ব না।

বৌদি স্নেহময় কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা তাই হবে এখন ঘুমোও লক্ষ্মীটি। এই বলিয়া সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আমি যেন সম্বিত ফিরিয়া পাইলাম। কেমন যেন আমার লজ্জা হইল। আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম। বৌদি পরম স্নেহে আমার হাত ধরিয়া আমাকে আমার ঘরে শুয়াইয়া দিয়া নিজের ঘরের দরজা অর্গলবদ্ধ করিল। কিছুক্ষণ পরেই একটী করুণ সুর ভাসিয়া উঠিল—

"প্রভু আমি কী দোষ করিয়াছি—আমি ধাতু বৈত, নই। তুমি যখন তাহা হইতে খড়্গ তৈয়ারী কর তখন সে হত্যা করে আর যখন দেবতার মূর্তি গড় তখন সে জগৎজনের পূজা গ্রহণ করে। কিন্তু আমি ত সেই লোহাই—তবে আমার কী দোষ ?"

প্রভাত হইতেই বৌদি চা লইয়া আসিল। আমি মুখ ধুইয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিলাম। বৌদি সরসীকে আমার আর কোন কাজই করিতে দেয় না। বিগত রজনীর কথা স্মরণ করিয়া বৌদির মুখের দিকে চাহিতে লজ্জা করিতে লাগিল।

বৌদি কৌতুক করিয়া বলিল—ও মশায় বামুনের ছেলে আর কতদিন এখানে থাকা হবে ?

আমার মনে হইল বৌদি গত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া আর আমি এখানে থাকি তাহা পছন্দ করিতেছে না। তাই বলিলাম—যখন বলবে তখনই যেতে প্রস্তুত।

বৌদি ঘাড় দোলাইয়া বলিল—না না আমি যেতে বলব কেন ?

এ দিকে ভারত জননী যে পুত্রহারা হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়াচ্ছে তার কী ?

আমি বলিলাম—কাঁদুক ভারত জননী আমি আর ফিরছি না।

বৌদি বলিল—বেশ ত সে কথা স্পষ্ট ক'রে বললেই হয়, তাহ'লে এখানেই থাকার ব্যবস্থা করি ?

আমি বলিলাম—আবার নতুন ব্যবস্থা কী করতে হবে, বেশ ত আছি।

বৌদি মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল আর কোন কথার জবাব দিল না।

আমি পুনরায় বলিলাম—আমাকে যে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছ, কাল রাত্রে ত বলেছি আর আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, আর থাকতে চাইও না।

বৌদি গম্ভীর হইয়া পড়িল। পরিহাস পটু বৌদির মধ্যে সাধারণতঃ গাম্ভীর্য দেখা যায় না। তাই গম্ভীর হইয়া পড়িলে আমি বেশ মনে শান্তি বোধ করিনা। তাই জিদ করিয়া বলিলাম—কই উত্তর দিচ্ছ না যে।

বৌদি তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—কী আর উত্তর দেব। তুমি থাকবে এখানে, তাতে আমার আপত্তির কী আছে। এই কথা বলিয়া একটা ঝাঁটা লইয়া ঘর ঝাঁট দিতে লাগিল। আমি উঠিয়া বৌদির হাতের ঝাঁটা কাড়িয়া লইয়া বলিলাম আমার কথার ঠিক মত জবাব দাও—এই বলিয়া বৌদির হাত ধরিয়া টান দিলাম।

বৌদি ত্রস্তে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—কী হচ্ছে সরসী যে দেখতে পাবে।

আমি বলিলাম—পাক্ দেখতে।

বৌদি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—লজ্জা করে না—সব কিছু ছেড়ে একজন বারবনিতার কাছে প'ড়ে থাক্তে। তখন যে বড় গলায় বলা

হ'য়েছিল "দুঃখ মোচনের ব্রত নিয়েছি।" মেয়ে মানুষের কাছে প'ড়ে থেকে এবার বুঝি দুঃখ মোচন করা হবে ?

বৌদির কথা চাবুকের মত আমার অন্তরে বাজিল। বৌদি যে এত কঠিন কথা বলিতে পারে তাহা জানিতাম না। কিন্তু কী করিব কোন কথা না বলিয়া সহিয়া গেলাম। বৌদি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। আমিও বাড়ির বাহির হইয়া গেলাম।

ইচ্ছা করিয়াই বেশ একটু বেলা করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। সরসী আসিয়া বলিল—কোথায় ছিলেন এতক্ষণ কাকা বাবু—নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, মা—ত ভেবেই অস্থির। আমি বললুম—এখুনি ফিরে আসবে তুমি ভেব না মা।—তা মা বললে "তুই জানিস না সরসী সে মানুষের কিছুই ঠিক নাই, এখুনি আসছি বলে ছমাস পরে এসে হাজির।" হ্যাঁ কাকা বাবু এও কখনও সত্যি হয় ?

সরসীর কথায় মনটা হাল্কা হইয়া গেল। প্রভাতে যে মানসিক দ্বন্দ্ব লইয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম সরসীর কথা শুনিয়া মূহুর্তে সে দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল। একজোড়া অপেক্ষমান চক্ষু যে পথের দিকে আমার জন্য চাহিয়া আছে তাহা না দেখিলেও বুঝিতে পারিলাম। তবুও একটু কৃত্রিম ক্রোধ করিয়া বলিলাম—সরসী তোমার মায়ের সবেতেই বাড়াবাড়ি, আমি দেরী ক'রে ফিরব কি না ফিরব, তাতে তার কী এসে গেল।

সরসী বলিল—সেকি কাকা বাবু—মায়ের এসে যাবে না ত কার এসে যাবে! মা ব'লছিল "আমার আপনার লোক ব'লতে যেখানে যা ছিল সব ম'রে গেছে, কেবল একমাত্র শিবের সল্‌তে ঐ বেঁচে আছে।" আর আপনি দেরী ক'রে ফিরবেন তা রাগ হবে না ? না কাকা বাবু মাকে আপনি শুধু শুধু দুঃখু দেবেন না, মায়ের আমার বড় কোমল প্রাণ। যান্ চান ক'রে নেন, মা ভাতের হাঁড়ি কোলে ক'রে ব'সে আছে।

স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলাম। বৌদি অদূরে থাকিয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে বলিল—খুব রাগ হয়েছে বাবুর নয়? আমি ত ভাবলুম আর বুঝি ফিরবেই না।

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম—নাই যদি ফিরতাম তাতে কার কি এসে যেত।

বৌদি হাসিয়া বলিল—কার কী আবার এসে যাবে, যার পোড়া ভাগ্যি সেই কেবল ভেবে ম'রছে।

আমি বলিলাম—আর ভালবাসার ভান ক'রতে হতে হবে না।

বৌদি হাসিয়া বলিল—ইস্ বড্ড রাগ দেখছি যে। আমার ভালবাসা হ'ল ভান ওর ভালবাসা হ'ল খাঁটি। আচ্ছা বেশ আর আমিও তোমাকে ছাড়ছি না কেমন তুমি ভালবাস তার যাচাই হ'য়ে যাক্।

আমি বলিলাম—কেন আমি কী ভালবাসতে পারি না?

বৌদি হাসিয়া জবাব দিল—তবে ভালবাসার দায় পোয়াতে পার না এই কথা বলছি।

আমি একটু শক্ত স্বরে বলিলাম—কেন আমাকে এতই অপদার্থ, এতই দুর্বল ভেবেছ?

বৌদি খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল—তা কিন্তু ভেবেছি ঠাকুরপো—

আমি দৃঢ় স্বরে বলিলাম—ভুল ভেবেছ বৌদি।

বৌদি সহাস্যে বলিল—বেশ ত পরীক্ষা হ'য়ে যাক্ না।

আমি বৌদির কথার সমান প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলাম—বেশ ত হ'ক না পরীক্ষা।

বৌদি উচ্চৈস্বরে সরসীকে ডাকিতে লাগিল। সরসী আসিয়া বলিল—কেন মা, কেন ডাকছ গো।

বৌদি বলিল—দুদিনের মধ্যে সব গোছ গাছ ক'রে নে। আমরা

হরিশপুর যাব। ঠাকুরপো আমাদের নিয়ে যাবে বলছে। আর আমাকে তার কাছ ছাড়া ক'রবে না।

সরসী ও আমি বৌদির কথার মর্ম ভেদ করিতে পারিলাম না। আমি সবিস্ময়ে বৌদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বৌদি সরসীকে বলিল—যা আর কিছু বলি নাই।

সরসী অবাক হইয়া বলিল—সত্যি তুমি যাবে মা ?

বৌদি বলিল—সত্যি না ত মিথ্যে নাকি ? তুই এখন যা. যখন যাব তখন দেখতে পাবি।

সরসী চলিয়া গেল। বৌদি বলিল—তবে হরিশপুরে পত্র দাও, ষ্টেসেনে গাড়ী রাখার জন্য।

আমি বৌদির কথায় ভয় পাইয়া গেলাম। বৌদি সত্যই হরিশপুর যাইবে না কি ? একে অনিন্দিতার ব্যাপারে কলঙ্কের অবধি নাই তারপর যদি বৌদিকে হরিশপুর লইয়া যাই তবে ত কথা নাই। গ্রামে আর লোকহাসির বাকি থাকিবে না। বৌদিকে কানাইদার বৌ বলিয়া অনেকে চেনে। আজ যদি তাহাকে ঘরে লইয়া উঠাই তবে লোকে কী ভাবিবে ? অন্য কেহ হইলে তবুও একটা বানান সম্বন্ধ বলিয়া চালাইয়া দিতে পারা যাইত। বৌদির কথায় আমি ঘামিয়া উঠিলাম—না না বৌদিকে লইয়া আমি হরিশপুরে কোন মতেই উঠিতে পারিব না; বরং অন্য কোন অচেনা জায়গায় সম্ভব। তাই বলিলাম—এত জায়গা থাকতে হরিশপুরে যেতে হবে কেন বৌদি ?

বৌদি আবার দুষ্টু হাসিয়া বলিল—হরিশপুর হল তোমার বাড়ী, সেখান থেকে তুমি দেশের কাজ কর। তুমি হ'লে সেখানকার কংগ্রেসের সভাপতি। তোমার কত কাজ সেখানে। সেখানে না গেলে এসব কাজ ক'রবে কে শুনি ?

আমি বলিলাম—তোমাকে নিয়ে গেলে সেখানে আমায় আর কাজ ক'রতে কেউ দেবে ভাবছ ?

বৌদি যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিল—কেন দেবে না শুনি ? তোমার কাজ তুমি ক'রবে তাতে কার কী বাধা দেবার আছে ?

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিলাম—তোমাকে নিয়ে গেলে লোকে কী ভাববে বল দেখি ?

বৌদি আবার তেমনি না বুঝিবার ভাণ করিয়া বলিল—কী আর ভাববে। তুমি বলবে এই মহিলাটী এতদিন পথ ভুলে বিপথে গেছল, আমি তাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসেছি। ও আমাকে ভালবাসে আমিও ওকে ভালবাসি, তাই ওকে ছেড়ে আমি দেশসেবার কাজ ক'রে শান্তি পাই না। কিন্তু আমরা দুজনে যদি দেশের সেবা করি তবে আমরা আরও ভালভাবে, বেশী উৎসাহ সহকারে কাজ ক'রতে পারব।

আমি বলিলাম—তা কী কখনও সম্ভব বৌদি।'

বৌদি বলিল—কেন সম্ভব নয়। আমি কী দেশ সেবা ক'রতে পারি না ?

আমি বলিলাম—তা হয়ত পার, কিন্তু তোমার সেবা নেবে কে ?

বৌদি উত্তেজিত হইয়া বলিল—কেন আমি কী দেশের মানুষ নই ? আমাদিকে বাদ দিয়ে তোমাদের দেশ ?

বৌদির কথার উত্তর দেওয়া কঠিন, তাই চুপ করিয়া রহিলাম।

বৌদি আরও উত্তেজনার সহিত বলিল—রাতের অন্ধকারে আমাদের আঁচল ধ'রে ভালবাসি বললেই ভালবাসা হয় না। দশজনার সামনে যদি বলতে পার তবে বুঝি ভালবাসা। আর বাছাই করা লোকের জন্য যদি দেশ সেবা ক'রতে নেমেছ, তবে আমার বলার কিছু নাই। যদি সত্যিকারের

দেশসেবা ক'রতে চাও আর সত্যিকারের ভালবেসে থাক তবে আমাকে বাদ দিতে পারবে না, বাদ দিতে পার না। কিন্তু আসলে তুমি দেশকেও ভালবাস না আর আমাকেও ভালবাস না। সেই সত্যি কথাটা আমার জানা আছে ব'লেই আমি তোমার হাত ধ'রে টানাটানিতে ভুলে যাই না। মেয়ে মানুষের হাত ধ'রে সব পুরুষেই টানাটানি করে সে আমার জানা আছে, তবে তুমি টানলেই যেতে হবে কেন শুনি? ভালবাসলে ত যাব? এই ত সত্যিকারের পরীক্ষার সময় পিছিয়ে গেলে। দোহাই ঠাকুরপো, আর যাই বল; ভালবাসি এই মিথ্যে কথাটা বল' না। এতে আমি বড় দুঃখু পাই। এই বলিয়া বৌদি উঠিয়া গেল।

বৌদির কথায় আমি তীব্র বেদনা অনুভব করিলাম। কিন্তু আমার বলিবার কিছু নাই। বৌদি ত সত্য কথাই বলিয়াছে। তাহার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সত্যই ত তাহারাও দেশের মানুষ তাহারাই বা দেশসেবা হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? বৌদি যদি ভুলই করিয়া থাকে তবে কেন সে জীবনভোর একই ভুল করিতে থাকিবে। এই ভুল হইতে যদি তাহাকে মুক্তি না দিতে পারিলাম তবে কিসের দেশ সেবা? সত্যই ত বৌদিকে যদি ভালবাসি তবে ভালবাসার স্বীকৃতিটুকু দিতে এত কুণ্ঠা কেন? সারাদিন একটা চাপা অব্যক্ত বেদনায় মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। এই কয়দিন বৈকালে বৌদি ও আমি এক সঙ্গে বেড়াইতে যাইতাম, আজ বৌদি আসিয়া বেড়াইবার জন্য ডাকিল না আমিও লজ্জায় তাহাকে ডাকিতে পারিলাম না। যথারীতি বৌদি বৈকালের চা ও রাতের খাবার লইয়া আসিল কোনরূপে চা ও খাবার খাইলাম কিন্তু একটী কথাও বলিতে পারিলাম না। জীবনের মস্ত বড় একটা ফাঁকি যেন বৌদি ধরিয়া ফেলিয়াছে—কোন লজ্জায় আর তাহার সহিত কথা বলিব।

একে অনিন্দিতার হত্যাজনিত দুঃখ তাহার জন্য দেশ ছাড়া হইতে হইয়াছে তাব উপর বৌদি, আমাকে এত বড় সত্যের আঘাত হানিল যাহার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িলাম—বৌদিকে এখনও আমার দুঃখের কথা বলা হয় নাই; আবার কোন অধিকারে তাহাকে আমার দুঃখের কাহিনী শোনাইব। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম। চিন্তা করিতে করিতে কেমন যেন মনের সমস্ত শক্তি শেষ হইয়া গেল। স্বপ্ন দেখিলে যেমন মানুষ বলহীন হইয়া যায় তেমনি যেন আমি শক্তিহীন হইয়া গেলাম। আমি কোনরূপে টলিতে টলিতে বৌদির ঘরের দরজার সামনে আসিয়া পড়িলাম। দরজা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। বৌদির দরজা সাধারণতঃ খোলাই থাকে। খুব সম্ভব আমার ভয়েই সে দরজা বন্ধ করিয়াছে অন্য সময় হইলে আমি অপমানিত বোধ করিতাম অথবা আমার রাগ হইত। কিন্তু আমার সে সব কিছুই মনে হইল না। বরং মনে হইল সে ঠিকই করিয়াছে। হঠাৎ আমার সকল চিন্তা যেন লোপ পাইয়া গেল আমি উন্মাদের মত দরজায় জোরে জোরে আঘাত করিতে লাগিলাম।

বৌদি দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—ছিঃ ছিঃ কী হ'চ্ছে এত রাত্রে, সরসী কী মনে করবে?

আমি বলিলাম—যা খুশী মনে করুক আমি গ্রাহ্য করি না।

বৌদি ভৎর্সনা করিয়া বলিল—ছিঃ ছিঃ তুমি কী পাগল হ'য়ে গেলে না কি; এত রাত্রে মেয়েমানুষের দরজায় ধাক্কা দিতে লজ্জা হ'ল না। আমি বারবনিতা ব'লে বুঝি আমার কোন ইজ্জত নাই।

বৌদির কথায় আঘাত পাইলাম তথাপি সে আঘাত সহিয়া কোনরূপে বলিলাম—বৌদি আমার অনেক কথা আছে সে কথা তোমাকে শুনতে হবে।

বৌদি উত্তেজিত হইয়া বলিল—তা রাতের বেলায় কেন? সারাদিন গেল তখন কথা ব'লতে কে মানা ক'রেছিল। যাও নিজের ঘরে যাও কাল শোনা যাবে।

আমি হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম—বৌদি আমি পুরুষ মানুষ মনে রেখ।

বৌদি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—কী মারবে না কি?

বৌদির কথায় কী জবাব দিব, কোনমতে ঢোক গিলিয়া বলিলাম—আমার রক্ত মাংসের শরীর—

বৌদি উঠিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া দিয়া অত্যন্ত বিষাদমাখা কণ্ঠে বলিল—ছিঃ ছিঃ ঠাকুরপো আমি মনে ক'রেছিলুম অন্ততঃ একটা পুরুষ মানুষও দুনিয়ায় আছে যে আমার দেহটাকে উপেক্ষা করতে পারে। আজকে সে স্বপ্নও তুমি আমার ভেঙে দিতে চাও ঠাকুরপো। কাল যখন চুপি চুপি চোরের মত তুমি আমার ঘরে এলে তখুনি আমার মন ভেঙ্গে প'ড়েছে ঠাকুরপো। যত দুর্বলই হও তুমি, কারও দুঃখ মোচনের ক্ষমতা তোমার না থাকলেও; তোমার পবিত্র নিষ্কলুষ মনের পরিচয় পেয়েই ত এত দুঃখেও জীবন রেখেছি। আজ তুমি আমার সকল আশা ভরসা নিস্ফল করে দিতে চাও ঠাকুর পো?

আমি বৌদির হাত ধরিয়া কাতর স্বরে বলিলাম—না না বৌদি আমি কোন কুমতলব নিয়ে আসি নি এখানে। তোমার কাছে না এসে পারলুম না। আমি কতবড় বেদনা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি সে কথা ত তুমি জান না। আমার মত দুঃখী আর কে আছে বৌদি? আমার সমস্ত অতীত শেষ হয়ে গেছে সমস্ত ভবিষ্যত নাশ হয়ে গেছে, আমার সব আশা নির্মূল হয়ে গেছে। সেই দুঃখের কথাই ত তোমাকে বলতে এসেছি। বড় লজ্জার

কথা বৌদি তাই তোমাকেও আমি এতদিন বলতে পারি নি। আমি খুনের দায়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি।

কোন প্রেত মূর্তি দেখিলে যেমন ভয় পায় বৌদি তেমনি ভয় পাইয়া বলিল—কাকে খুন করেছ ঠাকুর পো ?

আমি বলিলাম—খুন আমি করি নি কিন্তু আমিও খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়তে পারি তাই ভয়ে পালিয়ে এসেছি।

বৌদির সকল রাগ নিমেষে জল হইয়া গেল—ভীত স্বরে বলিল—ভাগ্যে আমার কত শাস্তি যে জমা আছে জানি না, কী হ'য়েছে খুলে বল ঠাকুর পো—আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

আমি বলিলাম—তুমি আমাদের গাঁয়ের বেণীর বৌকে জানতে ?

বৌদি উত্তেজিত হইয়া বলিল—কোন বেণীর বৌ, যাকে তোমরা লেখা পড়া শিখতে কলকাতা পাঠিয়েছিলে ?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ সেই বেণীর বৌ।

বৌদি বলিল—হ্যাঁ তার জন্য তোমার তখন অনেক বদনাম লোক মুখে শুনেছি। কী হ'য়েছে তার বল ত ?

আমি বলিলাম—তাকে খুন ক'রেছে।

বৌদি ভয় পাইয়া আমার গা ঘেঁসিয়া বসিল—যেন সে নিহত বেণীর বৌকে চোখের সামনে দেখিতেছে, এমনি ভয় পাইয়াছে। সমগ্র শরীর তাহার উত্তেজনায় কাঁপিতেছে কথা বলিতে তাহার জিহ্বা কাঁপিয়া উঠিতেছে।

আমি বৌদিকে ধরিয়া এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিলাম—বৌদি—কী হ'ল তোমার, তুমি এমন করছ কেন ? বৌদি চমকাইয়া উঠিল কোনরূপ সামলাইয়া লইয়া বলিল—শত্রুরা বুঝি তোমাকেও খুনের মামলায় জড়িয়েছে ?

আমি বলিলাম সে ভয় নাই তোমার খুব পুণ্যবল, আমি খুব সম্ভব রেহাই পেয়ে গেছি। এই বলিয়া বৌদিকে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা বলিলাম। বৌদি সকল কথা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শুনিল। তারপর বৌদি খাট হইতে নামিয়া মেঝেতে একটা মাদুর পাতিয়া বলিল—তুমি ঐখানেই শোও ঠাকুর পো—আমি নীচে শুচ্ছি। বৌদি আর কোন কথা বলিল না। একটু পরেই সে ঘুমাইয়া পড়িল বলিয়া মনে হইল। আমি বৌদিকে আর না জানাইয়া নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

১৮

অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে সরসীর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি সরসী চা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সরসী বলিল—কাকাববু চা খেয়ে নিন শীগ্‌গীর, আমি ও মা কাশী চললুম, সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরব। আপনার ভাত ইকমিক কুকারে মা চাপিয়ে রেখে যাচ্ছে। নামিয়ে ঠিক সময় মত খাবেন। আলমারীতে বিকেলের খাবার আছে মনে করে নিয়ে খাবেন, আর ষ্টোভ জ্বেলে চা করে নেবেন। মনে ক'রে খাবেন কিন্তু—তা না হ'লে জানেন ত মা এসে আবার রেগে আগুন হয়ে যাবে। আমাদের ট্রেনের সময় হ'য়ে এসেছে আমরা চললুম। এই বলিয়া দ্রুত সরসী চলিয়া গেল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বাহিরের জানালার দিকে চাহিয়া রহিলাম একটু পরেই বৌদি ও সরসী একায় চড়িয়া ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

মনে দুঃখ হইল বৌদি কাশী যাইবার কথা সরসীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল। কেন নিজে আসিয়া বলিতে কী দোষ ছিল? মনে হইল বৌদির ব্যবহারে সব সময়েই যেন একটা প্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতা লুকাইয়া আছে। আমার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সে যেন নিজের অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া না মনে করিয়া, 'ন্যায় বলিয়া জাহির করিতে চায়। না

আর নিজেকে এই ভাবে অপমানিত হইতে দিব না। বৌদি ফিরিয়া আসিলে কালই বিদায় লইয়া চলিয়া যাইব। বৌদির ব্যবহারে যেটুকু আন্তরিকতা দেখিতে পাই সেটুকু তাহার অভিনয় বলিয়া মনে হইল। সেই দিন কিছু আহার না করিয়াই কাটাইয়া দিলাম, এতখানি ফাঁকি যাহার মধ্যে তাহার দেয়া খাবার আর খাইব না।

বৌদি ও সরসী সন্ধ্যার কিছু পরেই ফিরিয়া আসিল। আজই বৌদির সহিত বোঝা পড়া করিয়া কোনরূপে রাতটা কাটাইয়া প্রত্যুষে বিদায় লইব এইরূপ মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম। তাই বৌদি আসিতেই প্রথম সুযোগেই কথাটা পাড়িব এইজন্য বৌদির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম একটু পরেই সরসী হাজির হইয়া বলিল—মা ডাকছে আপনাকে কাকাবাবু—। আমি যেন সরসীর কথা শুনিতে পাই নাই এইরূপ ভান করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিলাম। সরসী আর একটু জোরে বলিল—ও কাকাবাবু চলুন না মা যে ডাকছে আপনাকে—।

আমি বলিলাম—তোমার মাকে বলগে আমি এখন যেতে পারব না আমার কাজ আছে।

সরসী অধীর হইয়া বলিল—কাজ আবার আপনার কী আছে এখানে। চলুন মিথ্যে কেন মাকে রাগাচ্ছেন, মায়ের রাগত জানেন না।

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—আমি এত তোমার মায়ের রাগের ধার ধারিনা। তোমার মাকে বলগে—যাও। এই কথা বলিয়া সরসীর দিকে চাইতেই দেখি বৌদি ঘরে প্রবেশ করিতেছে। বৌদি ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—সরসী যা উনোন ধরিয়ে দিগে। সরসী চলিয়া গেল। বৌদি একটু অস্বাভাবিক ক্ষোভের সহিত বলিল—ছিঃ ঠাকুর পো ঝি চাকরের কাছে রাগ দেখাতে আছে। ওরা কী ভাববে বল ত ?

আমিও উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—যা ভাবে ভাবুক এমনি ছলনার মধ্যে থেকে আমি হাঁফিয়ে উঠেছি।

বৌদি স্থির হইয়া কিছুক্ষন কী ভাবিল—তারপর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—ঠিক বলেছ ঠাকুর পো এই সোজা কথাটা এতদিনে জেনেছ এতে কী খুশী যে হলুম তা জানাবার কথা নয়। যাক্ এখন আমার তোমার সঙ্গে ঝগড়া করার সময় নয়। এখন এই তাগাটা পর দেখি। বেশ ভক্তি ক'রে পর, সব বিঘ্ন কেটে যাবে, বড় পাণ্ডা বলেছে। এই বলিয়া বৌদি একটি সুতার তাগা লইয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিল। আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পাহিলাম না। তাই বৌদির মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলাম। বৌদি অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—কী—কথাটা কানে গেল কী গেল না? ঢের ঢের মানুষ দেখেছি কিন্তু এমন ঘর জ্বালানে পর ভালানে মানুষ দেখি নি বাপু। যে ভালবাসবে তাকেই কাঁদান স্বভাব! মাকে কাঁদালে মণিকাকে কাঁদালে আমাকে জীবন ভোর কাঁদালে আর কাকে কাঁদিয়েছ তাত জানি না। আজ আবার রাগ ক'রে বাবুর খাওয়া হয় নাই। কী ক'রেই যে দেশ সেবা কর তা ভগবান জানে। এত নরম মন নিয়ে কী কোন কঠিন কাজ করা যায় ঠাকুর পো। এখন আমার কপালে কী আছে জানি না, নাও বাবা বিশ্বনাথের তাগা পর। খুব ভক্তি করে পরবে, তুমি আবার ঠাকুর দেবতা মান না।

কোন কথা না বলিয়া আমার ডান হাতটি বাড়াইয়া দিলাম। বৌদি পরম আগ্রহে আমার হাতে তাগা বাঁধিয়া দিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সরসী একটু পরেই চা লইয়া আসিয়া বলিল—এ আপনার ভাল কাজ হয় নাই কাকা বাবু, শুধু শুধু মাকে দুঃখু দিয়া লাভ কী হ'ল? কিছু না খেয়ে কী লাভ হ'ল শুনি? মা আপনাকে কত ভালবাসে তা জানবেন

কী ক'রে। আপনার কী খুব খারাপ মকর্দমা আছে, তাতে আপনার নাকি খুব বিপদ হ'তে পারে তাই মা কাশীতে যেয়ে বিশ্বনাথের তাগা নিয়ে এল আর মানত ক'রে এল, যদি বাবা বিশ্বনাথ এই বিপদ হ'তে উদ্ধার করে, তবে একশো এক সোনার পদ্ম গড়িয়ে দেবে। একশো এক টাকার পুজো দিয়ে এই তাগা নিয়ে এল। এমন মানুষকেও কাঁদাতে আছে কাকা বাবু?

সরসীর কথায় সব ওলট পালট হইয়া গেল। একটু আগে যাহার সহিত বোঝা পড়া করিবার জন্য তৈয়ারী হইতে ছিলাম, সরসীর কথা শুনিয়া সব কিছু বানচাল হইয়া গেল। এখন কী করা উচিৎ তাহা কোন রূপে ভাবিয়া পাইলাম না। চলিয়া যাইতেও মন চাহিতেছে না আবার বৌদির আশ্রয়ে থাকাটাও কেমন বিশ্রী মনে হইতেছে। রাত্রির খাওয়া দাওয়া সারিয়া এই চিন্তাই আমার মনকে পাইয়া বসিল। নিদ্রাহীন চক্ষে বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। নিস্তব্ধ রাত্রি চুনার সহরে আর একটি লোকও জাগিয়া নাই, চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে, এত নিস্তব্ধতা যে সামান্য একটু বাতাসে শুখনা পাতা পড়ার আওয়াজও যেন জোরে কানে বাজিতেছে। হটাৎ একটা শব্দ আমার কানে আসিল—কে যেন পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পনে আমার ঘরের দিকে আসিতেছে। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল তাই পদশব্দে আমার শংকা হইলেও খুব একটা ভয় হইল না। হটাৎ মনে হইল বৌদিও ত আসিতে পারে। এরূপ মনে হইবার কিন্তু কোন হেতু ছিল না, কারন এতদিনের মধ্যে বৌদি আমার নিকট রাত্রিকালে আমার ঘরে কোন প্রয়োজনেই আসে নাই এটা আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। আমি অবশ্য কারণে অকারণে তাহার কক্ষে গিয়াছি তাহাতে সে কোন দিন বাধা দেয় নাই। তবে দুদিন অধিক রাত্রিতে যাওয়ায় বেশ বুঝিতে পারিয়াছি বৌদি সে সময় দেখা করিতে

আমার সহিত প্রস্তুত নহে। জোর করিয়া বাধা না দিলেও অধিক রাত্রে তাহার দেখা করার কোন আগ্রহই দেখা যায় নাই। তাই বৌদি যে এত রাত্রিতে আমার নিকট আসিতে পারে সে কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কিছুক্ষণ কান খাড়া করিয়া শব্দের দিকে উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। পদধ্বনি কমিয়া গেছে। মনে কৌতূহল হইল দেখাই যাক্ না দরজা খুলিয়া কাহার এই পদধ্বনি। আস্তে আস্তে দরজা খুলিলাম—খুলিয়া দেখি সত্যই বৌদি দরজার একটী বাজুতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বৌদি কোন রূপ অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল—তুমি ঘুমিয়ে প'ড়েছ ভেবে জাগান ঠিক হবে কিনা ভাবছিলুম। এই বলিয়া বৌদি সোজা আমার খাটে আসিয়া বসিল। আমি নিকটেই জানলার ধারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বৌদি আমাকে ওভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিল ওখানে দাঁড়ালে যে? বস না তোমার বিছানায়। ব'সতে লজ্জা হচ্ছে? তা হ'লে আমিই না হয় দাঁড়াই।

আমি দুষ্টুমি করিয়া বলিলাম—ভয় হ'চ্ছে ব'সতে—।

বৌদি হাসিয়া বলিল—ও ভয়টা ভাল। ওতে মানুষকে অনেক বিপদ থেকে র'ক্ষে করে। তবে তুমি অনায়াসে এসে আমার কাছে বসতে পার, ভয় পাবার কিছু নাই। তাছাড়া সহজ ভাবে যাতে মেয়ে মানুষের কাছে বসতে পার সেই শিক্ষাটাও হ'য়ে যাবে।

আমি বলিলাম—সহজ ভাবেমেয়েদের সঙ্গে ঢের মিশেছি।

বৌদি হাসিয়া বলিল—বাজে কথা রাখ, তা যদি মিশতে পারতে তবে বেণীর বৌয়ের এমন দশা হ'ত না।

আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম—এ কথা তুমি বলছ কেন বৌদি?

বৌদি ঘাড় দোলাইয়া বেশ একটু জোরের সহিত বলিল—হ্যাঁ গো হ্যাঁ এই কথা বলছি, যে মেয়েটা তোমার ভরসায় সব ছেড়ে তোমার

আশ্রয়ে এল, তার কোন খবরই রাখলে না তুমি ঠাকুর পো, তোমার অবহেলায় তাকে অকালে প্রাণ দিতে হ'ল।

অবহেলা কোথায় করলুম বৌদি?

অবহেলা করনি? খুব অবহেলা ক'রেছ। আর তা না হ'লে সে এত বড় একটা বিপদে প'ড়ল তা তুমি জানতে পারলে না।

কী ক'রে জানব বল সে হ'ল মেয়ে মানুষ, তার মনের কথা জানব কী ক'রে বল?

বৌদি একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—তাই ত বলছি মেয়েদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে শেখ। বেণীর বৌকে মেয়ে মানুষ ভেবে তার কাছ হ'তে দূরে ছিলে। যার ভার নিয়েছিলে সে ভার পোয়াতে হ'লে যে কতখানি ক'রতে হয় তাত জান না।

বৌদির কথার মর্ম কতকটা আন্দাজ করিতে পারিলাম—তাই বলিলাম সত্যি বৌদি বেণীর বৌয়ের কোন খবরই আমি রাখতুম না। কেবল মাত্র আশ্রমের বা দেশের কাজে যেটুকু প্রয়োজন হ'ত সেইটুকুই তার সঙ্গে মিশতুম। সত্যি কথা বলতে কী মিশতে ভয় পেতুম। গ্রামের লোকের নোংরা নিন্দে ত তুমি শুনেই এসেছ সেই ভয়েই আমি তার কোন খবর নিতে সাহস করি নি? তাছাড়া ভয়ত আমার দিক থেকেও কম নয়। এই বিপদ ত আমার দিক থেকেও হ'তে পারত।

বৌদি দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—না তোমার দিক থেকে কোন বিপদ তার হ'ত না।

আমি উত্তর করিলাম—এ কথা তুমি কী ক'রে বলছ। তুমি ত আমার সব জান। বাইরে ভাল হ'লে কী হবে অন্তরে যে আমি কত দুর্বল তা ত তোমার অজানা নাই।

বৌদি উঠিয়া আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল—তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠে

বলিল—তোমার মত মানুষ কটা হয় বলত ঠাকুর পো। মণিকাকে তুমি এক কথায় ছেড়ে এলে, পাছে তার কোন বিপদ হয়। তখন তোমার বয়সই বা কী আর বুদ্ধিই বা কতটুকু। তারপর আমার কাছে এসে তুমি যখন আশ্রয় নিলে তখনও ত তুমি কম মনের জোর দেখাও নাই ঠাকুরপো। কটা পুরুষই বা সেই বয়সে একটা মেয়েমানুষকে গলা ছাড়িয়ে সোজা হ'য়ে বেরিয়ে আসতে পারে। সেদিন তোমাকে আমি বাঁধতে গেছলুম তখন বুঝেছিলুম একে বাঁধতে পারায় শক্তি আমার নাই উল্টো সেদিন তোমাকে বাঁধতে যেয়ে আমি বাঁধা পড়লুম তোমার কাছে। সে পরীক্ষায় তুমি যখন জয় ক'রে বেরিয়ে গেলে তখন কী আনন্দই না হ'য়েছিল। কেঁদেছিনু সেদিন ঠিক, তুমি চ'লে যাওয়ার জন্য নয়, তোমাকে হারাতে হবে ব'লে। তারপর যখন ফিরে এলে তখন যদি সত্যিই তুমি আমার কাছে জোর ক'রে থাকতে, তবে কী সাধ্য ছিল আমি বাধা দিই। তোমার শক্তির সেদিনও যেমন যাচাই ক'রেছিনু মৌগাঁয়েও তেমনি যাচাই ক'রেছিনু। ইচ্ছে ক'রলেই ত সেদিন তুমি আমাকে পেতে পারতে এ কথা জেনেও তুমি সেদিন সংযত হ'তে চেয়েছিলে। এই জন্যই ত তোমাকে এত ভালবাসি ঠাকুরপো, সেইজন্যই এত শ্রদ্ধা করি। বৌদির কথায় আমি যেন অভিভূত হইয়া পড়িলাম—বৌদি যে আমার এত প্রশংসা করিতেছি সত্যই কী আমি ইহার যোগ্য? তাই বলিলাম—বৌদি তুমি আমাকে ভালবাস ব'লেই এত গুণ আমার মধ্যে দেখতে পেলে। আমি কিন্তু মোটেই এত বড় প্রশংসার যোগ্য নই।

বৌদি বলিল—না গো না—যা বলছি তা মিথ্যে বলছি না। আমি তোমাকে ভালবাসতুম এ কথা কে বললে—যেদিন গলা জড়িয়ে ধ'রেছিলুম সেদিনও পর্যন্ত ভালবেসে গলা জড়িয়ে ধ'রি নি। নেহাত প্রয়োজন হ'য়েছিল তাই অমনটা ক'রেছিলুম। সে কথা ত আগেই

ব'লেছি। তারপর যখন দেখলুম একটা খাঁটী সোনা তুমি, তখনই ত তোমাকে পেতে ইচ্ছে হ'ল। জানি আমি তোমাকে পাব না তবুও মানুষের লোভ যা পাওয়া যায় না তার উপরই বেশী। এমনি ভালবাসি নি, তোমার গুণে মুগ্ধ হ'য়েই ভালবেসেছি।

আমি হাসিয়া বলিলাম—আচ্ছা তাই তোমার কথা মানলুম—এবার বেণীর বৌয়ের কথাটা শেষ কর দেখি।

বৌদি বলিল—হ্যাঁ সহজভাবে যদি তার সঙ্গে মিশতে তা হ'লে এমন বিপদে সে পড়ত না। তার রুদ্ধ বাসনার একটা পথ পেত। হয়ত এমনটা হ'ত সে তোমাকে ভালবেসেছে অথবা তুমি তাকে ভালবেসেছে কিন্তু ঐ পর্যন্তই, এর বেশী আর কিছু হ'ত না

আমি হাসিয়া বলিলাম—সর্বনাশ আবার ভালবাসার কথা।

বৌদি হাসিয়া বলিল—তাতে দোষের কী শুনি? ভালবাসা খারাপ কিসের? ভালবাসায় কেউ ছোট হ'য়ে যায় না। এই যে আমি এমন কলুষ জীবন যাপন করছি, ভালবাসার জোরে আমি বেঁচে আছি, এমন কী আমার মনেরও মৃত্যু হয় নাই। মানুষ মানুষকে ভালবাসবে না ত—কী ক'রবে। ঐ একটী মাত্র সুধা ভগবান মানুষকে দিয়েছে। সেই সুধার গুণেই ত মানুষ অমর হ'তে পারে। বেণীর বৌ যদি ভালবাসত তবে অপরাধ কিছুই ক'রত না আর তুমি ভালবাসলেও অপরাধ হ'ত না?

আমি হাসিয়া বলিলাম—কজন লোককে ভালবাসব।

বৌদি উত্তেজনার সহিত বলিল—হাজার লোককে ভালবাসবে। ভালবাসার পাত্র হ'লেই ভালবাসবে। ভালবাসা একের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জিনিষ নয়। বিশ্বে এটা আপনই ছড়িয়ে প'ড়বে। ভালবাসা শুধু অপরকে বাঁচায় না নিজেকেও প্রাণময় ক'রে তোলে। তোমাকে ভালবেসেছি বলেই ত বেঁচে আছি। তুমি যদি বেণীর বৌকে ভালবাসতে

তবে আমাকে ভালবাসা তোমার সার্থক হ'ত। যে মেয়েটা অকালে প্রাণ বিসর্জন দিল সে অন্ততঃ মাণিক দাদা ব'লে তার বিপদের দিনে আশ্রয় নিত। ভালবাসার মধ্যে ত সঙ্কোচ থাকে না ঠাকুরপো। সেইজন্যই ত বলছি আগে ভালবাসতে শেখ, মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে শেখ, দেখবে দুঃখ মোচনের কাজ সোজা হ'য়ে গেছে। ভালবাসতে ভয় পেয়েছ ব'লেই ত বেণীর বৌয়ের দুঃখ ঘোচাতে পারলে না। এই বলিয়া বৌদি চুপ করিয়া রহিল। বৌদির কথাটা মনের মধ্যে গভীর একটা রেখাপাত করিল। ক্ষুদ্র বেণীর বৌকে দয়া করিতে ছুটিয়া ছিলাম, হৃদয়হীন দয়ার চরম শিক্ষা সে আমাকে দিয়া গেল।

বৌদির দিকে চাহিয়া বলিলাম—বৌদি তুমি ত আমার চেয়ে বয়সে বড় নও বরং কিছু ছোট হ'তে পারো। এত কথা তুমি জানলে কী ক'রে ?

বৌদি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল—দুঃখের আগুনে পুড়ে শিখেছি ঠাকুরপো। সত্যকে জানবার ঐ একমাত্র পথ। বয়সের মাপকাঠিতে সত্যকে মাপা যায় না ঠাকুরপো। বাপের সম্পত্তিতে বঞ্চিত হ'য়ে যেদিন বস্তিতে এলুম সেদিন হ'তে দুঃখের জীবন শুরু হ'ল। আর সত্য যে সে তার স্বতঃজ্যোতি নিয়ে আমার কাছে অপূর্বভাবে দেখা দিল।

আমি বলিলাম—তোমার মত এমন কত মেয়েই ত দুঃখে প'ড়েছে কিন্তু তাদের ত এমন জ্ঞান দেখি না।

বৌদি জবাব দিল—খবর নিলে এমনি জ্ঞানই দেখতে পেতে। তবে যদি তার ব্যতিক্রম দেখ তবে জানবে তাদের মনের মৃত্যু হ'য়েছে এই বলিয়া বৌদি চুপ করিল, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—যে কথা বল'তে এলুম বলা হ'ল না, তুমি শুয়ে পড় কাল এখন কথা হবে।

আমি দুষ্টুমি করিয়া বলিলাম—আচ্ছা বৌদি তুমি যে ব'ললে বেণীর বৌয়ের আমার থেকে বিপদ হ'তে পারত না এই যদি তোমার ধারণা, তবে আমাকে কেন তাড়িয়ে দিতে চাও, তোমার কাছ হ'তে আমারও কোন বিপদ হবে না নিশ্চয় ?

বৌদি বলিল—তাই ত মনে হয়।

আমি বলিলাম—তবে এস না দরজা বন্ধ ক'রে আমরা এক ঘরে শুয়ে পড়ি।

বৌদি হাসিয়া বলিল—ভারি মজার কথা, সুস্থ মনের বুঝি অসুখ হ'তে পারে না ? এই বলিয়া বৌদি আমার মাথায় একটা টোকা দিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। স্বর্গ হইতে একটা আলো যেন সমস্ত ঘরটাকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে। সেই উজ্জল আলোক আমার অন্তরের সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া গেল। মনে হইল বৌদি ও আমি সেই আলোর বিচ্ছুরিত কিরণে গলিয়া গলিয়া মিশিয়া গিয়াছি। আর আমাদের কোন ভেদ নাই আর আমাদের কোন কিছু অজানা নাই।

১৯

কয়েকদিন পরে দেখি বাহিরের দরজায় গোবর্দ্ধন চেঁচামেচি করিতেছে। গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। গোবর্দ্ধন আমার সন্ধান জানিল কী করিয়া! গোবর্দ্ধনকে চিঠি দিবার কথা ছিল কিন্তু পাছে পুলিশে আমার খোঁজ পায় সেই ভয়ে তাহাকে পত্র দিই নাই। দারোগা আমাকে আশ্বাস দিলেও বিপদের ভয় আমার কাটে নাই, তাই পুরোপুরি দারোগার কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া বাহিরের দরজার নিকট ছুটিয়া গেলাম। গোবর্দ্ধন আমাকে দেখিয়া বলিল—এ কোথায় এসে জুটেছিস বলত মাণকে ? এই ব্যাটা একাওয়ালা একবারে মারহাট্টা। বেটা যেখানে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে

আর বলছে—আরহ্রাযায়েগা না—। ব্যাটার কথা এক বর্ণ বোঝবার জো নাই আর বলতে গেলে দাঁত খিঁচিয়ে আসে। এখন ছাখ পাঁচ টাকা ভাড়া চাচ্ছে। দুদিন দু রাত্রির পথ এলুম তাতে পাঁচ টাকা লাগল না আর ব্যাটা সামান্য পথেই পাঁচ টাকা চাইছে।

এক্কাওয়ালার নিকট ব্যাপারটি জানিতে পারিলাম, সে গোবর্দ্ধন লইয়া সারা চুণারের যত জায়গায় বাহিরের বায়ুসেবীরা আসিতে পারে তত জায়গায় ঘুরিয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে এবং তাহার অশ্ব যুগল থকিয়া গিয়াছে অবশেষে কোন রকমে সে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এক্কাওয়ালাকে কোনরূপে প্রবোধ দিয়া দুইটী টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলাম।

গোবর্দ্ধন বলিল—টু রুপীজ দিলি—টু মাচ হ'য়ে গেল। রেলের সঙ্গে পড়তা ক'সে ছাখ দেখি কত হয়?

আমি বলিলাম—থাক্ এখন ভেতরে চ, পরে পড়তা কসা যাবে।

গোবর্দ্ধন বলিল—তোরা পয়সাটাকে এমন সস্তা মনে করিস কী ক'রে বলত? কই সাত হাত মাটি কুঁড়ে একটা পয়সা বের কর দেখি?

গোবর্দ্ধনকে বলিলাম—ভেতরে যাবি না এখানে দাঁড়িয়ে পয়সার হিসেব হবে?

গোবর্দ্ধন আমার দিকে চাহিয়া বলিল—এই ছাখ যে কথা বলব ভাবছিলুম তাই বলা হ'ল না। তা ব্রাদার তুই এখানে কী ক'রে? এক্কাওয়ালার জন্যে মাথার ঠিক নাই। তাই জিজ্ঞেস করা হয় নাই। তোকে যে এখানে দেখতে পাব তাত ভাবি নি।

আমি বলিলাম—আমিই ত ভাবছি ব্রাদার তুই কী ক'রে এখানে আমার সন্ধান পেলি?

গোবর্দ্ধন বলিল—আমি সন্ধান পাব কী ক'রে তোর, তুই কী চিঠি

দিয়েছিলি ? বৌদি চিঠি দিয়েছিল আসবার জন্য এখানে, তা বৌদি মাইরী চিঠিতে একটা কথাও লেখেনি যে মানকেও এখানে হ্যাজ্‌।

বৌদি উপর হইতে উচ্চৈস্বরে বলিল—কী ঘর ঢুকবে না আজ দুই বন্ধুতে দাঁড়িয়ে ঐখানেই কথা হবে।

গোবর্দ্ধন উপরের দিকে চাহিয়া বলিল—যে কষ্টে কাম্‌ ক'রেছি বৌদি তার কথা নাই। থাক্‌ ভাবতে হবে না এখানে যখন এসে গেছি তখন আর ঘরে ঢোকবার জন্য কল্‌ ক'রতে হবে না। ধর মাণকে আমার বিছানাটা যা ভারি।

আমি গোবর্দ্ধনকে লইয়া উপরে আমার ঘরে গেলাম। গোবর্দ্ধন আমার ঘরটী দেখিয়া বলিল—বেশ মজাতে আছিস, এদিকে আমাকে পুলিশে যা টানা হ্যাঁচড়া ক'রছে। তুই করলি আশ্রম আর আমার এদিকে ফাদার-মাদার মরা দায় হ'য়েছে।

আমি বলিলাম—আচ্ছা এখন পরে শোনা যাবে। এতটা রাস্তা এলি একটু বিশ্রাম কর পরে সুস্থির হ'য়ে শোনা যাবে।

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল—এতটা রাস্তা এলুম বা আমি কী হেঁটে এসেছি। আগেকার দিনে যেমন ক'রে গাছ চ'লত তেমনি রেলে বসতেই ঝাঁ ক'রে একবারে এখানে, কষ্টটা আর কী—কষ্টর মধ্যে খালি ঘুমুতে পারিনি অন্যমনস্ক হ'লে পাছে ষ্টেশনটা না প'ড়তে পারি। বর্দ্ধমান থেকে সব ইষ্টিসেন ত প'ড়ে প'ড়ে এসেছি। চূণার কোথায়রে মাইরী একবারে রাজ্যি পেরিয়ে!

বৌদি আসিয়া উপস্থিত হইল তারপর গোবর্দ্ধনকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ও হড়বড়ে ঠাকুরপো কথা কইবার সময় চ'লে যাচ্ছে না, এখন মুখ হাত ধুয়ে কিছু মুখে দাও।

গোবর্দ্ধন তাহার নাম করণে খুব খুসী হইয়া বলিল—আমি বৌদি

কথা না ক'য়ে গোমড়া মুখ ক'রে থাকতে পারি না। মাণকে বেশ পারে। ঐ রকম ক'রে ও থাকে ব'লে আমার এক এক সময় এমন রাগ হয়—

বৌদি গোবর্দ্ধনের কথা থামাইবার জন্য বলিল—আবার বাজে কথা, যাও মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও আগে। দুদিন ধ'রে যে নাওয়া-খাওয়া নাই তা গ্রাহ্য নাই, বন্ধুকে দেখে সব ভুলে গেলে দেখছি।

গোবর্দ্ধন উত্তর করিল—তা যা ব'লেছ বৌদি মাণকে হ'ল আমার হার্টের ফ্রেণ্ড, মানে পরাণের বন্ধু। যাক্ এখন চল কোথায় পুকুর-টুকুর আছে দেখিয়ে দাও।

বৌদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোবর্দ্ধন বাহির হইয়া গেল।

গোবর্দ্ধনের মুখে খুনের মামলার বিবরণ জানিলাম। অমল যে ষ্টেট্‌মেণ্ট দিয়াছিল তাহা পরিবর্তন করিতে সে রাজী হয় নাই। ঐ মকদর্মায় আমার সাক্ষ্যেরও প্রয়োজন ছিল কিন্তু অমলের স্বীকৃতির জন্য তাহার দরকার হয় নাই। গোবর্দ্ধনকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। মহাকুমা হাকিম অমলকে দায়রা বিচারের জন্য পাঠাইয়াছে। অমলের দায়রা বিচারের আরও দুই মাস দেরী আছে। জমীদার মধুসূদন ভট্টাচার্য আমাকে জড়াইবার বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারে নাই। অমল নাকি তাহার বিবৃতিতে ও হাকিমের প্রশ্নে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিয়াছে। অমল হাকিমের কাছে বলিয়াছে "এই কথা যদি মাণিকদা জানতেন তবে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের বাঁচবার পথ ব'লে দিতেন। আমাদের এই গোপন কথা বলার মত একটী মাত্র লোক আশ্রমে ছিল যার স্নেহে আমরা মানুষ হয়েছি সে হ'ল মাণিকদা, কিন্তু স্নেহের দাবী আমরা আগেই হারিয়ে বসেছিলুম। তিনি যখন সন্দেহ করেছিলেন তখন অনেক মিথ্যা সাধুতার ভান ক'রে মাণিকদাকে 'ছোট মন' ব'লে

গালাগালি ক'রে ছিলুম। কোন মুখে তারপর আর তার কাছে সাহায্য চাইব। চাইতে পারলে এই ভয়াবহ পরিণতি হ'ত না।"

গোবর্দ্ধনের মুখে শৈলর সাক্ষ্যের বিবরণ শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। অনিন্দিতা যেদিন অমলের সহিত চলিয়া যায় সেদিন শৈল উভয়ের জন্য খাবার প্রস্তুত করিয়া দেয়। অনিন্দিতা শৈলকে বলে—আমরা আর ফিরব না। অমল আমাকে বিবাহ ক'রে সহরে নিয়ে থাকবে। শৈল এইরূপ করিতে নিষেধ করিলে—অনিন্দিতা বলে "এ ছাড়া যে আমার উপায় নাই, আমার পেটে যে অমলের সন্তান রয়েছে। এত আর বেশীদিন গোপনে থাকবে না, তাইত সব ছেড়ে পালাতে হ'চ্ছে।" শৈল তখন বলে—আমি মাণিকদাকে বলব, নিশ্চয়ই তিনি এর একটা উপায় বের ক'রবেন। তাতে অনিন্দিতা বলে "এ উপায় ছাড়া আর তিনিই বা কী ক'রবেন?" শৈল বাধ্য হ'য়ে তাতে সম্মতি দেয়। বিদায়ের সময় অমল ও অনিন্দিতা শৈলকে বলে "আমরা নতুন ক'রে ঘর বাঁধতে চললুম যদি কখনও সম্ভব হয় আমাদের ঘরে পায়ের ধূলো দিও।" অনিন্দিতা যে তার বাড়ী ছেড়ে জন্মের মত চ'লে যাচ্ছে এ কথা তাদের দেখে বোঝাই যায় নাই এত তাদের হাসিখুশী। শৈল অনিন্দিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—অনিন্দিতার যে এত বিষয় আসয় তার কী হবে? অনিন্দিতা নাকি হাসিয়া বলিয়াছিল—"বিষয়ে কী আছে শৈল, বিষয় নিয়ে মানুষের কী সুখ? বিষয় যদি কপালে থাকে, যার সঙ্গে যাচ্ছি সেই একদিন ক'রে নেবে।" এই সাক্ষ্য দিয়া শৈল হাকিমের নিকট কাঁদিয়া বলে "তখন কী জানতুম যে যমের সঙ্গে দিদি আমার চ'লল। দিদিই কী জানত যে—যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে তার হাতে তার প্রাণ যাবে।"

কী করুণ এবং হৃদয়বিদারী সাক্ষ্য। গোবর্দ্ধন বলিল আমি জানতুম অমল যে রকম কেষ্টকেঁটালি করে ও সিষ্ক ক'রে ক'রে

ওয়াটার ড্রিঙ্ক ক'রবেই মাণকে। কিন্তু এমন ডেঞ্জারাস ওয়াটার ড্রিঙ্ক ক'রবে মোটেই ভাবি নাই, তা যদি ভাবতুম তবে হ্যাঁ বাছাধনকে এক গাঁট্টায়—আর বেণীর বৌয়েরের মত বিউটীফুল মেয়ে শয়েকে একটা পাওয়া যায় না। অল্পদিনেই আমার চেয়ে লেখাপড়া শিখে ফেলেছিল রে মাইরী। তোর মতই পুলিশ-ফুলিশকে গ্রাহ্য ক'রত না। গোবৰ্দ্ধন বলিয়া যাইতে লাগিল—এদিকে মামলা আর এদিকে খোকার বাবার শাসানি। গাঁশুদ্ধ লোক এসে আশ্রমের লোককে তাড়িয়ে দিলে, আমাকেও খুব তুম্বি। আমি তখন এক ফন্দি ক'রে বললুম—আমাদের পেছুতে লাগতে এস না খুনের আর কী দেখছ এইত শুরু, আমরা গান্ধীর দল ছেড়ে অরবিন্দর দলে যোগ দোব। এই শুনে ব্যাটাদের সবার মুখ শুখিয়ে গেল। কিন্তু আশ্রমটা আর বেণীর বৌয়ের ঘরবাড়ি, খোকার বাবা দখল ক'রে নিলে কোন রকমে ঠেকান গেল না।

আমি উত্তেজিত হইলা বলিলাম—আইন মত সে পারে না এসব দখল ক'রতে।

গোবৰ্দ্ধন বলিল—রেখে দে তোর আইন। এ আর কেউ নয়, এ হ'ল খোকার বাবা, ওর সঙ্গে এখন এ নিয়ে ঝগড়া ক'রতে যাবে কে বল্ দেখি?

মনে মনে বুঝিতে পারিলাম গোবৰ্দ্ধনের ভয় অমূলক নহে সত্যই এ সময় খোকার বাবা সহিত দ্বন্দ্ব করিবার মত শক্তি আমাদের নাই।

বৌদি গোবৰ্দ্ধনকে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিল। নানা রকমের ভাল ভাল রান্না করিয়া খাওয়াইতে লাগিল, কাশী হইতে লোকমারফত ভাল ভাল সন্দেশ ও অন্যান্য মিষ্টান্ন আনিয়া খাওয়াইতে লাগিল। গোবৰ্দ্ধনের আনন্দের আর সীমা নাই। একদিন গোবৰ্দ্ধন ও আমি

খাইতে বসিয়াছি গোবর্দ্ধন খাইতে খাইতে বলিল এ রকম ফুড জুটলে আর কে স্বদেশী করে। বৌদি গোবর্দ্ধনের বাটীতে আর একটু মাংসের ঝোল দিতেই গোবর্দ্ধন বলিল ডোণ্ট, ডোণ্ট গিভ, পেট একবারে ফুল লোড হ'য়ে গেছে আর ইট ক'রতে পারব না। বুঝলি মাণকে এ রকম খেতে পেলে আর স্বদেশী করা যাবে না।

আমি বলিলাম এই রকম খেতে না পাওয়ার জন্যই ত স্বদেশী করা। স্বাধীনতার অর্থ, মানুষ ভাল খেতে পাবে প'রতে পাবে।

গোবর্দ্ধন বলিল—বলিস্ কিরে স্বাধীনতা হ'লে এই রকম রোজ ঘরে ঘরে নেমন্তন্ন বাড়ী! আচ্ছা ধর মতে বাগ্দি উমেশ মুচি এরাও ত তাহ'লে এমনি খেতে পাবে।

বৌদি বলিল—হ্যাঁগো হ্যাঁ, দেশ স্বাধীন হ'লে ওদেরও এমনি খেতে পাওয়া উচিৎ।

গোবর্দ্ধন উল্লসিত হইয়া বলিল—তবে ত আমরা ভারী গুড কাজে হাত দিয়েছি কিন্তু ভাল হ'লে কী হবে, খোকার বাবা কী স্বাধীনতা হ'তে দেবে, যা পেছুতে লেগেছে বৌদি—বেণীর বৌয়ের বাড়ীটা দখল ক'রে কাছারী বাড়ী ক'রেছে। কতবার যে তার বিরুদ্ধে গাঁথানার লোককে জড় ক'রেছি তার ঠিক নাই, আবার নানা ফিকিরে তাদিকে ভাঙ্গিয়ে নিজের দলে টেনে নিয়েছে। দেশের গরীব লোকেরা যে একটু হায় ক'রে ভাল মন্দ খাবে খোকার বাবা তা হ'তে দেবে না।

গোবর্দ্ধন তারার বৌদির দিকে চাহিয়া বলিল—আচ্ছা এই খোকার বাবাটাকে কী করি বলত?

বৌদি হাসিয়া উত্তর করিল—কিচ্ছু ভাবতে হবে না ঐ মতিলাল আর উমেশের দল একদিন খোকার বাবাকে ঢিট ক'রে দেবে। এই খাবার হ'তে তাদের বেশীদিন বঞ্চিত রাখা যাবে না।

গোবর্দ্ধন বৌদির কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বলিল" ওরা ক'র্বে খোকার বাবাকে জব্দ! ওরা এখন ব'লছে "গোবরঠাকুর আর এই মাণিক বাবু এসেই ত গাঁয়ে জমীদারের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ক'রে দিলে। নয় ত মনিবে জুতো মারলে কবে আর কে তাই নিয়ে মিটিং ক'রেছে।" এখন জমিদার ঘর হ'তে গরু-ছাগল পর্যন্ত বেরুতে দেয় না, বেরুলেই জমীদারের পিয়াদা ধ'রে নিয়ে যায়। তাই তারা সব এখন একজোট হ'য়ে জমীদারের কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

বৌদি হাসিয়া বলিল—তা তারা অন্যায় ক'রেছে কী, তাদের নেতারা যদি চম্পট দেয় এ করা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর কী বল।

বুঝিলাম বৌদি এই কথাটী আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে। তাই বলিলাম—নেতা হবার এত ঝঞ্ঝাট তা জানতুম না বৌদি—তা হ'লে আর ঐ দিকে পা বাড়াই।

বৌদি বলিল—দেশের লোকের দুঃখু ঘোচাতে হ'লে তাদের সকল ঝক্কি মাথা পেতে নিতে হবে এ কথা বুঝি ভাব নি? মনে ক'রেছিলে মন্ত্র বলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। এ জল পড়ার ভূত নয় ঠাকুরপো। কতলোক ফাঁসী গেল দেখলে না? তবুও কী তাদের নেতারা দেশ সেবা ছেড়ে দিয়েছে। পালিয়ে এসে ঠিক করনি। ঐ সব দিনে যদি লড়তে না পারবে তবে লড়াই জয় ক'র্বে কী ক'রে? এই অহেতুক ভয়ই ত আমাদের দেশের লোকের সর্বনাশ ক'রছে।

গোবর্দ্ধন বলিল—যা ব'লেছ বৌদি মাণকের সব বিষয়ে একটু বেশী রকম ফীয়ার। ছেলেবেলায় একবার আমাকে দেখেই ভূত মনে ক'রে দাঁতকপাটী হ'য়ে গেল।

আমি গোবর্দ্ধনের স্থূল পরিহাসে চটিয়া গিয়া বলিলাম—চুপ কর বাঁদর সব বিষয়েই তোর ইয়ার্কী!

গোবৰ্দ্ধন হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—বৌদি দেখছ বাবুর রাগ। মানে মেয়েদের কাছে ওর ক্যারেক্টারটা বললুম ব'লে লজ্জা হ'য়ে গেল।

বৌদিও গোবর্দ্ধনের হাসিতে যোগ দিল।

গোবর্দ্ধন বলিল—আচ্ছা বৌদি কই মৌগাঁয়ে ত এত ভাল ভাল রান্না ক'রতে না।

বৌদি উত্তর ক'রল—তখন কী এসব জিনিষ জোটাবার মত পয়সা ছিল আমার।

গোবর্দ্ধন বলিল—তা বটে। সে কথা একদম ফরগেট ক'রে গেছি।

মৌগাঁয়ে ভাল খাবার বৌদির যে জুটিত না তাহা গোবর্দ্ধন শুনিয়া গেলেও এখানে তাহা কীরূপে জুটিতেছে গোবর্দ্ধনের সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন বা কৌতূহল নাই। সদানন্দ পুরুষ অনাবশ্যক বিষয়ের জটিলতা তাহার মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না।

গোবর্দ্ধন বৌদির সহিত যেরূপ সহজভাবে মেলামেশা করে সেরূপ আমি পারি না। একরাত্রি গোবর্দ্ধন বৌদির খাটে গল্প করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ায় তাহাকে না উঠাইয়া বৌদি নীচে মাদুর পাতিয়া নিঃশংক চিত্তে সারারাত নিদ্রা গেল। গোবর্দ্ধনকে জাগাইয়া তাহাকে ঘরে যাইতে বলিল না বা নিজে অন্য ঘরে শুইতে গেল না। এই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত ব্যাথা পাইলাম। বৌদি আমাকে এমন সন্দেহ করে কেন? কই এত সহজভাবে ত বৌদি আমার সহিত মেলামেশা করে না।

দূর্গাবাড়ীর পথে আমি ও বৌদি বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। গোবর্দ্ধনও রোজ আমাদের সঙ্গে থাকে কিন্তু সেদিন কেন জানি না সে আসিল না। বৌদি বলিল—গোবর ঠাকুরপো এল না খুব সম্ভব নিয়ম ক'রে বেড়ান পছন্দ করে না। ওর মনে কোন নিয়মের বাঁধন সহ্য হয় না।

বৌদির কথা ঠিক। বৌদি গোবর্দ্ধনের চরিত্রের নিখুঁত পরিচয়

পাইয়াছে। গোবর্দ্ধনের উপর যেন তাহার অসীম ভালবাসা। এ ভালবাসা যেন আমাকেও ছাপাইয়া যায়। তাই একটু ক্ষোভ করিয়া বলিলাম—গোবর্দ্ধনকে তুমি বেশী ভালবাস কী বল বৌদি— ?

বৌদি বলিল—তার মানে ?

আমি বৌদির কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম—তুমি গোবরাকে যতটা বিশ্বাস কর ততটা আমাকে কর না।

বৌদি হাসিয়া বলিল—তোমাকে অবিশ্বাস করলুম কোথায় আবার !

আমি বললুম—কর নি ? পরশু গোবরা তোমার ঘরে রাত্রে রইল, কই তার কাছে তোমার রাত কাটাতে বাধল না ত ? আর আমার বেলায়-

বৌদি বলিল—ও এই কথা—আমি মনে ভাবছি এমন কী অবিশ্বাস করলুম। ওতে দুঃখু পাবার কিছু নাই। তুমি হ'লে পুরুষ মানুষ তাই মেয়ে মানুষ ব'লেই একটু লজ্জা হয় আর কী।

আমি অপমানিত বোধ করিলাম তাই ক্ষুব্ধকেণ্ঠ বলিলাম—আর গোবরা মেয়ে মানুষ—কী বল ?

বৌদি হাসিয়া বলিল—মেয়ে মানুষ হ'তে যাবে কেন, শাস্ত্রে যাকে বলে নিত্যসিদ্ধ, ভাগবতে যেমন শুকদেব আর কী, ওদের কলঙ্ক স্পর্শ করে না।

আমি বলিলাম—গোবর্দ্ধন এত বড়।

বৌদি বলিল—বড় ছোটর কথা জানি না তবে ওরা অমনি আজন্ম নিষ্কলঙ্ক, তুমিই ত ব'ললে বেণীর বৌয়ের ভয়ে তুমি বাড়ী যেতে না। আর গোবর ঠাকুরপো রোজই যেত।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ।

বৌদি বলিল—আর তোমার নামে বেণীর বৌয়ের নাম জড়িয়ে লোকে কুৎসিৎ সমালোচনা ক'রেছে। আর আসলে বেণীর বৌয়ের

তার বেণীর মা গোবর্দ্ধনের হাতে দিয়েছিল, একথা সকলে জেনেও ত গোবর্দ্ধনের নামে একটা কথা বলে নাই। কেন তারা কী জানে না গোবর্দ্ধনও তোমার মতই পুরুষ মানুষ? বৌদি বলিয়া যাইতে লাগিল—ও রকম মানুষেই সত্যকারের দুঃখ মোচন ক'রতে পারে। ও আমার সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, আমি সঙ্গে নেই নি কিন্তু ঐ আমার সত্যই দুঃখু ঘোচাতে পারত।

আমি বলিলাম—তুমি সঙ্গে নিলে না কেন?

বৌদি বলিল—ওর চেয়ে তোমাকে ভালবাসি ব'লে। আমার চেয়ে ওর প্রয়োজন তোমার কাছে ঢের বেশী।

চরিত্র বিশ্লেষণে বৌদি অদ্বিতীয়। গোবর্দ্ধনের সাহায্য না পাইলে সত্যই আমি কোন কাজ করিতে পারিতাম না।

বৌদি উচ্চস্বরে বলিয়া যাইতেছে—অথচ ওদের মত মানুষকে কেউ কোনদিন মালা পরিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে মানপত্র দেবে না। তাই আমি একটু সম্মান ক'রেছি ব'লে তোমার হিংসে হ'চ্ছে ঠাকুরপো?

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম—জোড় হাত করছি বৌদি আর আমাকে গালাগালি ক'র না।

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপচাপ চলিতে লাগিলাম। কখন সেই পাথরটার কাছে আসিয়া গিয়াছি। এই পাথরটাকে দেখিলেই আমি কেমন যেন অভিভূত হইয়া যাই। বৌদি পাথরটায় উপর উঠিয়া বসিল—আমাকেও উঠিবার জন্য হাত বাড়াইয়া অনুরোধ করিল। আমিও বৌদির হাত ধরিয়া পাথরটার উপর উঠিয়া বসিলাম।

আমি বলিলাম—বৌদি এটা সেই পাথর যেখানে উর্বশী আমার ধ্যান ভাঙ্গিয়ে ছিল। বৌদি কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। বৌদি আমার কথার উত্তর না দিয়া বলিল—কাল একবার গোবর ঠাকুরপোকে

তুমি কাশীটা দেখিয়ে নিয়ে এস ত। ওকে একা ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না।

আমি বলিলাম—কালকের কথা কাল হবে, এখন উর্বশীর খবর শোনা যাক্।

বৌদি বলিল—উর্বশীর স্বর্গে ফিরে যাবার জন্য মন ধড়ফড় ক'রছে জেনে তপস্বী এখন অন্য কোন আশ্রম বালিকার সন্ধান ক'রছে।

আরে ছিঃ ছিঃ উর্বশীকে ছেড়ে আবার আশ্রম-বালিকা, না জানে তারা উর্বশীর মত নাচতে, না জানে তারা গাইতে।

তা না জানুক—তারা কাঁদতে জানে।

কাঁদুনে মেয়ে তপস্বী বিয়ে ক'রবে কেন?

কাঁদুনে মেয়ে খারাপ নাকি? ঐ দেখেই ত মেয়ে বিয়ে ক'রতে হয়। কে ক'ঘটি কাঁদতে পারে স্বামীর জন্য। তাছাড়া কান্নাই কী কম জিনিষ ঠাকুরপো? মানুষ ত ঐটাই চায়, একজন একজনের জন্য কাঁদুক।

বৌদি তুমি বড় গুরুগম্ভীর হ'য়ে প'ড়ছ।

খুব সম্ভব পাষাণটার দোষ, চল নেমে পড়ি।

ঠিক বলেছ। সেদিনের উর্বশী সব সময়েই মনে একটা খোঁচা দেয়। চল নেমে পড়ি।

কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর বৌদি বলিল—সত্যি বলছি ঠাকুরপো বিয়ে করগে, এতে তোমার দেশ সেবার কাজ সোজা হ'য়ে যাবে।

প্রশ্ন করিলাম—তা কী ক'রে হবে?

বৌদি বলিল—তা হ'লে জনসাধারণের মধ্যে তুমিও একজন হ'য়ে যাবে। লোকে এখন যে কতকগুলো অহেতুক ভক্তি ক'রছে সেটা হ'তে তুমি বাঁচতে পারবে। সাধারণ লোক যখন দেখবে, তাদের মতই একজন

লোক এত বড় ত্যাগ ক'রছে, তখন তারাও উৎসাহ বোধ ক'রবে। সাধারণ লোকের ধারণা এ সব কাজ বুঝি ঐ এক ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী না হ'লে করা যায় না।

আমি বৌদির কথায় চমকিত হইয়া বলিলাম—ঠিক ব'লেছ বৌদি—বহু লোক আমাকে ব'লেছে "আপনাদের কী, আপনাদের ত আমাদের মত স্ত্রী-পুত্র নাই তাই আপনারা যা পারেন আমরা তা পারব' কি করে।"

বৌদি বলিল—হ্যাঁ তারা ঠিকই বলে—তাদের সে ভ্রম ভাঙ্গিয়ে দিতে হবে। দেখিয়ে দিতে হবে ছেলেপুলে স্ত্রী সংসার নিয়েও দেশের কাজ করা যায়। যেমন মহাত্মা গান্ধী ক'রছেন। তোমার বাংলা দেশেই খালি তোমাদের মত লোকের হাতে নেতৃত্ব র'য়েছে তাই তোমাদের ভাল কাজকেও লোকে ভাল মনে করে না। অহেতুক ভক্তিতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি বলিলাম—কিন্তু বিয়ে—

বৌদি আমার কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিল—বিয়ে ক'রতেই হবে এমন কথা আমি বলছি না—তবে সুযোগ হ'লে আমার কথা মনে রেখ।

বৌদি আজ কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছে। আমি বলিলাম—বৌদি আজ যেন তোমাকে কেমন কেমন লাগছে—তোমার শরীর খারাপ নয় ত?

বৌদি বলিল—না শরীর ভালই আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তবে তোমার কথা ভার ভার ঠেকছে কেন?

বৌদি গাঢ় স্বরে বলিল—খুব সম্ভব কথা ফুরিয়ে আসছে ব'লে।

আমি শঙ্কিত কণ্ঠে বলিলাম—আজ কী হ'য়েছে বৌদি তোমার—

বৌদি বলিল—কিছুই হয় নি স্বপ্ন দেখছিনু এতদিন—এখন ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

কেমন যেন অজানা আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, বলিলাম—বৌদি, তোমার কথা বুঝতে পারলুম না, নিশ্চয়ই তোমার কোন অসুখ ক'রেছে।

বৌদির দিকে চাহিয়া দেখিলাম বৌদি যেন পড়িয়া যাইতে যাইতে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে। বৌদিকে ধরিয়া ফেলিলাম। চৈতন্যহারা হইয়া বৌদি আমার বুকে ঢলিয়া পড়িল। বুঝিলাম মূর্চ্ছা হইয়াছে। ধীরে ধীরে তাহাকে কোলের উপর শুয়াইয়া আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। রাত্রির অন্ধকারে কিছু দেখা যাইতেছে না। কেবল একটী বেদনা কাতর দীর্ঘশ্বাস মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে বৌদির মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল। আমার কোলে মুখ রাখিয়া তখনও সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। একটু আগেই বৌদি বলিয়াছে কান্না মধুর, কিন্তু এত মধুর তা ত জানিতাম না। প্রকৃতি যেন করুণা করিয়া সমস্ত জগতকে অন্ধকার করিয়া একটু কাঁদিবার জন্য নিভৃত স্থান রচনা করিয়া দিয়াছে।

আমরা সেদিন গভীর অন্ধকারে উভয়ে প্রাণ ভরিয়া কেবল কাঁদিয়াছিলাম—কিন্তু কেন কাঁদিয়াছিলাম জানি না।

বাড়ী ফিরিতে বেশ একটু রাত হইয়া গেল। বাড়ী পৌছাইতেই গোবৰ্দ্ধন বলিল—বাব্বা আচ্ছা বেড়ান। আর যেন কখনও বেড়াতে পাবে না, তাই শেষ বেড়ান হ'চ্ছিল।

গোবৰ্দ্ধনের কথাই সত্য হইল। এই আমাদের জীবনে শেষ বেড়ানর দিন।

পরের দিন গোবর্দ্ধনকে লইয়া কাশী গেলাম। সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি বৌদি গৃহ শূন্য করিয়া অন্তর শূন্য করিয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া গেছে।

বাড়ীওয়ালী বলিল—উয়ো জেনানা লোক চলা গিয়া—এক চিঠ্‌ঠি রাখকে গিয়া।

পত্র খুলিয়া দেখিলাম, বেশী কিছু লেখা নাই। আমাদের থাকিবার মত খরচপত্র রাখিয়া গিয়াছে। আর আমরা যেন মনে দুঃখ না করি। তাহাকে যেন খুঁজিবার চেষ্টা না করি। গোবর্দ্ধনকে যেন কাছ ছাড়া না করি। এমনি দু একটা কথায় পত্র শেষ করিয়াছে। পত্র পড়িয়া বুকে এক অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিলাম—সে দিনের সেই পাষাণটা যেন আমার বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া চাপিয়া বসিতেছে।

গোবর্দ্ধন বলিল—বৌদি তা হ'লে সত্যিই কেটে প'ড়েছে বল্? বেশ খাওয়া দাওয়া চলছিল মাইরী।

আমি গোবর্দ্ধনের কথায় চটিয়া গেলাম, ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলাম—তারা না ব'লে চ'লে গেল এতে তোর দুঃখু হ'ল না, খাওয়াটাই তোর বড় হ'ল।

গোবর্দ্ধন বলিল—না ব'লে গেল কী ক'রে—যাব যাব ত ক'রছিল কদিন ধ'রে।

কই বৌদি আমাকে ত কিছু বলে নি তুই জানলি কী ক'রে—এই বলিয়া গোবর্দ্ধনের মুখের দিকে চাহিলাম।

গোবর্দ্ধন বোকার মত হাসিয়া বলিল—মানে তোকে বলে নি তুই দুঃখু পাবি বলে—বৌদি তোকে লভ্ করে কি না? গোবর্দ্ধনের কথায় ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল—সক্রোধে বলিলাম—তুইও গেলি না কন, তবে আপদ চুকে যেত। হাঁদারামকে নিয়ে আমার হ'য়েছে মরণ।

গোবর্দ্ধন আমার দিকে চাহিল। মনে হইল সে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তারপর ধীরে ধীরে বলিল—রাগ করছিস্ মাণকে, তোকে সে ভালবাসে তুই তার মনের কথা জানলি না, আর আমি জানব ?

গোবর্দ্ধনের কথায় বুঝিতে পারিলাম গত সন্ধ্যায় বৌদি কেন এমন করিয়া কাঁদিয়াছিল—তখন ত জানি না সে চোখের জলে বিদায় লইতেছে।

গোবর্দ্ধন ও আমি কয়েকদিন ধরিয়া পশ্চিমের নানা-স্থান ঘুরিলাম। অবশেষে কলিকাতায় নমিতাদির বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। অজয় বাবু আমাদের আশ্রমের অবস্থা পূর্ব হইতেই শুনিয়াছিলেন, আমাকে দেখিয়া ভৎ সনা করিয়া বলিলেন "যেমন অযোগ্য লোকের হাতে কাজের ভার দিয়েছিলুম তেমনি ফল পেয়েছি।" আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তুমি যে এমন একটা মেরুদণ্ডহীন অপদার্থ তাহা জানিতাম না, জানিলে এতগুলি টাকা বরবাদ হইত না।" এই বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। নমিতাদি একটু পরে আসিয়া হাজির হইল—দু একটা কথার পর নমিতাদি বলিল—"আর যে আশ্রম গড়া যাবে তা মনে হয় না। এখন আপনি দিন কতক বাড়ীতে থাকুনগে—দেখি বাবাকে বুঝিয়ে কিছু ক'রতে পারি কিনা ?" নমিতাদি এই কয়টী কথা বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। আমাদের থাকিতে বলিল না বা অন্য কোন কথাও বলিল না। বুঝিলাম রাজনৈতিক ব্যবসায়ে অজয় বাবুর লোকসান হইয়াছে। তাই তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

২০

গোবর্দ্ধন ও আমি মদনপুরে ছটুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ছটু খুশীতে ভরিয়া গেল। অভিমান করিয়া বলিল—আচ্ছা মানুষ তোমরা ! এতবড় একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল ত একটা খবর নাই। শেষে তোমার

ভগ্নীপতি সিউড়ী যেয়ে সব জেনে এল। তবে বাঁচলুম। এখন মায়ের কথা সত্যি হ'ল ত? ঐ "বেণীর বৌকে নিয়েই তোমাদিকে একদিন ভুগতে হবে। কিন্তু এমন ভোগান্তি কেউ ভাবি নাই বাবা। আহা ছুঁড়ির কপালে এই ছিল শেষে।" এই বলিয়া ছটু বেণীর বৌয়ের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল।

একটু পরেই নৃপেনে বাবু আসিয়া হাজির হইয়া আমাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তারপর খুশী হইয়া বলিল—খুব ভাবিয়ে তুলেছিলে কিন্তু। কোথায় যে ফেরার হ'লে তা বোঝার জো নাই। এদিকে তোমার বোনের কান্নায় ঘরে টেকা দায়। আচ্ছা স্বদেশী আরম্ভ ক'রেছ যা হোক। যাও ও সব ছেঁড়া কাজ ছেড়ে দিয়ে এবার বিয়ে থাওয়া ক'রে সংসারী হও।

নৃপেনের কথায় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম—স্বদেশী করা ছেঁড়া কাজ হল?

নৃপেন বলিল—ভাল আপদ, স্বদেশী ছেঁড়া করা কাজ হবে কেন? ঐযেগাঁ সেবা লোক সেবা ব'লছ ঐগুলো।

নৃপেনের সহিত আর তর্ক করিবার ইচ্ছা হইল না, বিশেষ করিয়া এইরূপ সাংঘাতিক পরাজয়ের পরে।

পরের দিন হরিশপুরে গোবর্দ্ধনকে পাঠাইয়া দিলাম, সেখানকার সংবাদ আনিতে।

ছটু এখন সেই ছোট্ট টী নাই। ছেলে মেয়েতে তার সংসার ভর্তি। ছটুর একটী ছোট্ট ছেলে নাম গোপাল। বছর চার বয়স। অল্পক্ষনের মধ্যেই তাহার সহিত আমার ভাব হইয়া গেল। সে আমাকে বলিল—মামা চারটি পয়সা দাও আমাকে, ঘোড়া কিনতে হবে।

আমি বলিলাম—গোপাল চার পয়সায় ঘোড়া ত দূরেরর কথা ঘোড়ার চাবুক হবে না যে—

ঘোড়ার দর সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার অভাব দেখিয়া—গোপাল বলিল—তুমি কিচ্ছু জান না মামা। চার পয়সায় চারটে ঘোড়া পাওয়া যায়।

ছটুর মেয়ে অনুপমা ডাক নাম অনু, বছর আষ্টেক বয়স, ঠিক যেন সে দ্বিতীয় ছোট্ট ছটু—গোপালের দিকে চাহিয়া বলিল—বোকা ছেলে—বল না মাটির ছোট ছোট ঘোড়া কুমোর বাড়ীতে পাওয়া যায়।

গোপাল অনুর কথায় চটিয়া বলিল—মাটির—হবে কেন? তুই ভারী জানিস্?

অনু গোপালের কথায় চটিয়া গেল—পাজী ছেলে কোথাকার দিদিকে তুই তোকারী কী? গোপাল সংশোধন করিয়া বলিল—তুমি ভারি জানিস মাটির ঘোড়া? তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ও যে চ'লতে পারে মামা—

অনু বলিল—ছাই চ'লতে পারে?

গোপাল বলিল—তোমার কাছে চ'লবে কেন? তোমার ঘোড়া যে তোমার কাছে চলবে? আমার ঘোড়া আমার কাছে চলে।

ছাই চলে—বলিয়া অনু গোপালের কথার জবাব দিল। গোপাল ছটুর কথায় আর কর্ণপাত না করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মামা ঘোড়া চলেনা? আমি গোপালকে কোলে তুলিয়া বলিলাম—অনুর মিছে কথা, ঘোড়া শুধু চলেনা, দৌড়য়।

গোপাল খুশী হইয়া অনুর দিকে চাহিয়া রহিল কিন্তু কোন কথা বলিল না, যেন অনুর মত অর্বাচীন মেয়ের সহিত গোপাল কথা বলিতে ইচ্ছা করে না। গোপাল তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল—আমার ঘোড়ার পা ভেঙ্গে গেছে কিনা তাই আবার কিনতে হবে, দাওনা মামা চারটে পয়সা—

অনু সক্রোধে বলিল,—নাম্ কোল্ থেকে অসভ্য ছেলে—পয়সা চাইতে লজ্জা করে না।

হাসিয়া অনুর দিকে চাহিলাম। অনু ঠিক ছটুর দ্বিতীয় সংস্করণ। গোপালের হাতে চারিটি পয়সা দিয়া বলিলাম—এদিকে আয় অনু শোন। অনু আমার নিকটে আসিল। আমি অনুর হাতে একটি টাকা দিতে গেলাম অনু কিছুতেই লইতে রাজী হইল না। বলিল—টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি কোথা পাবে, তুমি কী চাকরী কর?

বুঝিলাম এ অনুর কথা নহে ইহা অনুর মায়ের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। আমি হাসিয়া বলিলাম—তা কী আর করব এবার অনু মায়ের জন্য না হয় চাকরি করা যাবে।

অনু ঘড়ে নাড়িয়া বলিল—তুমি ক'রবে চাকরি! তা হ'লে এত দুঃখু আমাদের। মা বলে—"এমন দাদা যে দুদিন হাড় জুড়িয়ে বাপের বাড়ীতে থাকার উপায় নাই—যেন লক্ষ্মীছাড়ার ঘর। চাকরি করা নাই খালি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান—"

অনুপমার কথায় হাসি পাইল। তাহার মায়ের সমালোচনা হুবহু তুলিয়া আমাকে শোনাইতেছে—

আমি বলিলাল—তা চাকরি না করি আমার অনেক টাকা আছে অনু, একটাকা দিলে আমার ক'মে যাবে না। অনুর দিকে চাহিয়া বুঝিলাম—অনুর টাকাটীর উপর লোভ আছে তাই জোর করিয়া হাতে গুঁজিয়া দিলাম—

অনু আবার আপত্তি করিয়া বলিল—টাকা দিচ্ছ কেন আমার ঢের টাকা আছে;

তা ঢের থাক অনু, না হয় আর একটা বাড়বে—অনু আমার কথার খুশী হইয়া বলিল—ঢের না ছাই আছে। মা কি টাকা জমাতে

দেয় ? বাবা আমাকে কতো টাকা দেয়, আর মা সব ধার নিয়ে নেয়। শোধবার নামটি নাই, চাইতে গেলে—বলে পোড়ার মুখি নে টাকা নে—এই ব'লে খুন্তি নিয়ে মারতে আসে—

অনুর দুঃখের কথা শুনিয়া বলিলাম—তোমার মায়ের কাছে রাখ কেন ?

অনু বলিল—মায়ের কাছে রাখি বুঝি—যেখানেই রাখি মা খুঁজে খুঁজে বার করবেই।

অনুর কথায় চোখে জল আসিল। অনুর মায়ের এই অনুসন্ধান প্রিয়তা একটি অসচ্ছল মধ্যবিত্ত সংসারের চিত্র ফুটিয়া উঠিল। নৃপেন বাবু স্কুল মাষ্টারী করে। চার পাঁচটী ছেলে মেয়ে আর একটী ছোট ভাই লইয়া তাহার সংসার। ভাই বেশী লেখাপড়া শেখে নাই। সম্প্রতি সে তবলা শিখিতেছে। নৃপেন বাবু নিজেই তাহার এই বাদ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। বেশ ছেলে—একটী যেন দ্বিতীয় গোবরা। দুঃখের সংসারে অমনি দু'একটা মানুষ থাকিলে দুঃখের পরিবেশ অনেকটা হাল্‌কা হইয়া যায়। পাশের ঘরে ছটু ও তাহার দেবরের মধ্যে সরস কলহ হইতেছে। তাহাদের কথাও কানে ভাসিয়া আসিতেছে। জপেন বলিতেছে—জান বৌদি একতালা হ'ল তিন তাল আর এক ফাঁক—ইচ্ছে করলে তুমি সমেও ধর্তা করতে পার, আবার ফাঁকেও ধ'রতে পার। কিন্তু সমের বেলায় যেখানে সেখানে ছাড়লে হবে না—ঠিক সমেই ছাড়তে হবে।

ছটু বলিল—রাগিও না ঠাকুরপো—এখন আমার তালের গা প'ড়েছে। নিজের তাল সামলাতে পারি না।

জপেন বলিতেছে—এই ত হুঁস রেখে চলতে হবে, তাল সামলাতে না পারলে তাল ভঙ্গ হ'য়ে যাবে। ঠিক সমের মাথায় ধা—

ছটু উচ্চৈস্বরে বলিতেছে—তুমি যাবে ঠাকুরপো এখান থেকে—আমাকে রাঁধতে দেবে কি না—?

সব তালই রাখতে হয় বৌদি, রাঁধ বাড়, খাও দাও ফুর্তি কর। তবে না—

আমার ত তোমার মত অফুরন্ত সময় নাই যে ফুর্তি ক'রব। তোমার কী একবার চামড়া পিটুলেই হ'য়ে গেল—

চামড়া পিটুনো সোজা কথা না কি? দাদার মত মাষ্টার অমন গাঁয়ে গাঁয়ে গণ্ডা গণ্ডা ব'সে আছে—কই একটা নামকরা বাজিয়ে দেখাও দেখি সাতখান গাঁয়ের মধ্যে।

তাই লেখাপড়াটা ছেড়ে দিয়ে এখন দিনরাত্রি আমার কানঝালাপালা ক'রছ। এমন এক এক সময় মনে হয় যে দিই তবলাটা ছিঁড়ে।

তা আর ছিঁড়তে হয় না। অমনি চোদ্দ সিকে গাঁট থেকে বার করতে হবে।

ব'য়ে গেছে—দোব না পয়সা।

নাইবা দিলে—ভাগ্যে যদি বাজিয়ে হওয়া থাকে তবে বিনা তবলায় বাজিয়ে হওয়া যায়। রামপুরের গোপী কামার থালা বাজিয়ে কিরকম বড় বায়েন হ'য়েছে শুনেছ?

অত সব শোনার আমার সময় নাই।

তা থাকবে কেন—ভাল কথা শুনতে মন যাবে কেন? ঝগড়া করবার বেলায় তখন খুব মন।

ছটু হাসিয়া বলিতেছে—আমার অভাগ্যি—তাই তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে যাই। তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেই কী সুখ আছে।

জপেন বলিতেছে—বৌদি এবার তুমি চটে যাচ্ছ—কই আমার দিকে চেয়ে হাস দেখি একবার—

ছটুর আর কোন কথা শুনতে পাইলাম না। খুব সম্ভব ছটু হাসিয়া থাকিবে—

জপেন বলিতেছে—গদে ঘিনি ধা—গদে ঘিনি ধা—গদে ঘিনিধা—ঠিক এমনি সময়ে সমে চাঁটি মারতে হয় বৌদি—অর্থাৎ একটা তাল ঘুরে ফিরে যেমন আগের জায়গায় এল অমনি তাল বুঝে মার চাঁটি—এই যেমন আমাকে প্রথম দেখে হেসে ফেললে—তারপর ঘুরে ফিরে দুনে চৌদুনে তুমি তোমার কেরামত দেখালে—আর একটু হলে সম ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিলে—আমি অমনি ঠিক তালের মত সমটা যে কী দেখিয়ে দিলুম, নইলে সব মাটি হ'য়ে যাচ্ছিল—বাব্বা তাল ঠিক রাখা মেয়ে মানুষের সাধ্যি কী—আমরা পুরুষ মানুষ হিম সিম খেয়ে যাচ্ছি।

ছটুর ও তাহার দেবরের কথায় অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম—এখন দেখি গোপাল ও অনুর মধ্যে তাহাদের মুদ্রার মূল্য নিরূপণ লইয়া মতভেদ হইয়াছে—অনু বলিতেছে গোপাল তুই বোকা—। গোপাল কিন্তু তাহার সেই মতামতের কোন মূল্য দিতেছে না, কারণ সংখ্যায় যখন চারটি বস্তু তাহার নিকট দেখা যাইতেছে তখন একটি বস্তু কেমন করিয়া বেশী হইবে। অনু বলিতেছে—তোর ওগুলো পয়সা আর আমার এটা টাকা। হোলইবা তোর চারটে। গোপাল অনুর কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। সে দৃঢ়তার সহিত তাহার মতের উপর অবিচল আছে। অবশেষে অনু পরাস্ত হইয়া বলিল—মামা বোকাটাকে বুঝিয়ে দাও নয়ত আমাকে চারটে টাকা দাও। এই বলিয়া অনু আমার বুকে মুখ লুকাইয়া লজ্জায় পরাজয়ের গ্লানি ঢাকা দিল—অনুকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আরও তিনটি টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিলাম। আমার টাকা দেওয়া দেখিয়া গোপাল—বাঘের মত অনুর উপর লাফাইয়া পড়িয়া বলিল—আমার চেয়ে বেশী পয়সা নিবি তুই—. অনু খোকার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া

গেল। গোপাল—পয়সা চারটি ফেলিয়া রাখিয়া অনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া গেল। গোপালের পয়সা চারটি পকেটে কুড়াইয়া রাখিলাম। অনু পরে ঐ পয়সার কথা জিজ্ঞাসা করায় গোপাল বিজ্ঞের মত উত্তর দিয়াছিল —মামার কাছে রেখে দিয়েছি—তুমি যা চোর—।

এমন একটী মনোরম পরিবেশ না থাকিলে মানুষ ঘর বাঁধিতে পারিত না। ছুটুর সংসারে খুব অভাব না থাকিলেও বেশ সচ্ছল নহে বুঝিতে পারিলাম। ছুটুর অবস্থা লইয়া এতদিন মাথা ঘামাই নাই এখন সেজন্য মনে দুঃখ হইল কিন্তু কিই বা করিবার আছে। একটু পরেই ছুটু আসিয়া বলিল—আর টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়াতে হবে না—আমি ক'নে দেখেছি, বিয়ে করে তবে এখান হতে যাবে।

আমি বলিলাম—বেশ তো বিয়ে ক'রব—কিন্তু আমার বৌয়ের ভার নিতে হবে।

ছুটু হাসিয়া বলিল—ঢের হয়েছে—বিয়ে কোরে বৌ ছেড়ে ঢের লোক থাকে—

আমি বলিলাম—আমি থাকতে পারি—

ছুটু উত্তর করিল—আচ্ছা বিয়ের পর দেখা যাবে।

এমন সময় জপেন আসিয়া উপস্থিত হইল—খুব সম্ভব সে ছুটুর কথা দূর হইতে শুনিতে পাইয়া থাকিবে—তাই বলিল—বৌদি দাওনা তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের ওস্তাদের মেয়ের বিয়ে।

আমি বলিলাম—সে মেয়ে তোমার জন্য থাক্ জপেন।

জপেন একপ্রকার মুখ ভঙ্গী করিয়া উত্তর করিল—বাজিয়ে ছেলের সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দেয়? তা আমি যত বড় বাজিয়েই হই না কেন? এই দাদা, তোমার কথাই ধর না, বৌদি ত তোমার বিয়ের জন্য ঝুলোঝুলি ক'রছে, কিন্তু কটা ক'নের বাপ তোমার দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে

প'ড়ে আছে শুনি—স্বদেশী করার আগে যেমন সম্বন্ধ আসত, এখন তেমন আসছে —?

জপেনের কথার মধ্যে অনেকটা সত্য রহিয়াছে। ইস্কুলে পড়ার সময় হইতে কলেজে পড়া পর্যন্ত অনেক সম্বন্ধই আসিয়াছিল। জপেনের কথার সত্যতা মনে মনে স্বীকার করিলেও মুখে রহস্য করিয়া বলিলাম—আমি কী অপরাধ করলুম—আমি ত আর বাজিয়ে নই।

আরে ভাই বাজিয়ে নাই বা হ'লে—ঐ যে লাইন ছাড়া কাজ ধ'রেছ—আর কেউ বিয়ে দেয়! মেয়ের বাবারা যতই গরীব হোক না এ বিষয়ে তারা পাকা পাটোয়ার।

ছটু বলিল—তা চাকরি বাকরী না করলে লোকে বিয়ে দেবে কেন শুনি? তাদের মেয়েরও ত সুখ সয়াল আছে।

জপেন বলিল—তা নাই কে বললে—তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি জান না ভাই একটা পনের টাকার মাইনের পিয়াদাকে মেয়ে দেবে, তবু তোমার মত পাত্রকে দেবে না। তোমার যদি আত্মসম্মান থাকে তবে ও ফাঁদে পা বাড়িয়ো না। আমার কথা সত্যি কি না যাচাই ক'রে দেখতে পার।' যেমন কথাবার্তা হবে 'অমনি ব'লবে "চাকরি বাকরি করো না তা হলে বৌ পুষবে কী ক'রে।" এই সব শুনে আমার গা জ্বলে যায়—মনে হয় গালে মারি এক চড়, এই বলিয়া জপেন কন্যাকর্তার উদ্দেশ্যে চড় দেখাইল।

জপেনের কথায় বিবাহ করিবার শেষ ইচ্ছাও ত্যাগ করিলাম। আমাদের মত লাইনছাড়া লোকের ক'নে জোটা দায় তাহা বুঝিতে পারিলাম যদি বা জোটে তাহা সম্মানের সহিত জুটিবে না তাহাও বুঝিতে দেরী হইল না।

জপেনের কথায় ছটু চটিয়া গিয়া উচ্চৈস্বরে বলিল—তোমাকে অত

বক্তৃতা ক'রতে হবে না ঠাকুরপো—তোমার চেয়ে ঢের বিদ্যে দাদার পেটে আছে।

জপেন উপহাস করিয়া বলিল—বিদ্যে থাকলেই বুঝি লোক ভাল বোঝে—তা হ'লে দাদার এত দুঃখ। পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে যে বিয়ে করা চলে না, কই বিএ পাশ ক'রেও ত সে ভাল বোধ হয় নাই।

স্বামীর উপর কটাক্ষ করায় ছটু রাগিয়া বলিল—তাতে তোমার কী এসে গেল ঠাকুরপো—কোন দিন আর উপোস ক'রে আছ?

জপেন রাগিয়া বলিল—পেটে দুটো খেতে পেলেই বুঝি উপোস হয় না। এ শালা বাড়ীর এমন অবস্থা যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাজনাটা শিখব তার উপায় নাই।

সরস বিষয়টা ক্রমশঃ রসহীন হইয়া আসিতেছে। ছটু ঝঙ্কার দিয়া বলিল—কে তোমাকে পয়সা রোজগার করবার জন্যে মাথায় বাড়ী মারছে শুনি?

জপেন হাসিয়া বলিল—বৌদি ভারি চ'টেছ দেখছি—আমিও চ'টে যাচ্ছি তোমার বেতালা কথা শুনে—বাড়ী আবার মারতে হয় নাকি?· যারই তাল বোধ আছে সেই সমের মাথায় বুঝতে পারে এই প'ড়ল বাড়ী—

গুরুতর ব্যাপারটা হাল্কা হইয়া গেল—ছটু ছুটিয়া জপেনের মাথায় চাঁটি দিয়া বলিল—ফের আমার সঙ্গে সম সম করবে ত খুন্তিপেটা ক'রে সম বুঝিয়ে দেব—আমিও বাবা কম মেয়ে নয়। জপেন হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পালাইল।

আমি ছটুকে বলিলাম—তোর যে এমন অভাব তাত কোন দিন বলিস নি, আমার সম্পত্তি ত ভূতে খাচ্ছে।

ছটু বলিল—অভাব আবার কোথায় দেখলে—চলে যায় এক রকম মন্দ নয়, তবে সংসার ত বাড়ছে।

আমি বলিলাম—বেশ ত নাইবা অভাব হ'ল—আমার যা আছে একবার ক'রে যেয়ে বুঝে স্থঝে নিয়ে আয় না।

ছটুর মুখ দেখিয়া বুঝিলাম—তাহার অভিমান হইয়াছে। সে মুখ ভার করিয়া বলিল—আমার অভাব ঘুচুতে হবে না, একটা খবর ত নিতে পার মাঝে মাঝে—ছেলেগুলো মামা বলতে অজ্ঞান। খোকার মুখে লেগেই আছে—"আমি মামার মত হব।" তা শুনে তোমার জামাইবাবু বলেন—"কী মস্ত বড় মামা—যে আপন বোনের খবর রাখে না সে আবার দেশের খবর রাখবে—ঐ একটা স্বদেশী বাই মাথায় ঢুকেছে তাই নিয়ে হই হই ক'রে বেড়াচ্ছে।" এই শুনে আমার কী যে দুঃখ হয় তার কী তোমাকে ব'লব।

ছটুর কথায় চুপ করিয়া রহিলাম কী আর জবাব দিব—নৃপেনবাবু সত্যই ব'লিয়ছে, আমরা স্বদেশী বায়ুগ্রস্ত জীব মাত্র, বিশেষ করিয়া আমি ঘরের পরের কাহারও খবর রাখি না।

গোবর্দ্ধন দিন দুই পরে হরিশপুর হইতে ফিরিয়া আসিল। গোবর্দ্ধনের মুখে সংবাদ পাইলাম আমাদের আশ্রমটীতে খোকার আড্ডা হইয়াছে এবং রীতিমত বন্ধুবান্ধব লইয়া মদ চোলাই করিতেছে ও পানাহার চলিতেছে এবং আমাব নামে বাকী খাজনার নালিশ করিয়া ইতি মধ্যেই জমিগুলি নিলামে উঠাইয়া খাস করা হইয়াছে। মধুসূদন ভট্টাচার্য নাকি বলিয়াছে, যদি আমি টাকা শোধ করিয়া এবং সেলামী দিয়া জমি রাখিতে ইচ্ছা করি তবে বামুনের ছেলেকে সে উদ্বাস্তু করিতে নারাজ। আশ্রমটীকে একটী মদ চোলাইয়ের আড্ডা করিয়াছে শুনিয়া ক্রোধে আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। গোবর্দ্ধনকে বলিলাম—চল্ কালই যাচ্ছি—কত বড় শয়তান ওরা দেখতে হবে।

রাত্রে আহার করিতে বসিয়াছি—নৃপেনবাবুকে সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া

বলিলাম—অধিকাংশ কথাই ইংরাজীতে হইল। নৃপেনবাবু বলিল—না এ অন্যায় সহ্য করা ঠিক নয়—তুমি যাও অন্ততঃ ঐ পবিত্র প্রতিষ্ঠানটাকে রক্ষা করগে। এ অন্যায় বরদাস্ত করলে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

ছটু আমাদের কথাবার্তা বুঝিতে না পারিলেও কিছু একটা গোলমেলে কথা সে তাহা সহজেই আন্দাজ করিয়াছিল—তাই ছটু শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল ইংরেজী ছেড়ে বাংলায় বল দেখি কী হয়েছে শুনি ?

গোবর্দ্ধন বলিল—কিছু না, ভয় পাবার কিছু নাই। তবে হ্যাঁ একটু ডেঞ্জারাস্ ব'লতে হবে।

ছটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—ডেঞ্জারাস মেঞ্জারাস বুঝি না, কী হয়েছে স্পষ্ট ক'রে বল।

গোবর্দ্ধন হাসিয়া জবাব দিল—ডেঞ্জারাস মানে জান না ব্রাদার, হরিশপুরে তোমার বাড়ী—ডেঞ্জারাস মানে—খোকার বাবা।

পরের দিন হরিশপুরে পৌঁছিয়াই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। খোকা সেখানেই ছিল। খোকার সহিত বহুদিন পরে দেখা। কেন জানি না খোকা সকল সময়েই আমাদিগকে এড়াইয়া চলিত। খোকাকে দেখিয়া পূর্বের ছেলেবেলার কথা মনে পড়িয়া গেল। সেজন্য উত্তেজনা অনেকখানি কমিয়া গেল—কোন প্রকারে ক্রোধ দমন করিয়া বলিলাম—ছিঃ কল্যাণ আমার আশ্রমে তোমার আড্ডা জমান ঠিক হয় নাই। খোকা আমার কথা শুনিয়া একটু যেন লজ্জিত হইল। আমি বলিলাম—আশা করি তুমি আজই এটা ছেড়ে দিচ্ছ।

খোকা বলিল—কী চোখ রাঙিয়ে কেড়ে নিতে চাও ?

আমি দৃঢ় অথচ সংযত স্বরে বলিলাম—না তা চাই না তবে ওটা তুমি এমনিই ছেড়ে দেবে বিশ্বাস করি। কারণ এটা আমার প্রতি

রক্তবিন্দু দিয়ে গড়া, ওটা যদি না পাই তবে শেষ রক্তবিন্দু এইখানে ঢেলে দেব।

খোকা আমার কথায় ভয় পাইয়া গেল, তারপর বলিল—কেউ নেই এখন তাই আমরা আছি—ঘরটা খালি .পড়ে থাকলে পাঁচ ভূতে নষ্ট ক'রে দিত, যাক্ সামান্য নোংরা হয়ে আছে বিকেলে পরিষ্কার ক'রে দেব। কাল তখন এস।

পরদিন আমি ও গোবর্দ্ধন আশ্রমে উপস্থিত হইলাম—খোকা যে এত সহজে আশ্রম ছাড়িয়া দিবে তাহা মোটেই ভাবি নাই। পরে শুনিয়াছিলাম খোকার বাবা আশ্রম দখলের বিপক্ষে ছিল কারণ তাহা হইলে বেণীর বৌয়ের সম্পত্তি দখলে বাধা পড়িতে পারে।

২১

মধুসূদন ভট্টাচার্যের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতে অধিক ভালর দিকে চলিয়াছে। গ্রামে যাহারা দরিদ্র ছিল, তাহারা নিঃস্ব হইয়াছে। যাহারা দুই পাঁচ বিঘা জমি লইয়া হাল বাঁধিয়া চাষ করিয়া সংসার প্রতিপালন করিত, তাহারা এখন ভট্টাচার্য মহাশয়ের খেতের দিন মজুর। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কোন না কোন প্রকারে ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে ঋণগ্রস্ত। কাহারও সাধ্য নাই যে ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সেদিনের সেই ঋণভার জর্জরিত মধুসূদন ভট্টাচার্য কেমন বুদ্ধিবলে সমস্ত গ্রামকে গ্রাস করিয়াছে। আজ আর সে অধমর্ণ নহে এখন সে উত্তমর্ণ। ভট্টাচার্য মহাশয় সগৌরবে বিনয়ের সহিত প্রচার করে—"ধর্মপথে চ'ললে ভগবান আড়িতে করে মেপে ধন দিয়ে যায়।" ভট্ট্যাচার্য মহাশয় তথাকথিত ধর্ম পালন নিশ্চয় করেন কারণ আমরা অর্বাচীন কয়েকজন ছাড়া কেহই তাহার নিন্দা করে না। বাকি-করে জমি ল'ওয়া বা টাকা ধার দিয়া সুদ লওয়া এমন কিছু অন্যায় নয়। বরং ভট্টাচার্য মহাশয়ের মত লোক

দেশে হয় না। কারণ টাকা ধার দিয়া তাগাদা করে না বা খাজনার জন্য জুলুম নাই। এক কথায় তিনি প্রজানুরঞ্জক রামচন্দ্রের মত।

অমলের ফাঁসী হইয়া গেল—অনিন্দিতা অকালে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অর্দ্ধ সমাপ্ত অভিশপ্ত কর্ম্মের বোঝা লইয়া গোবর্দ্ধন ও আমি আবার যাত্রা শুরু করিলাম। আর পূর্ব্বের মত আশ্রম গড়িলাম না। নমিতাদির টাকা পয়সা ফিরাইয়া দিয়া পত্র লিখিলাম—"পুনরায় আশ্রম গড়ার মত শক্তি আর আমাদের নাই। তবে দেশ যতদিন স্বাধীন না হয় কোনরূপে দেশের সেবায় লাগিয়া থাকিব।" নমিতাদির উত্তর আসিল—

মনীবাবু আপনার টাকা ফেরৎ দেওয়ায় বড় দুঃখু পেলুম। নাইবা টাকা কয়টা ফেরত দিতেন—আপনার দরকার মত খরচ ক'রতেন। বহু দুঃখের মধ্যে আমিও বুঝতে পারছি ভাঙ্গার সময় গড়ার কাজ সার্থক লাভ করে না। তবে যদি গড়ার কাজ ক'রতেই হয় তবে সেটা একদিন ভাঙবে, এটা জেনেই করা উচিৎ। বাবা এই সহজ কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। যাক্ দরকার হ'লে জানাবেন। ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষীণী—আপনার নমিতাদি।

স্বাধীনতা আন্দোলন থামিয়া গিয়াছে। যাহারা দেশের কাজে নামিয়াছিল তাহাদের অনেকেই আবার গৃহে ফিরিয়া গিয়া নিজেদের সংসারে মন দিয়াছে, যাহারা সেরূপ করে নাই তাহারা কোনমতে কংগ্রেস অফিসগুলি আঁকাড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। নূতন কোন লোক আর কংগ্রেসে যোগ দিতেছে না বরং পুরাতন লোকেরা চলিয়া যাইতেছে। গান্ধীজী অবশ্য অনেক কাজই করিতে বলিয়াছেন বা তিনি নিজে হাতে কলমে করিয়া দেখাইতেছেন কিন্তু কংগ্রেসের অধিকাংশ লোকই সেই কাজে বেশ মন দিতেছে না। অনেকেরই ধারণা সূতা কাটিয়া স্বরাজ আসিবে না। আমাদের মত যাহারা আশ্রম তৈয়ারী করিয়াছে

তাহারা আর কিছু না হোক হাতের কাছে যা হোক একটা কাজ পাইয়া নিজেদের রাজনৈতিক সত্বা বজায় রাখিয়াছে।

আমরা আর আশ্রমটী না গড়িয়া ঐ খানেই আমাদের কয়েকজনের আড্ডা করিলাম। আমি কখনও জেলায় কখনও মহকুমায় যাতায়াত করিয়া কোনরূপ কংগ্রেসকর্মীদের সহিত যোগাযোগ বজায় রাখি। এ ছাড়া আর কোন কাজ খুঁজিয়া পাইলাম না। গোবর্দ্ধনের কিছুই অসুবিধা নাই। সে দিব্য আগের মতই বাগ্দি পাড়ায় অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দেয় কোন এক সময় আসিয়া রান্নাবাড়া করে। আমাদের খাওয়ায়, নিজেও খায়। মুস্কিল হইল—আমরা অল্পসংখ্যক লোক হইলেও আমাদের ব্যয় চালান লইয়া। গ্রামে গ্রামে আর তেমন চাঁদা আদায় হয় না। আশ্রমের সঙ্গে একটা যে বেদনাদায়ক করুণ স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে খোকার বাবার প্রচার কৌশলে তাহার অনেকখানি দায়িত্ব আমার ঘাড়ে দেশের লোক চাপাইয়া আমার সেবা কাজকে বাধাগ্রস্ত করিতেছে। ক্রমশঃ বেশ একটা বিরুদ্ধ শক্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে।

আমাদের জমীদার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল লোকদের নায়ক। সে তাহার অর্থবল, লোকবল এবং ইংরাজ সরকারের শক্তি লইয়া আমাদের আঘাত হানিতেছে। তাহার আঘাতে আমরা পর্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার সম্পত্তির আধখানা নীলাম করিয়া লইয়া নিজের কুক্ষীগত করিয়াছে। আমাদিগকে যাহারা সাহায্য করে তাহাদিগকে কোন না কোন প্রকার জব্দ করা হইতেছে। রায় বাহাদুর মধুসূদন ভট্টাচার্যের ভয়ে আমাদের বন্ধুরা আর প্রকাশ্যে সাহায্য করে না। অমলের জন্য আমাদের নিন্দা সহ্য করিতে হইতেছিল সত্য কিন্তু অপর দিকে দুচারজন লোকে এ কথাও বলিতেছিল ইহারা গ্রামের অনেক কিছু উন্নতিও করিয়াছে।

আমাদের এই প্রশংসায় জমীদারের মনে শান্তি ছিল না। এইটুকু

কী করিয়া বন্ধ করা যায় তাহার এক অভিনব ফন্দী বাহির করিল। তিনু চাটুয্যে প্রচার করিল—হ্যাঁ গাঁয়ে চ্যাংড়া ছোঁড়ারা ক'রবে ইস্কুল। আজ ইস্কুল হচ্ছে, কাল ভাঙছে। পুলিশে ও ইস্কুল টিকতে দেবে কেন? তারা ত জানে ওটা ইস্কুলই নয়, গুণ্ডার আড্ডা। কই এই ইস্কুলে পড়া ছেলেদের চাকরী হ'ক দেখি? তাই মালিক ব'লছেন "ইস্কুল একটা আমাকে গাঁয়ে ক'রতে হবে।" হ্যাঁ, ওরা ক'রবে গাঁয়ের উপকার। মালিক ব'লছিল—"আরে দেখুক না দিন কতক চেষ্টা ক'রে—আমার ত সব মুরোদ জানতে বাকী নাই—মুষ্টিভিক্ষে তুলে আর বিনা মাইনের মাষ্টারে ইস্কুল হয়? আমি অনেক আগেই ইস্কুল ক'রে দিতুম তিনু, কিন্তু গাঁয়ের লোক যা বজ্জাত কেবল ঐ ছোঁড়াগুলোকে যেন কেষ্ট বিষ্টু ম'নে ক'রেছে। বলে ইংরেজ তাড়াবে। নিজেরাই এখন ঘর ঢুকে বসে আছে।"

কয়েকদিন পরেই ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া রায়বাহাদুর মধুসূদন ইন্‌সটিট্যু-সনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবশ্য ইস্কুল গড়িবার জন্য মুষ্টিভিক্ষা করিতে বাহির হন নাই। তিন বৎসরের জন্য তিনি ইস্কুল ট্যাক্স বলিয়া প্রজাদের খাজনা শতকরা পঁচিশ ভাগ বাড়াইয়া দিলেন। এবং ইস্কুলের ব্যয় নির্বাহের জন্য চিরদিনের জন্য টাকাপ্রতি দুই পয়সা ইস্কুল ট্যাক্স বসিল।

আমরা জমীদারের এই কাজের জন্য প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। ইস্কুল হইবে জমীদারের নামে, আর প্রজারা করিবে ব্যয় বহন। আমাদের এই প্রতিবাদে তিনু চাটুয্যে বলিল—শুনলে ত এরা কী ইস্কুল চায়। ভাল কাজ এরা চায় না। এখন দেখছে গুণ্ডার আড্ডায় আর লোক যাবে না তাই জমীদারের পেছুতে লেগেছে। আরে জমীদার কত মহাশয় লোক বল দেখি—তার কী পাঁচটা ছেলে পুলে আছে যে ইস্কুলে প'ড়বে—কেবল গাঁয়ের লোকের ছেলেদের উপকারের জন্যই ত!

ইস্কুল তৈয়ারী হইয়া গেল। সাধারণের সেবা করার যেটুক সুনাম আমাদের ছিল সেটুকুতেও জমীদার নজর দিলেন। জলকষ্ট দূর করিবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ড এবং জেলা বোর্ডের টাকায় কুয়া ও টিউবওয়েল বসান হইল। ইউনিয়ন বোর্ডের পয়সায় এবং গ্রামের বাগ্দিদের বেগারে গ্রামের রাস্তা ঘাট সংস্কার করা হইল। এই সকল কাজ জমীদারের চেষ্টাতেই হইল। গ্রামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল—সকলে বলিল—এমন জমীদার আর হয় না। জমীদার ভট্টাচার্য মহাশয় এই প্রশংসা শুনিয়া বলিল—বুঝলে হে তিনু, এতদিন এসব কাজে হাত দিই নি কেন—দেখছিলুম ছেলেরা কতদূর কী করে।

তিনু হাসিয়া উত্তর দিল—ওদের ভারি মুরোদ বাবু, তাই ওরা ক'রবে এসব কাজ। সাতখানা গাঁয়ে চাঁদা তুলে ছুটো মেটে ঘর ক'রে বলে ইস্কুল ক'রেছি। এই যে আপনি ইমারত ক'রে দিলেন ওরা ত কোন ছার—ওদের গান্ধী পারবে ?

জমীদার খুশী হইয়া বলিলেন—বুঝলে তিনু—ছেলেটা মানুষ হ'ল না—নইলে এসব কাজ আমাকে ক'রতে হয় ? ও জমীদারীর কাজ দেখত আর আমি এই সব পাঁচজনার কিসে ভাল হয়, তা নিয়ে থাকতুম। —হ্যাঁ, অদৃষ্টে নাই, একা আর কদিক সামলাই। হ্যাঁ হে, হরি মোড়লের পুকুরটার কী হ'ল—কই ও তা আর সেদিনের পর কোন উচ্চ-বাচ্য ক'রছে না।

তিনু উত্তর করিল—হরি মোড়ল পুকুরটা দেবে ব'লে মনে হয় না। ব'লছে "জমীদার যদি স্নানের জলের পুকুর কাটিয়ে গাঁয়ের উপকার ক'রতে চায়, তবে এমনি দিক না কেটে, তার নামে পুকুর লিখে দিতে যাব কেন?" অনেক বোঝালুম বাবু-যে তুমি যখন টাকা দিয়ে কাটাতে পারবে না তখন জমীদার যে টাকাটা খরচ ক'রবে তার জ একটা কিছু জামীন চাই।

জমীদার ক'রবে টাকা খরচ মধ্যে থেকে মোড়ল তোমার হ'য়ে যাবে পুকুর কাটা, সুদ নাই ব্যজ নাই বছর বছর টাকা দিয়ে দশ কিস্তিতে শোধ হ'য়ে যাবে! তোমারও গায়ে লাগবে না অথচ তোমাদের পাড়ার লোক চান ক'রে বাঁচবে"—তা বাবু সেই এক গোঁ কিছুতেই রাজী হচ্ছে না।

জমীদার চুপি চুপি প্রশ্ন করিল—আচ্ছা এ ব্যাপারে আশ্রমের ছেলেরা আছে বলে সন্দেহ হয়?

তিনকড়ি অনুচ্চ কণ্ঠে উত্তর করিল—আছে ব'লে আছে—এতে আবার সন্দেহ ওরা ব'লছে "জমীদার যাকেই টাকা ধার দিয়েছে তারই বিষয় সম্পত্তি জমীদারের ঘর ঢুকেছে—মোড়ল তুমি যেন ও ফাঁদে পা দিও না। ওপাড়ার গিরীশ এই যে জমীদারের টাকা নিয়ে পুকুর কাটালে ও পুকুর কী আর ফিরে দেবে ভাবছ মোড়ল?"

জমীদার একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—টাকা শুধলে ফিরে দেব না কেন শুনি, তবে যদি টাকাই না শুধতে পারে তা হ'লে আমি কী ক'রব! তারপর আর একটু অনুচ্চ কণ্ঠে তিনকড়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইস্কুল ট্যাক্স হ'তে আদায়ী টাকায় কিছু ঘর ঢুকবে না সবটাই খরচ হ'য়ে যাবে।

তিনকড়ি বলিল—সে কী বাবু!—তা ঢুকবে বই কী—তা আদায় ত নেহাত কম হবে না। আর দু'পয়সা ক'রে যে ট্যাক্স ধরা হ'য়েছে ওর থেকে ত ইস্কুলে এক পয়সা দিতেই হবে না।

ভট্টাচার্য মহাশয় আনন্দের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন দিতে হবে না তিনু—?

তিনু সহাস্যে উত্তর করিল—সরকারী সাহায্যের টাকা আর ছেলেদের বেতন এতেই সব কুলিয়ে যাচ্ছে। আর ছেলেদের বছর

সাল একটা বিল্ডিং ফি ক'রেছি পাঁচ টাকা ক'রে তাতে হাজার টাকা আদায় হবে, সেই টাকা আর গাঁয়ে বিয়ে শ্রাদ্ধ হ'লে কম ক'রে দশ টাকা কোরে আদায় করলে কোন না আর পাঁচশো টাকা হবে। এতেই ঘরের চুণকাম, মেরামত সব হয়ে যাবে। শুনছি ঘর মেরামত ক'রতেও সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়।

ভট্টাচার্য মহাশয় খুশী হইয়া বলিলেন—দেখ তিনু ইস্কুলটার পাকা বন্দোবস্ত করে যেতে হবে, আমার অবর্তমানেও যেন ঠিক মত চলে।

তিনু উত্তর করিল—কিছু ভাবতে হবে না—যিনি চালাবার তিনিই চালাবেন। এই যে আমাদের কী ছিল—কী হ'ল, এসব তারই ইচ্ছে ত? হরিহে তুমিই চালাবার মালিক।

এই সকল গোপন কথা জমীদারের খাস চাকর গোবিন্দর নিকট হইতে গোবর্দ্ধন সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাকে বলিত।

আমরা জমীদারের এই সকল পরামর্শ শুনিয়া খেদে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িতাম, কিন্তু কী করিব উপায় কিছু নাই, গ্রামের অধিকাংশ লোকই এখন জমীদারের দিকে।

গোবর্দ্ধন প্রায়ই বলিত "এ ব্যাটাকে আর পারা যাবে না।" আমি পূর্বে গোবর্দ্ধনের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু পরে উপলব্ধি করিতে পারিলাম সত্যই ইহাকে পারা অত্যন্ত দুরূহ।

আমাদের তখন প্রায় সকল কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। আমরা লোকের সহানুভূতি হারাইয়াছি। যাহারা আমাদের শ্রদ্ধা করে তাহারা এখন আমাদের করুণার সহিত শ্রদ্ধা করে। যাহারা শ্রদ্ধা করে না তাহারা আমাদের ব্যর্থতায় উপহাস করে। তাহারা বলে—এইত স্বরাজও হল না আর মাঝের থেকে তোমাদের হল দুর্ভোগ। আরে স্বরাজ কী আর মুখের কথা যে হয়ে যাবে। বলে—অহিংসায় স্বরাজ আসবে—পাগল

ছাড়া এ কথা কেউ বলে ? এই ত বাবু কী হ'ল দেখলে ত—ফুটুফাট ধর যদি কিছু হয়, না পার ও সব বুজরুকী ছাড়। গোবর্দ্ধন এই সব কথায় অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। স্বরাজ কী উপায়ে অর্জন করা যাইতে পারে, গোবর্দ্ধন ঐ সকল রাজনৈতিক মারপ্যাচের খবর রাখে না বা প্রয়োজনও মনে করে না। আমার উপদেশে সে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়াছে, আমাকে সে ভালবাসে—তাই তাহার এই দুর্ভোগ, একথা সে মধ্যে মধ্যে আমাকে শুনাইতে ছাড়িত না। আমি অবশ্য রাগ করিতাম না—কারণ রাগ করিবার কিছুই ছিল না।

দীর্ঘদিন এইরূপ এক ঘেয়ে জীবন কাটান দুঃসহ হইয়া উঠিল—কিন্তু কী করা যায় কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না। গোবর্দ্ধনের অবশ্য কোন অসুবিধা নাই। রাজনীতি ছাড়াও তাহার বহু কাজ আছে। আমাকে লোকের প্রয়োজন না থাক্ গোবর্দ্ধনকে কোন না কোন কাজে গ্রামের লোকের প্রয়োজন থাকে। হঠাৎ প্রয়োজন হইলে দুই মাইল দূর হইতে ডাক্তার ডাকিয়া আনা বা পাঁচ মাইল দূরে কাহারও সংবাদ আনিয়া দেওয়া এই সব কাজ করিতে গোবর্দ্ধনের মত পটু কেহ ছিল না। তাছাড়া এই সব কাজের জন্য কোন পয়সা লাগিত না সেই জন্য গ্রামের লোকে তাহাকে দিয়াই এই সব কাজ বেশী করিয়া করাইয়া লইত। এইরূপে গোবর্দ্ধনের বেশ সময় কাটিয়া যাইত।

২২

বেকার জীবন মানুষের দুঃসহ জীবন। জীবনের ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ। আশ্রমের কাজ নাই, দেশের কাজ নাই, ঘর-সংসার কিছুই নাই যে, যাহা হোক দেখা-শোনা করিব। জমী জায়গা যাহা ছিল তাহার প্রায় অর্দ্ধেক জমীদার দখল করিয়া লইয়াছে। বাকী অর্দ্ধেক চাষীরাই দেখা-শোনা করে। তাহারাই তাহাদের গৃহে ফসল উঠায়।

যাহা আয় হয় তাহারা বিক্রয় করিয়া আমাকে বছরের শেষে দিয়া দেয়। আমি নেতা হইয়া পড়িয়াছি—গ্রামের লোক আমাকে ছোট খাট কাজে ডাকে না। আগে জটীল এবং গুরুতর কাজে পরামর্শ লইত এখন তাহারা মধুসূদন ভট্টাচার্যের নিকট যায়। অতএব গ্রামের লোকের সহিত আমার যেটুক যোগাযোগ অবশিষ্ট ছিল সেটুকুও লোপ পাইল। আমার এতদিনের সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল আমি পাগল হইবার জো হইলাম। মনে হইল এই ভাবে থাকিলে আমি পাগল হইয়া যাইব। কিছু একটা করিতে হইবে—যাহা হোক কিছু করা চাই। এমনি করিয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর পার হইয়া যাইতেছে কিন্তু কী করা যাইতে পারে তাহার কোনই হদিস খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি হতাশার শেষ সীমায় আসিয়া পড়িলাম।

একদিন গোবর্দ্ধনকে বলিলাম—চল্‌না দিনকতক গোবিন্দপুর আশ্রমে কাটিয়ে আসা যাক্‌। এই আশ্রমটীও আমাদের সাহায্যে সেখানের স্থানীয় ছেলেরা গড়িয়া তুলিয়া ছিল।

গোবর্দ্ধন বলিল—যাবি ত চ, তবে সেখানেও এই অবস্থা। আশ্রম কী আর আছে? তবে ভবানীবাবুর ওখানে আড্ডা দেওয়া যাবে দিনকতক। বেশ খাওয়া দাওয়া যাবে। না খেতে পেয়ে মুখে ঘাস গজিয়ে গেল।

গোবিন্দপুরের ভবানী মুখোপাধ্যায় সরকারি চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। ভদ্রলোক আমার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও যেহেতু আমি তাঁহার চেয়ে আগে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলাম এবং লেখাপড়া কিছু বেশী জানিতাম তাই আমাকে তিনি বরাবর সম্মান করিয়া আসিয়াছেন। আমার নেতৃত্বেই তিনি চলিতেন।

গোবর্দ্ধনের কথায় উৎসাহ বোধ করিলাম। গোবর্দ্ধন বেশ বলিয়াছে

দুঃসময়ে তাহার চমৎকার বুদ্ধি জোগাইয়া থাকে। পরদিন প্রাতে গোবিন্দপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মাত্র পাঁচ মাইল পথ, আমরা ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই গোবিন্দপুর পৌঁছিয়া গেলাম।

ভবানী বাবুর বাড়ীর প্রাঙ্গনে পৌঁছিয়া মনে হইল কেমন যেন একটা বিষাদময় পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের পদশব্দে ভবানী বাবুর স্ত্রী বাহিরে আসিয়া আমাদের দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিয়া কেমন যেন বিমূঢ় হইয়া গেলাম। এমন নিরাভরণ জ্যোতিহীন নারী যেন আমি আর দেখি নাই।

আমি বলিলাম—কেমন আছেন বৌদি। ভবানী বাবু কেমন?

ভবানী বাবুর স্ত্রী আমার কথার কোন জবাব না দিয়া আমাকে বাড়ির ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেলন। ভবানী বাবুকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তাহাকে আর চিনিবার জো নাই। ভবানী বাবু শয্যার সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছেন। দেখিয়াই বুঝিলাম মৃত্যুর ছায়া তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে।

সকল সংবাদ লইয়া জানিলাম কালাজ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া তাহার এই দশা হইয়াছে। ভবানী বাবুকে বলিলাম—তা চিকিৎসা করান নাই কেন?

ভবানী বাবু বিষাদ মাখা কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন—আর চিকিৎসা। প্রথম প্রথম এখানের ডাক্তারে ব'ললে ম্যালেরীয়া, তাই কুইনিন খাচ্ছিলুম তার পর বোলপুর হ'তে ডাক্তার আনলুম তারাও রোগ ধরতে পারল না, ব'ললে পুরোণো ম্যালেরিয়া আরও কুইনিন খেতে হবে, তাই খেয়ে যাচ্ছি। এতদিনে তারা বলেছে খুব সম্ভব কালাজ্বর, কলিকাতা ট্রপিক্যাল মেডিকাল ছাড়া এর চিকিৎসা নাই। কিন্তু ভাই আর এখন আমার এমন পয়সা নাই বা শরীরে বল নাই যে এখন কলকাতায় যেয়ে চিকিৎসা করাই। তাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে অপেক্ষা করছি।

ভবানীবাবু এই কয়টি কথা বলিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। ভবানী বাবুর এইরূপ অবস্থা দেখিব আশা করি নাই। মনের জ্বালা জুড়াইব বলিয়া এখানে আসিয়াছি কিন্তু এখানে যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে হৃদয়ের আগুন নিভানর কথা দূরে থাক্ আরও বাড়িয়া গেল। একজন স্বাধীনতার সৈনিক ভবিষ্যতের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন তিনি যে আজ অর্থাভাবে একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

ভবানী বাবু পুনরায় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—মরবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই আছি মাণিকবাবু কিন্তু মেয়েটার বিয়ে দিয়ে যেতে পারতুম তা হ'লে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতুম। ঐ একটী মাত্র মেয়ে তাও মোটা ভাত মোটা কাপড় দেখে একটা সৎপাত্র জোগাড় ক'রতে পারলুম না। এখন এমন কিছু টাকা নাই যাতে আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী ওর বিয়ে দিতে পারে। ভবানীবাবুর কন্যা রেণুকা তাহার বাবার শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল। আমাদের ও তাহার পিতার কথা শুনিয়া মনে হইল, সে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে।

ভবানী বাবুর কথায় আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলাম— টাকার জন্য মেয়ের বিয়ে আটকাবে না, আপনি আর ওজন্য ভাববেন না। সে জোগাড় হয়ে যাবে কোন রকমে।

ভবানীবাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুমি যখন আশ্বাস দিচ্ছ তখন হয়ত তা হ'তেও পারে কিন্তু আমি ত তাতে বাপ হ'য়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না। ভগবান যে তোমাকে এমন সময় জুটিয়ে দেবে মনেও ভাবি নি। কী আশ্চর্য মাণিক বাবু তোমার কথা একবার মনেও পড়ে নাই তা হ'লে অন্তত সময় মত চিকিৎসাটা হ'ত। এমন অসময়ে স্ত্রী কন্যাকে

পথে বসিয়ে যেতে হ'ত না। ভবানীবাবুর চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। রেণুকা তাহার পিতার চক্ষু মুছাইয়া দিল।

ভবানীবাবু একটু সুস্থির হইলে রেণুকাকে ইঙ্গিতে উঠিয়া যাইতে বলিলেন, রেণুকা উঠিয়া গেলে ধীর অথচ করুণ কণ্ঠে বলিলেন—একটা কথা রাখবে ভাই?

ভবানীবাবু কী কথা বলিতে পারেন সহজেই বুঝিতে পারিলাম। রেণুকাকে উঠিতে যাইতে বলায় তাহা অনুমান করিয়াছিলাম। আমার অনুমান করা কথাটা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলাম—কী কথা বলুন?

ভবানীবাবু আমার একটি হাত ধরিয়া বলিলেন—রেণুকাকে তোমার হাতে দিতে চাই। বড্ড ভাল মেয়ে। আমি মনের মত ওকে তৈরী করেছি কোন অসুবিধে ভোগ করতে হবে না। তার কোন দাবী নাই। এত বড় হ'য়েছে আজ পর্যন্ত সে কোন একটা সামান্য জিনিষও আমার কাছে চায় নাই। আমার অবস্থা দেখেই কোন দিন আমাকে অসুবিধায় ফেলে নাই এমনি লক্ষ্মী মেয়ে। ভবানীবাবু অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার এরূপ দুরূহ প্রশ্নের জবাব দিয়া সান্ত্বনা দেওয়া কঠিন। গোবর্দ্ধন কাছেই বসিয়াছিল। সেই অনুকুলবাবুর কথা উত্তর দিল "তা যদি বিয়ে না ক'রতে পারে—তবে আর এতদিন স্বদেশী ক'রে কী হ'ল শুনি? যদি একটা মানুষের দুঃখু ঘোচাতে না পারে। তা ছাড়া আপনি ভলেণ্টারী যখন, তখন ভলেণ্টারীর দুঃখ ভলেণ্টারীতে না দেখলে চলবে কী ক'রে শুনি? আপনাকে ভাবতে হবে না মাণকের ঘাড় বিয়ে করবে। আর বিয়ে করবেই বা না কেন শুনি, বিয়ে করা এমন কিছু কষ্টের কাজ নয়। ভলেণ্টারী করার চেয়ে ঢের সোজা।"

রেণুকাকে বিবাহ করিবার জন্য ভবানীবাবু অনুরোধ করিবেন

ইহা আমার ধারণার অতীত। প্রথম যেদিন ভবানীদার বাড়ীতে আসি সেদিন রেণুকা ছোট্ট একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা মাত্র। একটী সাদাসিধা ফ্রক পরিয়া চঞ্চল পদক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রয়োজন হইলে আমাদের দুই একটা ফরমাস খাটিতেছে। ছোট্ট বালিকা তাহার মনের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সেদিন কত প্রশ্নই না করিয়াছিল—"আচ্ছা স্বদেশী ক'রলে মা রেগে যায় কেন?" রেণুকার পিতার চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া দেশ স্বাধীন করার কাজে লাগিয়া যাওয়া-টাকে রেণুকার মা কোনদিন ভালচোখে দেখেন নাই। আমরা ভবানী-বাবুর স্ত্রীর অসন্তোষের খবর কন্যা রেণুকার মারফৎ পাইতাম "মা কী বলে জান? এবার ভলেন্টিয়ার এলে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব।" এমনি ছোটখাট কত কথাই না আমাদের নিকট পরিচয় দিয়া আমাদের আনন্দ বৰ্দ্ধন করিত।

আজ আর রেণুকা সেই চঞ্চলা বালিকা নাই। একজন দ্বাবিংশ বর্ষীয়া যুবতী। আজ আর তাহার সেই সহজ চঞ্চল লঘু পদক্ষেপ নাই, ধীর মন্দ গতি বয়সের পরিবর্তন স্মরণ করাইয়া দেয়। মাঝে মাঝে প্রায়ই ভবানীদার বাড়ীতে আসি কিন্তু রেণুকাকে সব দিন দেখিতে পাই না। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মেয়েদের সহজাত লজ্জা আমাদের নিকট ক্রমশঃ তাহাকে দূরে লইয়া যাইতেছিল। একদিন অপ্রয়জনে যাহার দর্শন সুলভ ছিল আজ প্রয়োজনেও তার দর্শন দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। পিতার কন্যা হওয়া একটা অভিশাপ। বিশেষ করিয়া সে কন্যা যদি বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়া যায়। রেণুকা তাই বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন অপরাধের ভারে নুইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে সে আমাদের নিকট বাহির হইত না। যদি বাহির হইত তবে তাহার সকুণ্ঠ পদক্ষেপ আমাদের মনেও কুণ্ঠা জাগাইয়া দিত।

তাই অষ্টম বর্ষিয়া রেণুকার সহিত যে পরিচয় ছিল তাহা ধীরে ধীরে কখন যেন মুছিয়া গিয়াছে।

রেণুকার কুণ্ঠার আর একটী কারণ ছিল। রেণুকা সুন্দরী নহে। অর্থাৎ রেণুকার রং ফর্সা ছিল না। সুন্দরী না হওয়া মেয়েদের আর একটী দুর্ভাগ্য। অতএব অসুন্দরী এবং বয়স্কা অনূঢ়া কন্যা এই দুইটী দুর্ভাগ্যের বোঝাতে রেণুকা নুইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিলেই মনে হইত যে সে যেন তাহার ক্ষুদ্র বক্ষে সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া রাখিতে ব্যস্ত। এই রেণুকাকে ভবানীবাবু বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। মুমূর্ষু পিতা কন্যার বিবাহের চিন্তায় নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিতেছে না। ভবানীবাবু আমার হাত দুইটী ধরিয়া বলিলেন—শেষ অনুরোধ আমার রাখবে কী ভাই? এই কথার কী উত্তর দিব ঠিক করিতে না করিতেই গোবর্দ্ধন পুনরায় বলিয়া উঠিল—কী এমন কথাটা শুনি যে রাখতে পারবে না। জেল যাচ্ছে, কত ভারী ভারী কাজ ক'রছে আর সামান্য বিয়ে করতে পারবে না কেন শুনি—? তাছাড়া যদি ভলেণ্টারী হয়ে ভলেণ্টারীর দুঃখু না দেখে তবে ভলেণ্টারী হওয়া কেন?

গোবর্দ্ধনের কথায় আকাশ হইতে পড়িলাম—গোবর্দ্ধন বলে কী— কিন্তু গোবর্দ্ধন তখনও বলিয়া যাইতেছে—মাণকে বিয়ে ক'রবে ভবানীবাবু, ও তেমন লোক নয়। পরের উপকার করার জন্যই ওর জন্ম। রেণুকাকে বিয়ে ক'রলে যদি তোমার দুঃখের লাঘব হয় তবে ও নিশ্চয়ই বিয়ে ক'রবে—দুঃখু মোচনই ত ওর ব্রত।

ভবানিবাবু আমার দিকে সজল নয়নে চাহিলেন। আমি বলিলাম— রেণুকার বয়সে আর আমার বয়েসে—

ভবানীবাবু বলিলেন—না না বেমানান হবে না। ওর হ'ল বাইশ আর তোমার বড় জোর সাইত্রিশ আটত্রিশ।—

বয়সের ব্যবধান দেখাইয়া বিবাহটা এড়ান যায় কিনা তাহার সামান্য চেষ্টা করিলাম। ভবানীবাবু বলিলেন—চমৎকার মেয়ে, রংটা কাল হ'লে কী হবে ওর মত সুন্দর গড়ন তুমি কোন মেয়ের পাবে না। রূপের দিক থেকে তুমি ঠ'কবে না মাণিকবাবু—

মনে মনে হাসি পাইল—হার জিতের প্রশ্ন নয়। অরূপা বলিয়া বিবাহ করিতে পারিব না, এ কঠিন কথা বলিবার মত হৃদয়হীন ভাষা এই মুমূর্ষু পিতার নিকট বলা যায় না। তা সে যতই কুরূপা হোক। গোবর্দ্ধন এমনভাবে ভবানীবাবুকে সান্ত্বনা দিয়াছে যে আমার সম্মতি না দিবার অবকাশ কোথাও রাখে নাই। আমি এক দারুণ সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। এই বয়সে বিবাহ করিবার আর ইচ্ছা নাই। তা ছাড়া বিবাহ করিয়া স্ত্রী পুত্র সন্তানাদির ভরণপোষণ করিবার মত রোজগার পত্রও করি না। সম্পত্তি যাহা ছিল তাহা জমীদারের মুষ্টিগত হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় বিবাহ করি কী করিয়া। গোবর্দ্ধন দুঃখ মোচনের কথা বলিতেছে কিন্তু বিবাহ করিলে আমি ত রেণুকার দুঃখের কারণ হইব। বিবাহ করিয়া তাহাকে যদি সুখী করিতে না পারি তবে কী আমার বিবাহ করা ঠিক হইবে? এই সব নানা প্রশ্ন আমার মনকে বিবাহ করিতে সায় দিল না। ভবানীবাবু পুনরায় অধৈর্য হইয়া বলিলেন—কই আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না যে—অমত ক'র না, আমি যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ম'রতে পারি তার ব্যবস্থা কর ভাই। এই বলিয়া কাতর নয়নে আমার দিকে চাহিলেন—

অজ্ঞাতে কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল—বিয়ে ক'রবার ইচ্ছা কোনদিন ছিল না ভবানীবাবু—তবে যদি বিয়ে করতেই হয় তবে রেণুকাকেই বিয়ে ক'রব এ কথা আমি দিচ্ছি—

ভবানীবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—না-না কথা নয়।

আজই আমি রেণুকাকে তোমার হাতে সঁপে দিতে চাই। অরক্ষণীয়া কন্যার দিনকাল কিছু নাই। আর বহুভাগ্যে ও তোমার মত স্বামী পাবে। মৃত্যুর আগে দেখে যাই আমি আমার সীতা মাকে রামচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছি।

২৩

আড়ম্বরহীন উৎসবহীন বাসর শয্যায় আমি ও রেণুকা বসিয়া। রেণুকার মা আমাদিকে বাসর ঘরে বলিয়া গেলেন—"আজকের রাত্রে আমাদের যত দুঃখের রাতই হোক তোমাদের আজ আনন্দ ক'রতে হয় বাবা। তোমরা যেন দুঃখু কোর না কোন।" এই বলিয়া রেণুকার মা চলিয়া গেলেন। গোবর্দ্ধন কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল—সংক্ষেপে বলিল—এমন কেডাফেরাস সময়ে বিয়েটা হ'ল যে বাসরে একটা গান ক'বব তার উপায় নাই মাইরী—যাক্ তোরা যেন মনে দুঃখু করিস্ না—দেখলি ত কী ব'লে গেল। আমি চললুম ভবানী বাবুর কাছে, রেণুকার ডিউটিটা আমিই করিগে—ইচ্ছে ছিল লুকিয়ে লুকিয়ে শুনি, কে আগে স্পিক্ করে, কিন্তু ভগবান এই সামান্য ইচ্ছেটা ফুলফিল ক'রল না। যাক কী আর ক'রব—। তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল—আজকের রাত্রে ঘুমুতে নাই এ কথা যেন মনে থাকে। গোবর্দ্ধন বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

রেণুকার দিকে চাহিলাম। রেণুকা অদূরে জড়সড় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। দেখিলেই মনে হয় যেন পৃথিবীর সকল জিনিষ হইতেই সে তাহার সকল অধিকার হারাইয়া বসিয়া আছে, এমনি তাহার সলজ্জ কুণ্ঠা। আমি তাহাকে কাছে টানিয়া লইলাম। রেণুকা আরও জড়সড় হইয়া বসিল। আমি বলিলাম—রেণুকা আমি তোমাকে বিয়ে ক'রব এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। রেণুকা আমার কথায় কী

ভাবিল জানিনা তাহার ঈষৎ অবগুঠিত মুখের দিকের চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম, ডুইটি আয়ত লোচন অশ্রুসায়রে যেন পদ্মের মত ভাসিতেছে—: আমি বলিলাম—রেণুকা আজকের রাত্রে কাঁদছ—এইত শুনলে আজকেব রাত্রে কাঁদতে নাই। রেণুকা আমার কোলের উপর মাথা রাখিয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাসর শয্যায় ইতি পূর্বে কোন বালিকা কাঁদিয়াছে বলিয়া জানি না। কিন্তু রেণুকার কথা স্বতন্ত্র। একদিকে তাহার পিতার জীবনসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে অপর দিকে অভাবনীয় ভাবে তাহার জীবনের প্রথম প্রভাত আশাব ক্ষীণ আলোক রশ্মি লইয়া পূর্ব গগনে উঁকি মারিতেছে। বেণুকার আজ কাঁদিবার দিনই বটে। আমি রেনুকাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম—ছিঃ রেনুকা আজকে কাঁদতে নাই এতে আমাদের অকল্যাণ হবে। রেণুকা তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে ছোখের জল মুছিয়া লইল। খুব সম্ভব সে অকল্যাণ কামনা করে না। তারপর সে আমার দিকে পরম বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। শিশু যেমন কোন কিছু নুতন খেলনা দেখিলে বিস্ময়ে ও পুলকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকে ঠিক তেমনি করিয়া রেণুকা আমার দিকে চাহিয়া আছে। রেণুকার দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বেশ বুঝিতে পারিলাম রেণুকা তাহার অফুরন্ত দাবী লইয়া আমার নিকট বসিয়া আছে। তাহার সে দাবী আমাকে মিটাইতে হইবে। কনক, মণিকা, বৌদির কথা একে একে মনে পড়িয়া গেল। তাহারা যেন পা টিপিয়া টিপিয়া রেণুকাকে আমার কাছে রাখিয়া সরিয়া পড়িতেছে। তাহাদের সমগ্র দাবীর চেয়ে যেন রেণুকার দাবী অনেক বেশী এ কথা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে।

আমি রেণুকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—রেণুকা আমাকে পেয়ে তুমি সুখী হ'তে পেরেছ? রেণুকা আমার কথার উত্তর দিল

না কেবল মাত্র মৃদু একটু হাসিল। আমি রেণুকার উত্তর শুনিবার জন্য যেন পাগল হইয়া গেলাম। অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া বলিলাম—আমি তোমার মুখে শুনতে চাই আজ আমাকে পেয়ে তুমি সুখী হতে পেরেছ কিনা? রেণুকা কিন্তু আমার এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। আমি বলিলাম—আমি কিন্তু সুখী হ'য়েছি রেণুকা, সত্যি বলছি খুব সুখী হয়েছি। রেণুকা আমার কথায় মনে হইল যেন সংশয় প্রকাশ করিতেছে—আমি পুনরায় জোর করিয়া বলিলাম—সত্যি তুমি বিশ্বাস কর রেনুকা আমি খুব সুখী হ'য়েছি।

রেণুকা অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত বলিল—আমার কী এমন গুণ দেখলেন যে—আপনি সুখী হ'য়েছেন—?

সস্নেহে রেণুকার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম—গুণের কথা বলছ রেণুকা, গুণ কী আর দেখতে হয়? গুণ থাকলে ত মানুষ মানুষকে ভালবাসবেই—আমি তোমাকে ভালবাসব দোষ গুণ বিচার ক'রে নয় রেণুকা, আমরা যে পরস্পরকে ভালবাসব ব'লেই যেন ভগবানের ইচ্ছাতেই মিলিত হয়েছি। এখানে দোষ গুণের কথা ত আসে না রেণুকা—। রেণুকা ঠিক আমার কথা বুঝিতে পারিল বলিয়া মনে হইল না কিন্তু তথাপি আমার কথায় সে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

আমি বলিলাম—রেণুকা কী চাও তুমি আমার কাছে—আজকের রাতে তা আমি তোমার কাছে শুনতে চাই—

রেণুকা বলিল—কী আর চাইব—আমি কিছুই চাই না—

রেণুকার কথায় আমি যেন উন্মাদ হইয়া গেলাম—এমন করিয়া না চাওয়ার কথা আজ আমি রেণুকার নিকট শুনিতে চাই না। আজ আমি মনের এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত—যেন বেণুকার তাহার অনন্ত দাবী লইয়া আমার কাছে দাঁড়াইয়া আছে আর আমি প্রাণপণ

শক্তিতে তাহার দাবী মিটাইয়া যাইতেছি—কী তাহার অফুরন্ত দাবী আর কী আমার অফুরন্ত প্রাণের অকুতি। আমি রেণুকাব মাথায় নাড়া দিয়া বলিলাম—কী চাও আজ আমি শুনতে চাই, বল— তুমি কী চাও—

রেণুকা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া এবং কুণ্ঠাব সহিত বলিল—কী চাইব তুমি আমাকে ব'লে দাও।

আমি বলিলাম—যা খুশী তুমি চাইতে পার—

বেণুকা আমার নয়নের উপর তাহার দীর্ঘায়ত নয়ন রাখিয়া বলিল—তোমাকে দেশের কাজ ছাড়তে হবে এই আমি চাই আর কিছু চাই না।

এমন কঠিন চাওয়া যে রেণুকা আমার কাছে চাহিতে পারে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই—

আমি রেণুকার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম—কেন রেণুকা আমাকে দেশের কাজ ছাডতে বলছ। আমি যে তোমার মতই দেশকে ভালবাসি।

বেণুকার সহিত যেন আমার বহুকালেব পরিচয় ঠিক তেমন স্বরে রেণুকা বলিল—আমি যে দেশের চেয়েও তোমাকে ভালবাসি—তুমি যে আমার কাছে দেশের চেয়েও বড়।

রেণুকার উত্তরে আমি যেন স্বর্গ হাতে পাইলাম—রেণুকা আমাকে দেশের চেয়ে ভালবাসে—কিন্তু আমি ত রেণুকাকে খুশী করিবাব মত বলিতে পারিতেছি না যে "রেণুকা দেশের চেয়ে আমিও তোমাকে ভালবাসি" আমি বেণুকাকে বলিলাম—তুমি যখন আমাকে ভালবাস রেণুকা তখন ত তুমি দেশকে বাদ দিতে পার না। আমি যে দেশের মাটির মানুষ। আমাকে ভালবাসলেই দেশকে ভালবাসা হবে। দেশ ও আমি ত আলাদা নই এ কথা কী তুমি জান না ?

রেণুকা সহজ সুরে বলিল—তা জানি ব'লেই ত আমি তোমাকে দেশের থেকে আলাদা ক'রে পেতে চাই।

আমি বলিলাম—কেন তুমি এ কথা বলছ রেণুকা এতে আমি কত আঘাত পাই জান?

রেণুকা বেদনাহত কণ্ঠে বলিল—তবে আমি বলব না।

আমি সস্নেহে বলিলাম—খুব ব'লবে এ বলার দাবী আমি তোমার কেড়ে নিচ্ছি না রেণুকা, তোমার যা খুশী তাই আমাকে বল, তবে আমি দেশের মানুষ, তুমিও দেশের মানুষ আমি চাই তুমি আমাকে আর দেশকে আলাদা ক'রে দেখবে না। তুমি ভবানী বাবুর মেয়ে তুমি চেয়ে দেখ আজ দেশের জন্য তিনি প্রাণ দিচ্ছেন—আজ দেশের জন্যই তোমাকে আমি পেয়েছি—রেণুকা তুমি আমাকে দেশের বুক থেকে ছিনিয়ে নিও না।

রেণুকার দিকে চাহিলাম—কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। রেণুকা ভয় পাইয়াছে, অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে, মনে হইতেছে সে যেন আমাকে হারাইবার আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। আমি রেণুকাকে দৃঢ়ভাবে বুকে চাপিয়া বলিলাম—না না রেণুকা তুমি কিচ্ছু ভেব না—আমি তোমাকে দেশের মতই ভালবাসি—কিচ্ছু কম ভালবাসি না।

কথাটা যেন নিজের কাণেই উপহাসের মত শুনাইতেছে—কনক, মণিকা, বৌদি যেন অদূরে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে—তাহারা যেন বলিতেছে—না না তুমি দেশকে ভালবাস না; আমাদিকে ভালবাস না; আর হতভাগিনী রেণুকাকেও ভালবাস না—ভালবাসা তোমার ধর্ম নয়—তুমি ভালবাসিতে জান না। তুমি কাঁদাইবার জন্য এবং কাঁদিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ। রেণুকাকে বিবাহ

করিয়া তুমি আর একজনকে জীবনভোর কাঁদাইবার জন্য তোমার কাছে টানিয়া আনিয়াছ, ইহাই তোমার পেশা।

মনটা কেমন যেন দমিয়া গেল। বাসর শয্যায় বসিয়া রেণুকার সহিত আজ এই সব জটিল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ঠিক হয় নাই। রেণুকাকে ঠিক কী করিলে খুশী করা যায় তাহাও ভাবিয়া পাইলাম না। অনাবশ্যক রেণুকাকে বুকে লইয়া বারংবার বলিতে লাগিলাম—রেণুকা আমি তোমাকে ভালবাসি—খুব ভালবাসি। কথাটার একটা বিষাদমাখা প্রতিধ্বনি উপহাসের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার কানে বাজিতে লাগিল। একটা অবাঞ্ছিত পরিবেশে বাসর ঘরের হাল্কা হাওয়া ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

যৌবন পার করিয়া বিবাহ করিলে বিবাহে মাধুর্য থাকে না। বিবাহের সময় একটী নরম নিষ্কাম ও নিরাসক্ত মনের খুবই প্রয়োজন। অধিক বয়সে বিবাহ করিলে সেই মনটি কখন কামনার চাপে কঠিন হইয়া যায়। ভবানী বাবুর মেয়েকে বিবাহ করিয়া মন আপনা হইতে চাহিয়া বসিল—রেণুকা আমার প্রিয়া না হইয়া জীবনের সাথী হোক। রাজনৈতিক জীবনের দুঃখের কথা রেণুকার অজানা নাই কারণ সে তাহার পিতার দুঃখের জীবন স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে অতএব তাহাকে বিবাহ করিলে আমার দেশের কাজ সহজ হইবে। আমার দুঃখের সে অংশীদার হইয়া সাথী রূপে মিত্ররূপে আমার আদেশে অনুপ্রাণিতা হইয়া আমার কাজকে সহজ সুগম করিয়া দিবে। আমার যেমন বেশী বয়স হইয়াছে তেমন রেণুকাও নেহাৎ বালিকা নহে। সেও কৈশোরের সীমা বহুদিন অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে তাহার মনও কানায় কানায় কল্পনার রঙ্গে রসে ভরপুর। তাই সে তাহার বঞ্চিত জীবনকে ভরিয়া লইতে চাহে।

যেন আর কোথাও শূন্য না থাকে। তাই সে সাথী হইতে চাহে না, প্রিয়া হইতে চাহে। একান্ত নিবিড়ভাবে লতা যেমন বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া ফলে ফুলে বাড়িতে থাকে রেণুকাও তেমনি আমাকে অবলম্বন করিয়া তাহার কল্পনার রূপে রসে বাড়িতে চাহে। বাসর শায্যয় বসিয়া সে রাত্রে সে কাঁদিয়াছে। কাঁদিবার কারণ আর কিছুই নহে আমারা উভয়েই সেই নরম নিষ্কাম মনটী হারাইয়া বসিয়াছি যে মনটী বিবাহের সময় একান্ত প্রয়োজন। দুইটি নরম নিষ্কাম মন পরস্পর পরস্পকে অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রয়োজন বোধে ধীরে ধীরে যখন আপন মনে কামনার রসে ভরিয়া যায় তখন ত এমন ভেদ থাকে না। উভয়ের কামনা যে এক হইয়াই বাড়িতে থাকে। কিন্তু যাহারা ঐ নিষ্কাম মনটি হারাইয়া বসিয়াছে, যাহাদের মনে নিজ নিজ প্রয়োজনে কামনার বৃক্ষে আলাদা করিয়া ফুল ফুটিয়াছে তাহারা কেমন করিয়া একই ফল আশা করে। তাই সেদিন আমি বুঝিয়াছিলাম—রেণুকা বিবাহ করিয়া আর যাই হোক সে আমার কল্প বৃক্ষে জল সিঞ্চন করিবে না অনুরূপ ভাবে রেণুকাও বুঝিয়াছিল যাহাকে অবলম্বন করিয়া উহার রস আকর্ষণ করিয়া ফলে ফুলে ফুটিয়া উঠিতে চায় ততখানি রস তাহার মধ্যে নাই, সে রস অনেকখানি শুখাইয়া গিয়াছে। অধিক বয়সের বিবাহের ইহাই অভিশাপ। তাই আমরা দুইটী অভিশপ্ত-জীবন একত্রিত হইয়া বাসর শয্যায় বসিয়া সেদিন কাঁদিয়াছিলাম।

২৪

বিবাহের দুইদিন পরে ভবানী বাবু মারা গেলেন। তাহার শবদাহ হইতে শ্রাদ্ধ-শান্তি পর্যন্ত সকল দায়িত্ব আমার উপর পড়িল। বলা বাহুল্য গোবর্দ্ধনই আমার সকল দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়া আমাকে

অনেকখানি নিশ্চিন্ত করিল। ভবানী বাবুও মৃত্যুর সময় আমাকে আশীর্বাদ করিয়া রেণুকার মতই দেশের কাজ ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। দেশের কাজ করিয়া তিনি যে আজ স্ত্রী কন্যাকে পথে বসাইয়া গিয়াছেন সে কথা তাহাদেব দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন—"তুমি না থাকলে এই নিরাভরণা মেয়েকে কে আর বিয়ে ক'রত বল। আজ ত আমি তাকে একরত্তি সোনা দিয়ে দান ক'রতে পারলুম না।" অর্থৎ এই সব না পারার কারণ যে একমাত্র স্বদেশী করা একথা তিনি বারংবার আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। আমি বেশ উপলব্ধি করিতে পারিলাম দেশ ও আমার মধ্যে ভবানীবাবু তাহার কন্যা রেণুকাকে বসাইয়া বিরাট একটা প্রাচীর তুলিয়া দিলেন। রেনুকাঘেরা প্রাচীর পার হইয়া দেশেব কাজ করা যে সহজ নয় সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

রেণুকাকে বিবাহ করিয়া ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিলাম এ মণিকা বা বৌদি নয় যে তাহাদের দাবিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া খেয়াল মত আমি আমার জীবনের চলার পথ বাছিয়া লইব। আমার চলার পথে তাহারা যতই না বাধা দিক্ সে বাধা অতিক্রম করিয়া ঠেলিয়া যাইবার মত শক্তি আমার আছে। কিন্তু রেণুকার বেলায় সে কথা খাটে না। রেণুকা পথ চলায় মণিকা বা বৌদির মতই পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়, যদি আমায় বাধা দিতে অক্ষম হয় তবে সে তখন আমার পিছু পিছু চলিতে থাকে এবং সুযোগ সুবিধা মত নূতন বাধার সৃষ্টি করে। আমার পথ চলার বিরাম নাই আর রেণুকার যেন বাধা দেওয়ার শেষ নাই।

ভবানী বাবুর শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ করিয়া রেণুকার মাকে বলিলাম—আমি এবার বাড়ী যেতে চাই। রেণুকার মা আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—

বাবা তুমি আমার স্বামীর শেষ ইচ্ছা পুরণ ক'রেছ রেণুকার ভার নিয়ে, কী ব'লে আর তোমাকে আমি আশীর্বাদ ক'রব। আমার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তিনি- সামান্য যা দু'চার বিঘে জমী রেখে গেছেন তাতেই আমা'র একটা পেট কোন রকম চ'লে যাবে। যদি আমার খেয়ে দেয়ে বাঁচে তবে তোমাদেরই থাকবে। তুমি আমার রেণুকার সাধ আহ্লাদ মিটিও, আমি শুধু গর্ভে ধ'রেছিনু বাবা ওকে— ওর কোন সাধই মিটতে পারি নি। এখন তোমার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। তোমার মত সুপাত্র যে আমার রেণুকার কপালে জুটবে তা কোন দিনই ভাবি নি। রেণুকার ভাগ্য ভাল তাই আজ তার ভাগ্যে রামচন্দ্র স্বামী হল।

রেণুকা তাহার এতদিনের আশ্রয় ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গোরুর-গাড়ির উপর উঠিয়া বসিল রেণুকা কাঁদিতেছে—রেণুকার মা কাঁদিতেছে এই কান্নার মধ্যেই আমি গুঞ্জন করিয়া ঘর বাঁধিব বলিয়া যাত্রা শুরু করিলাম।

গোবর্দ্ধন আমাদিকে গরুর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গাড়ীর সঙ্গে হাঁটিয়া হাঁটিয়া আসিতে লাগিল। আমি তাহাকে গাড়ীতে চড়িতে অনুরোধ করিলাম—গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল—মিতবরের বিয়ের আগে আদর —বিয়ের পর মিতবর গড়াগড়ি যায়। আমাকে সঙ্গে নিলে আবার রেণুকা চ'টে যাবে মাইরী।

রেণুকা বলিল—চ'টবো কেন, আপনি উঠে আসুন আমি খুব খুশী হব।

গোবর্দ্ধন পূর্ববৎ উঠিতে অস্বীকার করিয়া বলিল—এখন অন্য মানুষকে তোমাদের ভাল লাগবে না ভাই। আমার হাঁটতে কোন কষ্ট হয় না।

রেণুকার সহিত আমার পরিচয় হইয়া গিয়াছে। এই কয়দিনে আমি যেন তাহার অন্তর খুঁড়িয়া তাহার সমস্ত গুপ্তধন বাহির করিয়া লইয়াছি তাহার আর লুকাইয়া রাখিবার কিছুই নাই। গাড়োয়ান যাহাতে শুনিতে না পায় সেইরূপ চাপা কণ্ঠে রেণুকাকে বলিলাম—রেণুকা দেখছ গোবরা আমাকে কত ভালবাসে। পথের বিচ্ছেদটুকুও যাহাতে না ঘটে তাই সে গাড়ীতে উঠল না। সে যেন তোমার আমার মনের খবর রাখে। রেণুকা হাসিল। স্নিগ্ধ সরল মধুর একটা হাসিতে আমার কথায় সায় দিল। আমি বলিলাম—রেণুকা তোমার মাকে ছেড়ে খুব কষ্ট হবে—না? রেণুকা চুপ করিয়া রহিল। আমি আবার বলিলাম কই আমার কথার জবাব দিলে না যে?

কী জবাব দেব?

তোমার মাকে ছেড়ে কষ্ট হবে না?

তুমি থাকলে আবার কষ্ট হবে কেন?

তোমার মায়ের চেয়ে কী আমি বেশী ভালবাসতে পারি রেণুকা?

রেণুকা চুপ করিয়া রহিল।

আমি বলিলাম—আমার কথার জবাব দিলে না যে?

কী জবাব দেব?

তোমার মায়ের চেয়ে কী আমি বেশী ভালবাসতে পারি?

মায়ের চেয়ে বেশী ভালবাসবে ব'লেই ত মা আমাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়েছে। তারপর তুমি যেমন ভালবাসবে তাতেই আমার সুখ। রেণুকার উত্তরে আমি অবাক হইয়া গেলাম। শাশ্বত ভালবাসার দাবী লইয়া রেণুকা আমার নিকট উপস্থিত, সে তাহার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইতে চায়।

আমি রেণুকার দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে আমার মুখের দিকে

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত চাহিয়া আছে। আমার মুখে সে যেন ভালবাসার আখর পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। আমি রেণুকাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম—কোন ভয় নাই তোমার রেণুকা আমি তোমাকে ফাঁকি দেব না। তোমার জীবনকে সুখী ক'রতে না পারি বঞ্চিত ক'রব না কোন দিন। তোমার মাকে চিঠি লিখে এ কথাটা জানিও তুমি আমার হ'য়ে।

রেণুকার বড় বড় চোখ দুইটী আনন্দে হাসিয়া উঠিল—তারপর ধীরে ধীরে আমার কোলে মাথা রাখিয়া বলিল—আমি সুখ চাই না আমি তোমার ভালবাসা চাই। তুমি যদি ভালবাস তবে এর চেয়ে আর কী বেশী সুখ আছে।

আমি রেণুকাকে রাগাইবার জন্য বলিলাম—বুড়া বয়সে আমি কী আর তোমাকে ঠিকমত ভালবাসতে পারব রেণুকা। তোমার এখন কাঁচা বয়স ভালবাসার কায়দা কানুন তোমার যেমন জানা আছে আমি সে সব ভুলে গেছি, তা কী করে ভালবাসতে হয় একবার দেখিয়ে দাও না রেণুকা।

রেণুকা ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—ঐ সব কথা যদি বল তবে গোবর বাবুকে গাড়ীতে উঠে আসতে ব'লব।

আমি হাসিয়া বলিলাম—আচ্ছা আচ্ছা আর তোমার ভালবাসা দেখিয়ে কাজ নাই গোবরা বরং বেশ হেঁটে যাচ্ছে।

ছটুর বাড়ীতে দ্বিপ্রহরের কিছু আগেই আমরা পৌছিলাম। আমি বিবাহ করিয়া বৌ লইয়া আসিতেছি এ কথা গোবর্দ্ধন কিছু আগেই পৌছিয়া ছটুকে সংবাদ দিয়াছে। ছটু অল্প সময়ের মধ্যেই বর এবং বধু বরণের সবপ্রকার আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছে।

আমাদের গাড়ী পৌছাইতে না পৌছাইতে ছটু ও আরও কয়েকজন

মেয়ে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি সহকারে অভ্যর্থনা করিল, ছটুর দিকে চাহিয়া দেখি ছটুর চোখে জল, মুখে হাসি। ছটু আমায় মায়ের স্থান দখল করিয়াছে। ছটুকে দেখিয়া আমার স্বর্গত মায়ের সেই বিষাদ মাখা মুখ খানা মনে পড়িয়া গেল যাহার শত অনুরোধেও এমনি একটা কালো বৌ আনিয়া তাহার মুখে হাসি ফুটাইতে পারি নাই।

ছটু ববণ শেষ করিয়া রেণুকার চিবুকে হাত দিয়া বলিল—কোথায় লুকিয়ে ছিলে ভাই এতদিন। সেই এলে—আগে এলে মাকে দেখতে পেতে, আর মাও তোমাকে দেখতে পেত। কেন তুমি আমার মাকে কাঁদিয়ে এতদিন পরে এলে। ছটুর কথায় রেণুকা কাঁদিয়া ফেলিল—সদ্যো পিতৃহীনা বেণুকার ছটুর মায়ের কথা বুঝিতে কষ্ট হয় নাই। রেণুকার চোখের জল দেখিয়া ছটু বলিল—ছিঃ বৌদি আজ কাঁদতে নাই। মা তোমাকে স্বর্গ হতে দেখতে পাচ্ছেন। তার আশীর্বাদ তোমার জন্য রাখা আছে। তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল—যত নষ্টের গুরু ত দাদা, সেই বৌদি আনলে, আর কিছুদিন আগে আনলে না। তারপব অপেক্ষমানা অন্যান্য মহিলাদের দিকে চাহিয়া ছটু বলিল—আমার দাদার বড় সাধ ছিল কাল মেয়ে বিয়ে ক'রতে। দাদার কথাও যা কাজও তাই —কিন্তু যাই বল ভাই তোমরা, দাদার কিন্তু পছন্দ আছে ব'লতে হবে। কাল মেয়ে যে এমন ভাল দেখতে হয় তা আমি জানতুম না। ভগবান যেন নিজে হাতে গ'ড়েছে। কেবল পুয়ানে একটু কম ক'রে আগুন দেওয়াতে ভাল ক'বে পোড়ে নি, তাই ত রংটা লাল হয় নাই।

সত্যই কুম্ভকার ভগবান রেণুকাকে এক রং ছাড়া যে সকল রকমে নিখুঁত করিয়া গড়িয়াছেন এ বিষয়ে ছটুব কথায় সকল মহিলারাই এক মত হইল।

একজন মহিলা আনন্দে ছটুকে বলিল—হরিশপুরের বৌ, তোর

দাদার পছন্দ আছে ব'লতেই হবে। এমন মেয়েই বিয়ে দিয়ে আনতে হয় হ'লই বা কাল, গায়ের রং কটা হ'লেই ভাল মেয়ে বলে না কেউ।

ছটুর এবং ছটুর শ্বশুর বাড়ির মেয়েদের রেনুকার রূপের প্রশস্তি শুনিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। রেনুকা ভালই হোক বা মন্দই হোক তাহাকে পছন্দ করিয়া আমি বিবাহ করি নাই, বিধাতার অভিপ্রায়েই এই অঘটন সংঘটিত হইয়াছে। এই কাল মেয়ের রূপে আমি মোহিত না হইলেও এ কথা সেদিন মনে হইয়াছিল—রেনুকাকে না পাইলে আমি একটি দুর্লভ রত্ন হইতে বুঝি বঞ্চিত হইতাম। খিড়কীর ঘাটে বর্ষাঘেরা মেঘের নীচে যখন এই কালো মেয়েটী একগোছা বাসন মাজিতে মাজিতে কালো মেঘের দিকে চাহিয়া থাকিত তখন আমার মনে হইত ঐ লীলা-চপল মেঘের একটুকরা ভাসিয়া আসিয়া বুঝি খিড়কার ঘাটে লাগিয়াছে। কত বারই না চুপি চুপি যাইয়া তাহার মেঘ সজল দৃষ্টিকে আমার দিকে ফিরাইয়া দিয়াছি। রেনুকা কতবার অনুযোগ করিয়াছে—"তুমি ভারী ইয়ে—লোকে দেখলে কী ব'লবে বল দেখি ?" অবশ্য লোককে দেখিবার অবকাশ রেনুকা কোন দিন দেয় নাই, ঘাটের বাসন ঘাটে ফেলিয়া দিয়া ত্রস্তে ঘরে চলিয়া আসিয়া সরোষে বলিত—"থাকুক প'ড়ে বাসন, অমন ক'রলে আমি মাজতে পারবনা।" আমি কৌতুক করিয়া বলিতাম—ঘাটে বাসন থাকলে বাসন ফিরে পাওয়া যাবে রেনুকা কিন্তু এমন একটা বর্ষাঘেরা মেঘের সঙ্গে রেনুকাকে পাব কোথায়—? রেনুকা কপট ক্রোধ দেখাইয়া বলিত—"কেন শুধু শুধু আমাকে অমন কর বল দেখি—বাসনগুলো মাজতে হবে না?" রেনুকার কথার জবাব দিতাম না মুগ্ধ দৃষ্টিতে রেনুকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতাম কাল মেঘের মতই সে যেন অনন্দে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে—। এখনই বুঝি বা সে মেঘের

মতই উড়িয়া যাইবে। ঘাটের বাসন ঘাটে পড়িয়া থাকিত রেনুকার আব বাসন মাজিবার গরজ দেখিতাম না।

২১

নমিতাদি আমার বিবাহ সংবাদে খুশী হইতে পারিল না। সে পত্র দ্বারা জানাইল—বিবাহ করিয়া আমি তাহার উপর—দেশের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। দেশ সেবকের জীবন ভোগের জীবন নহে। আমি যে ত্যাগের পথ ছাড়িয়া ভোগের পথ বাছিয়া লইয়াছি তাহাতে শুধু আমি আদর্শচ্যুত হই নাই। আমার এই আদর্শচ্যুতিতে অন্যান্য দেশ সেবকদের মনকে দুর্বল করিয়া দিতে পারে। অতএব আমার মত লোকের সহিত সে আর সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছুক নহে।

আমি পত্রখানি রেনুকাকে দেখাইলাম। রেনুকা পত্রখানি দেখিয়া বলিল—ও তোমাকে বিয়ে ক'রতে বারণ করবার কে?

আমি বলিলাম—আমি ওর কথা মতই ত দেশ সেবার কাজে লেগেছি তাই সে দুঃখ পেয়েছে এই ভেবে, যে আমি দেশের কাজে পিছিয়ে প'ড়ব।

রেনুকা একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—ভারি ত—সে না ব'ললে তুমি যেন দেশ সেবা ক'রতে না। আর বিয়ে ক'রলে যেন দেশ সেবা হয় না। রেনুকা আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল—সে দেশ সেবা ক'রতে বলতে পারে মেয়ে মানুষ হ'য়ে, আর আমি পারি না। তার কাছে আর তোমার উপদেশ নিতে হবে না। আমি বলছি দেশ সেবা তুমি ছাড়তে পারবে না। রেনুকার উত্তেজনার কারণ বুঝিতে দেরী হইল না। রেনুকা আজ তাহার কোন অধিকার ছাড়িয়া দিতে রাজী নয়। বাসর শয্যায় বসিয়া যে আমায় দেশের কাজ ছাড়িতে বলিয়াছিল কয়েকদিন যাইতে না যাইতে রেনুকা আমাকে দেশ সেবা করিতে প্রেরণা দিতেছে। নিজের

অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে মেয়েরা যে কতখানি দিতে পারে তাহা সেদিন আমি দেখিয়াছি।

ছটুর বাড়ীতে কয়েকদিন কাটাইয়া রেণুকাকে লইয়া ঘর বাঁধিবার জন্য হরিশপুর আসিলাম। হরিশপুর আসিয়া অল্পদিনেই বুঝিলাম ঘর সামলান আমার পক্ষে কঠিন। চালে খড় নাই, আঙ্গিনার চতুর্দিকের প্রাচীর পড়িয়া গিয়াছে, মরাইয়ে ধান নাই, এমনি বহু কিছু বা সব কিছু নাই বলিলেই চলে। অথচ রেণুকার জন্য সব কিছুই প্রয়োজন, শুধু প্রয়োজন নয় এই সকল প্রয়োজন শীঘ্রই মিটান চাই। অথচ শীঘ্র ত দূরের কথা কতদিনে যে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিব তাহা চিন্তার মধ্যেই আনিতে পারিলাম না। ছোট্ট একটী রেণুকা অথচ তাহাকে ঘেরিয়া কত বড় প্রয়োজনই না আমার চোখে ফুটিয়া উঠিতেছে। রেণুকাকে লইয়া বিব্রত বোধ করিলাম। গোবর্দ্ধন ও রেণুকা অবশ্য এই অসুবিধায় কোন গুরুত্ব দিল না। তালপাতা কাটিয়া গোবর্দ্ধন আঙ্গিনা ঘিরিয়া ফেলিল। এর তার নিকট হইতে খড় চাহিয়া চালে গোঁজা দিল। চাষীদের নিকট চাল ধার করিয়া আমাদের তিনটি মানুষের খোরাক জোগাড় করিয়া আনিল। রেণুকাকে বিশেষরূপে বহন করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহ করিলাম আমি, আর গোবর্দ্ধনের উপর রেণুকার ভার পড়িল। কাব্যে সাহিত্যে এতদিন পড়িয়াছি ভালবাসা অভাবের তোয়াক্কা রাখে না—তাই রেণুকাকে বিবাহ করিয়া মনে করিয়াছিলাম যতই দারিদ্র্য থাকুক না কেন রেণুকার ও আমার কোন অসুবিধাই করিতে পারিবে না। অল্প দিনেই সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল—একটা দারুণ অভাবের চিন্তা রেণুকার ও আমার মধ্যে ফাটল ধরাইয়া দিল—কেবল গোবর্দ্ধনের জন্য সে ফাটলে গভীর খাদ সৃষ্টি করিতে পারিতেছিল না।

বছর না ঘুরিতেই একদিন রাত্রে গোবর্দ্ধন আমাকে জাগাইয়া বলিল—

"দিলুম গাঁয়ের পোষ্টাপিসে আগুন লাগিয়ে—তা না হ'লে ইংরেজ ভারত ছাড়বে না।"

আমি শঙ্কিত হইয়া বলিলাম—কে এ কাজ ক'রতে ব'ললে গোববা—আমরা না 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেব না ব'লেছিলুম, মনে নাই ?

গোবর্দ্ধন বলিল—মনে থাকবে না কেন ? তবে সমস্ত দেশের লোকেরা ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে—আর হরিশপুর পেছিয়ে থাকবে বলছিস—?

আমি বলিলাম—কিন্তু সকাল হলেই পুলিশে ধ'রবে আমাদিকে—তখন রেণুকার কী হবে ! তুই রেণুকার কথা একবার ভাবলি না গোববা ?

গোবর্দ্ধন বলিল—ভাবব না কেন ? কিন্তু হরিশপুরের চেয়ে তোর রেণুকা ত বড় নয় ?

কিন্তু আমাদের ধ'রে নিয়ে গেলে রেণুকার কী হবে—?

কেন রেণুকা হ'ল ভলেণ্টারীর মেয়ে, ভলেণ্টারীর স্ত্রী, কেন ও ভলেণ্টারী হ'য়ে যাক্।

রেণুকা চুপ করিয়া আমাদের কথা শুনিতেছিল—আমি তাহার মুখের দিকে চাহিতেই বলিল—আমার জন্য চিন্তা ক'রতে হবে না তোমাদের—বাবার প্রতিজ্ঞা ছিল ইংরেজকে তাড়াতে হবে—তিনি আজ স্বর্গে—তাঁর প্রতিজ্ঞা তুমি সার্থক ক'রবে তাতে আমি বাধা দেব ? কলকাতায় ফুটবল খেলা দেখতে য়েয়ে বাবা গোরা সৈন্যের চাবুক খেয়েছিলেন। সে কথা বাবা মরবার দিন পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি। আমি তাঁর মেয়ে হ'য়ে এই মহৎ কাজে বাধা দেব ? না না তোমরা 'ভারত ছাড় আন্দোলনে' ঝাঁপিয়ে পড়।

আমি রেণুকার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। পুরুষানুক্রমে আমরা ইংরাজের লাথি খাইয়াও রেণুকার মত বেদনা বোধ করি নাই।

রেণুকার বাবাকে মনে পড়িয়া গেল। গত সংগ্রামে কী তাহার উত্তেজনা, কী তাহার দেশের উপর নিষ্ঠা। সেই মহান পিতার সন্তান রেনুকা তাহার নিকট আমি ছোট হইতে পারিব না, তাই বলিলাম—তাই হবে রেণুকা, তোমার কথাই আমরা মেনে নিলুম, কিন্তু—তোমার কী হবে ?

আমি ঠাকুরঝির বাড়ী চ'লে যাব আজ ভোরেই।

কিন্তু তার সংসারের অবস্থা—

কেন আমি কী ধান ভানতে পারি না—

গোবর্দ্ধন উল্লসিত হইয়া বলিল—ইয়েস ভেরী গুড্ রেণুকা—এখন ধান ভেনে চালিয়ে নাও—স্বরাজ হ'লে তখন তোমার পায়ে একটা ধান কল বেঁধে দেব।

২২

দীর্ঘদিন পরে আমি ও গোবর্দ্ধন জেল হইতে বাহির হইয়া হরিশপুরে পৌঁছিলাম। গত আন্দোলনে আমাদের গ্রামে একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কে কী করিয়াছে তাহা কেহ জানে না কিন্তু বহুলোককে সেই কাজের মূল্য দিতে হইয়াছে। জমীদার ও তিনকড়ি গোমস্তা ছাড়া সকলকে পিটুনি ট্যাক্স দিতে হইয়াছে। পুলিশী তাণ্ডবে আমার বাড়ির চিহ্নমাত্র নাই। ছটুদের বাড়ী বারংবার হানা দিয়াছে, রেনুকাকেও তাহারা লাঞ্ছনা হইতে রেহাই দেয় নাই।

গোবর্দ্ধন আমার ভিটায় দাঁড়াইয়া বলিল—এইরে মাইরী কী হবে রে—আগে পাঁচিলে রেহাই পাওয়া গেছে এবারে যে ঘর করিয়ে ছাড়বে। কিন্তু গোবর্দ্ধন ছাড়িবার পাত্র নয়, আবার বাঁশ খড় মাগিয়া গোবর্দ্ধন একটী বাসযোগ্য দুই কুটীরী কুঁড়ে ঘর তৈয়ারী করিয়া রেণুকাকে ছটুর বাড়ী হইতে লইয়া আসিল।

রেণুকাকে আনিয়া গোবর্দ্ধন রেণুকাকে বলিল—ত্যাখ রেণুকা, ঘর

তোমার জন্মেই নইলে আমাদের দুটো মানুষের ঘরেরই বা কী দরকার, এখন বোঝ কত তোমাকে আমরা ভালবাসি—

রেণুকা হাসিয়া বলিল—তা দুটো ঘর কেন একটা মানুষের জন্মে—ও ঘরটা ত খালি থাকতে পারে না—তা ও ঘরের মানুষটী আনছ কবে—?

গোবর্দ্ধন বলিল—চুপ চুপ অলুক্ষণে কথা ডোণ্ট স্পিক্—ভলেণ্টারীর কখনও বিয়ে হয়— ?

রেনুকা আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল—ঐ যে কী ক'রে হ'ল ?

গোবর্দ্ধন পূর্বের মত জবাব দিল—মানে ভলেণ্টারীর ত ফার্ষ্ট কেলাস সেকেণ্ড কেলাস আছে।

এমনি চটুল পরিহাসের মধ্যে আমাদের আনন্দে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু মুস্কিল হইল আর্থিক অবস্থা লইয়া। এইবার জেল হইতে ফিরিয়া দেখিলাম যে চার পাঁচ বিঘা জমার জমী ছিল তাহাও নীলামে উঠিয়াছে। অথচ এমন সামর্থ্য নাই যে নীলাম রদ করিয়া জমীগুলি উদ্ধার করি।

রেনুকা বলিল—তা হ'লে কী হবে ?

আমি বলিলাম—চার পাচ বিঘে নাথ্রাজ জমী আছে তাতে কোন রকমে চ'লে যাবে।

রেনুকা বলিল—কিন্তু শুধু ভাতের ব্যবস্থা হ'লেই ত হ'ল না। ভাতের ওপর নুন ত চাই। কাপড় চোপড় আর সব জিনিষও ত অনেক লাগে।

রেনুকা সংসারের চিন্তার আকুল হইয়া উঠিল। আমারও চিন্তা কিছু কম ছিল না কিন্তু মনে হইত কোনরূপে বুঝি জুটিয়া যাইবে। গোবর্দ্ধনও আমাদের বাড়ীতে খাইত। তাহার জমীজমা ভিটেবাড়ী

কিছুই নাই অতএব সেই বা যায় কোথায়। কিন্তু গোবর্দ্ধন তাহার নিজের খোরাক ঠিক সংগ্রহ করিয়া আনিত। কেমন করিয়া আনিত বা কোথা হইতে আনিত তাহা ঠিক জানিতাম না। শুধু সে নিজের জন্য আনিত না এত উদ্বৃত্ত আনিত যে আমাদেরও তাহা হইতে টানাটানির সময় চলিয়া যাইত। গোবর্দ্ধন চুরি করিবে না। তাহাকে ভালবাসিয়া যে যাহা দিত বা কাহারও কোন কাজ করিয়া এই সকল জিনিষ জোগাড় করিত। কেন জানিনা রেনুকার কোন জিনিষ প্রয়োজন হইলে কদাচিৎ আমাকে বলিত অথচ গোবর্দ্ধনকে সে সব কথাই জানাইত। ইহাতে আমার মনে দুঃখ হইলেও খুব সম্ভব আমার করিবার কিছু ছিল না। অভাব যখন ক্রমশঃ তীব্ররূপে দেখা দিল তখন দু'একজন বন্ধু বান্ধবদের পত্র দিলাম একটা চাকুরী জোগাড় করিয়া দিবার জন্য। সব জায়গা হইতে একই উত্তর আসিল—চাকুরি করিবার যোগ্যতা ঠিক আমার নাই, তা ছাড়া এই বয়সে—

ইতি মধ্যে নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস প্রস্তুত হইল। আমার উপর আবার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পত্র দিলেন গান্ধীজীর ভারত ছাড আন্দোলনের পটভূমিকায় এই নির্বাচন। ইংরাজকে দেখাইয়া দিতে হইবে ভারতবাসীর একটি ভোটও ইংরাজের পক্ষে নাই। ইচ্ছা না থাকিলেও এড়াইবার জো নাই। কারণ জমীদার মধুসূদন ভট্টাচার্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে।

গোবর্দ্ধন বলিল—অভাব ত চার কাল আছে রে মাণকে এইবার খোকার বাবাকে দেখিয়ে দিতে হবে এক হাত—

খোকার বাবার নিকট হইতে অনুরোধ উপরোধ অবশেষ চাপে এবং ভীতি প্রদর্শন পর্যন্ত আসিতে লাগিল। আমরা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের পক্ষে এবং খোকার বাবার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য

চালাইয়া যাইতে লাগিলাম। নির্বাচনের নেশায় ঘব সংসার রেণুকার কথা ভুলিয়া গেলাম।

গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়া একদিন মধ্যাহ্নে বাড়ী ফিরিয়া দেখি বেণুকা কোমরে শাড়ী জড়াইয়া একটি কুড়ুল লইয়া একখণ্ড কাঠ কাটিবার চেষ্টা করিতেছে। তখনও রান্না চাপে নাই। দূর হইতে দেখিয়া বুঝিলাম এই কাষ্ঠ খণ্ডটী বিদীর্ণ করা রেণুকার সাধ্যের বাহিরে, এমন কী আমিও চেষ্টা করিলে এই কাষ্ঠ হইতে একটি টুকরাও বিদীর্ণ করিতে পারিব না। রেণুকা মাঝে মাঝে চেষ্টা করিতেছে এবং মাঝে মাঝে হতাশ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এক একটি কুঠারের আঘাত কাষ্ঠে না পড়িয়া মনে হইতেছে যেন আমার বুকে বাজিতেছে। আমি পশ্চাৎ হইতে বেণুকার হাতের কুঠার কাড়িয়া লইয়া বলিলাম—ছেড়ে দাও আমি কাটি—

রেণুকা আমাকে দেখিয়া তাহার মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া বলিল—তুমি কাটবে কী! কত জায়গায় ঘুরে এলে এখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে বস। আর কাঠ কাটতে তুমি পারবে কেন? যা শক্ত কাঠ ওটা—

রেণুকার উত্তরে আমি আরও অভিভূত হইয়া পড়িলাম—বলিলাম রেণুকা তুমি পার আর আমি পারি না?

রেণুকা হাসিয়া বলিল—আমরা যে মেয়ে মানুষ আমাদের সব কিছুই পারতে হয়—

রেণুকার হাসিব ভিতর কান্না লুকাইয়া ছিল। রেণুকা কাঁদিলে হয়ত আমি অতটা অভিভূত হইতাম না। আমি রেণুকার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলাম। রেণুকা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—এতখানি বেলা হ'যে গেছে এখনও ভাত চড়াতে পারি নাই। তোমাদের খেতে অনেক বেলা হ'য়ে যাবে।

আমি বলিলাম—কিন্তু ঐ কাঠত কাটা যাবে না।

রেণুকা হাসিয়া বলিল—না যাক সে একরকম ক'রে হ'য়ে যাবে। এত হাসি আসে কোথায় হইতে রেণুকার, ভাবিয়া পাইলাম না। কোনরূপ আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম—রেণুকা বিয়ে ক'রে অবধি একবারও তোমার দিকে নজর দিতে পারিনি, তুমি আমায় ক্ষমা কর। নির্বাচন চুকে গেলে আমি যেমন ক'রে হ'ক—তোমার দুঃখের অবসান ক'রবই।

আমার কথায় রেণুকা কাঁদিয়া ফেলিল, কোলের উপর মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সে কাঁদিল। কিন্তু কোন অভিযোগ করিল না। আমি বলিলাম—কাঁদছ রেণুকা? আমি জানি আমার সংস্পর্শে যে আসবে তাকেই চিরজীবন কাঁদতে হবে। তাইত তোমাকে এ দুঃখের মধ্যে টেনে আনতে চাই নি। কিন্তু কী ক'রব কোন উপায় ত নাই। সবই ত তুমি জান?

রেণুকা বলিল—দুঃখু আমার জন্যে নয় তোমার জন্যে। এতটা বেলা হ'ল আর উনোনে আগুন পড়ল না। খেতে বেলা হবে কত বল দেখি?

সে ত আমারই দোষ রেণুকা?

আমার অদৃষ্টের দোষ তোমার কোন দোষ নাই এই বলিয়া রেণুকা আমায় মুখের দিকে চাহিল।

রেণুকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বর্ষাকালের মেঘের মতই একখানা মুখ যেন এখুনি শুষ্ক ধরিত্রীর বুকে গলিয়া পড়িবে। সজল দুইটি নয়ন কালিন্দীর জলে যেন ভাসিতেছে। তৃষ্ণার্ত চাতকের মত আমি রেণুকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কাঠ নাই, নুন নাই, তেল নাই, হয়ত চাল নাই, এমনি কত কী নাইয়ের মধ্যে একজোড়া কালো চোখ আমার সব নাই পূরণ করিয়া দিল। কোন অসতর্ক মুহূর্তে

রেণুকার মুখে আমার মুখ নামিয়া আসিয়াছে জানিতে পারি নাই। গোবর্দ্ধনের ডাকে সম্বিত ফিরিয়া পাইলাম—

গোবর্দ্ধন দূর হইতে বলিতেছে—মাণকে তুই ত আজ পেট ভরিয়ে নিলি কিন্তু আমাকে ত চারটি খেতে হবে—এখন রেণুকাকে ছেড়ে দে—উনোন ধরান হ'য়ে গেছে।

রেণুকা লজ্জায় ধড়মড় করিয়া উঠিল—আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম—আয় না আমি একা পেট ভরাই কেন?

গোবর্দ্ধন তখন একটি ছিপ হাতে করিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছে—তাই দূর হইতে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিল—ভলেণ্টারীর ভাগ্যে কী ভাল জিনিষ খাওয়া কপালে আছেরে মাণকে—তোর কোন রকমে জুটেছে খেয়ে নে কদিন।

রেণুকার রান্না হইয়া গিয়াছে। গোবর্দ্ধন তখনও ফেরে নাই। আমি অবশ্য গোবর্দ্ধনের জন্য কোনদিন অপেক্ষা করি না। কিন্তু কেন জানি না রেণুকা ভাত দিতে দেরী করিতেছে।

আমি বলিলাম—গোবর্দ্ধনের জন্য অপেক্ষা ক'রতে হ'লে সন্ধ্যের আগে আর খাওয়া জুটবে না। রেণুকা যেন আমার কথাটা শুনিতেই পাইল না। আমিও আর ভাত দিবার জন্য পেড়াপিড়ি করিলাম না। বেশ কিছুক্ষণ পরে গোবর্দ্ধন ফিরিয়া আসিল—রেণুকাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—নাঃ আজ আর কিছু হোল না। মাণকের কপালে শুধু ভাত খাওয়া আছে দেখছি। একটা মস্ত বড় শোল মাছ পাড়ে তুলে হাতে ক'রে ধ'রতে গেছি আর পিছ্‌লে জলে গিয়ে প'ড়ল।

বুঝিলাম ওই পলায়মান শোল মাছটির জন্যই রেণুকা অপেক্ষা করিতেছে।

আমি হাসিয়া গোবর্দ্ধনকে বলিলাম—ওরে গোবরা অদৃষ্ট মন্দ হ'লে পোড়া শোল পালায় আর এ ত জীয়ন্ত।

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল—আরে পোড়া শোল যে পালায় তা ত শাস্ত্রেই আছে—কিন্তু জীয়ন্ত শোল যে গোবর্দ্ধনের হাত হ'তে পালিয়ে যায় কপাল না মন্দ হ'লে এমনটা হয় না। কিন্তু রেণুকা যে ঐ ভরসায় দাঁড়িয়ে আছে তার কী করি? ব্যাটা শোল যে এমন ক'রে দাগা দেবে তা জানতুম না।

রেণুকাকে খুশী করিবার জন্য যে শোল মাছের করুণা করিয়া গোবর্দ্ধনের ছিপে ওঠা উচিৎ ছিল এবং সে যে এইরূপ আচম্বিতে পলাইয়া যাইবে তাহা গোবর্দ্ধন বা রেণুকা কেহই ভাবে নাই। শ্রীবৎস রাজার দগ্ধ শোল পলাইয়া যাইতে পারে কারণ সে প্রাণহীন। কিন্তু গোবর্দ্ধনের শোল ত প্রাণহীন নহে তবে কেন সে এমন হৃদয়হীনের কাজ করিল? কেন সে করুণা করিয়া গোবর্দ্ধনের ছিপে ধরা দিল না, একথা রেনুকা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না।

২৩

স্বপ্ন যে সম্ভব হয় একথা গোবর্দ্ধন যেন বুঝিতেই পারিল না। আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—হ্যাঁরে মাণকে তবে এবারে খোকার বাবা ঢিট হবে কী বল্?

আমি বলিলাম—সে রকম কথা ত মহাত্মাজী বলেন না। তিনি বলেন—এদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হবে। এরা যে ধন ভোগ করছে তা ওদের ধন নয়, ওরা গরীবের ধনের অছি মাত্র।

গোবর্দ্ধন বলিল—ও সব বড় বড় কথা রাখ। এবারে স্বরাজ ত হ'ল, এখন আমরা খোকার বাবাকে শায়েস্তা করতে পারব কি না?

আমি বলিলাম—শায়েস্তা ক'রতে হবে না এরাও দেশের লোক ওরাও আজ স্বাধীন ভারতবর্ষের আমাদেরই মত নাগরিক। ওদের বাদ দিয়ে ত দেশ নয়, ওরাও দেশের মানুষ ওদের বুদ্ধি, সম্পদ. শক্তি

সবই দেশের কাজে প্রয়োজন। স্বরাজ শুধু তোকে আমাকে নিয়ে নয়।

গোবর্দ্ধন বলিল—ওঃ মকদ্দমা করলুম আমরা আর ওদের হ'ল ডিক্রী, তা হ'লে ত বেশ স্বরাজ হ'লরে মাইরী।'

আমি ধমকাইয়া বলিলাম—তুই ওসব কথা বুঝতে পারবি না। চুপ ক'রে থাক্। পাগলের মত যা তা বলিস্ না।

গোবর্দ্ধন বেণুকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—কপালে ভলেণ্টারী করা থাকলে কে ঘুচুবে বল—আমি ভেবেছিলুম স্বরাজ হ'ল আপদ চুকে গেল। কিন্তু মাণকের মতলব ভাল নয় দেখছি। জীবন ভোর আমাকে ধোঁকা দিয়ে এসেছে স্বরাজ হ'লে খোকার বাবা ঢিট হ'য়ে যাবে—এখন উল্টো ব'লছে। এখন দেখছি গাঁ ছাড়া না হ'লে আর র'ক্ষে নাই। এই বেলা কেটে পড়তে হবে।

আমি বলিলাম—সত্যাগ্রহীর মনে দ্বেষ রাখতে নাই।

গোবর্দ্ধন বলিল—নে নে আর তোকে গান্ধীগিরী ফলাতে হবে না।

স্বরাজ সম্বন্ধে গোবর্দ্ধনের কীরূপ ধারণা তাহা আমি জানি না। খোকার বাবার উপর গোবর্দ্ধনের চিরদিনই রাগ। আমারও কিছু কম নয়। তিন্ন গোমস্তার বাড়ীতে পেয়ারা চুরির অপরাধে অতি শৈশবে মধুসূদন ভট্টাচার্য যে নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছিল তাহার ব্যথা গোবর্দ্ধন আজও ভুলিতে পারে নাই। তারপর যত দিন গিয়াছে মধুসূদন ভট্টাচার্য নূতন নূতন করিয়া আমাদের উপর আঘাত হানিতেছে। তাই গোবর্দ্ধন আজ সেই আঘাতের প্রতিশোধ লইতে চায়। গোবর্দ্ধন কিছুতেই বুঝিতে পারে না আমাদের অর্জ্জিত স্বরাজে খোকার বাবার অধিকার কী করিয়া থাকিতে পারে! গোবর্দ্ধন আমার সব কথাই মানিয়া লয় কিন্তু এই সোজা কথাটা তাহার নিকট দুর্বোধ্য রহিয়া গেল—তাহাকে

কিছুতেই বোঝাইতে পারিলাম না যে মহাত্মাজী যাহা বলিয়াছেন তেমনি আর পাঁচজনা ধনীর মত খোকার বাবারও হৃদয়ের পরিবর্তন হইবে।

রেণুকাও গোবর্দ্ধনের কথায় সায় দেয়। সেও নিজে একজন রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের মত বুদ্ধি ধরে বলিয়া মনে করে। কেনই বা করিবে না? আজীবন সে রাজনৈতিক আড্ডায় মানুষ হইয়াছে। তাহার বাবা একজন দেশসেবক স্বামী একজন দেশসেবক, তাহার প্রধান সখা গোবর্দ্ধনও একজন দেশসেবক, এতবড় একটা রাজনৈতিক পরিবেশে যে মানুষ হইয়াছে সে যতই পতিপ্রাণা হোক, কেনই বা সে বিনা যুক্তিতে আমার কথা মানিয়া লইবে। তাই সেও গোবর্দ্ধনের কথায় সায় দিয়া বলে—রেখে দাও তোমার গান্ধীকে। এই কথা বলিয়া সেও গোবর্দ্ধনের মতই আমাকে উপহাস করে, সে জানে গান্ধীজীর জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি আমি তাহার নিন্দা সহ্য করিতে রাজী নই।

নাইবা খোকার বাবা আমার সহায় হইল। নাইবা গোবর্দ্ধন আমার সাথে রহিল, রেণুকা আমাকে যদি ভুলই বুঝিয়া থাকে তাহাতেই কী আসিয়া যায়? যিনি এত বড় সংগ্রাম বিনারক্তপাতে জয় করিলেন তাহার বাণী, তাহার আশা, তাঁহার স্বপ্ন ব্যর্থ হইতে দিতে পারিব না। গোবর্দ্ধন ও রেণুকা আমার মনের নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে, কী যেন তাহারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। আমাদের একমাত্র কন্যা মুক্তিকে কারণে অকারণে লক্ষ্য করিয়া রেণুকা আমাকে কত কথা শোনায়। স্বাধীনতার দিনে মুক্তির জন্ম হইয়াছে তাই তাহার আমি নামকরণ করিয়াছি মুক্তি। ছোট্ট একটী বাচ্চা অনাবশ্যক তার মায়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ওঠে। তাহার মা ঝঙ্কার দিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলে 'মুক্তি' নাম রাখা হ'য়েছে ও নাম আমি বদলে দেব। আমার সামনে মুক্তিকে বলিতে শুরু করিয়াছে 'বাঁধন'। কেবল

বলে কত পাপই করেছি যে শেষ কালে বাঁধন এসে আমার গলায় ফাসী দেবে।

কী আর বলিব? কথা ফুরাইয়া আসিয়াছে দুঃখ মোচনের দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছিলাম—পথ আর শেষ হয় না, কত বন্ধুর কত দীর্ঘ পথ। এ পথের আর শেষ নাই। চালিয়াছি, চলিয়াছি, চলার যেন বিরাম নাই আরও পথ আরও দীর্ঘ পথ বাকী রহিয়াছে, কতদিনে, কত কালে সে পথ শেষ হইবে কে জানে? সাথী যারা তাহারাও আমারই মত পথ চলিতে চলিতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। নিরাশার অন্ধকারে কত পথিকই যে পথ হারাইয়াছে কে তাহার খোঁজ রাখে? কেবল একটী মাত্র মানুষ একা চলিয়াছে, বড় একা, এমন নিঃসঙ্গ মানব আমি কোথাও দেখি নাই। কখনও দেখিব না। কী তাহার উদ্যম, কী তাহার তিতিক্ষা! চলিয়াছে, চলিয়াছে সামনে চলিয়াছে, একা চলিয়াছে কে সাথে আসিতেছে বা কে আসিবে যেন ভ্রূক্ষেপ নাই—পথিকের কণ্ঠ হইতে শোনা যাইতেছে—আমি একা যাত্রা করিয়াছি, কেহ সঙ্গে না থাক আমি একাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিব। উৎসব করিয়া সমারোহ করিয়া যাহারা পথ চলে তাহারা পথিক নয়। দুর্গম পথের যাত্রী আমি, একা—একাই আমাকে চলিতে হইবে। তাহার কণ্ঠে একটী মাত্র ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—আমি একা পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছি আমি ফিরব না—ভীরু যে পথ চলায় অধিকার তাহার নাই—কোন বাধা আমি মানিব না, কোন ভয় আমি করিব না, যে পথে আমি একা যাত্রা করিয়াছি সে পথ আমি একাই শেষ করিব—

এই পথিকের কথায় পথে নামিয়াছি— Strength of numbers is the delight of the timid—ভীরু যে সে হাজার লোকের সঙ্গ কামনা করে। আবার শুনিতে পাইতেছি I will fight to the single

handed minority. একা চলিতে যে ভয় পায় সে ভীরু। কেহ যদি না সাথে যোগ দেয় তবে আমি একাই লড়িব।

গোবর্দ্ধন আসিয়া বলিল—মহাত্মাজীকে গুলি করেছে—

রেণুকা বলিল—আপদ গেছে—

মুক্তি কাঁদিয়া উঠিল।

আমি রেণুকার দিকে চাহিলাম। সে শুধু আমার প্রিয়া নহে, মুক্তির জননী। আজ তাহার মুখে এ কী পৈশাচিক বাণী! মুক্তিকে কোলে তুলিয়া বলিলাম—কাঁদছিস মা—তোর মা মেরেছে—? রেণুকার দিকে চাহিলাম—দেখিলাম রেণুকা জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে।

আমি বলিলাম—কী হোয়ে গেল রেণুকা আজ, তোমাকে যদি বোঝাতে না পারি তবে আমি কাকে এই কথা বোঝাব?

আলোকোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন গগন কালমেঘে ঢাকিয়া গেল। স্বমহিমায় সমুন্নত অভ্রংলেহী গিরিশৃঙ্গ আচম্বিতে ধ্বসিয়া পড়িল। মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভে নাই, তাহাকে সজোরে নির্বাপিত করা হইয়াছে, প্রাচীন ও নবীন ভারতের মিলিত ইতিহাস যাহার কণ্ঠে আশ্রয় করিয়া সারা বিশ্বকে অমৃতের বাণী শুনাইয়াছে সে কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়া গেল, যে অত্যুজ্জ্বল দীপশিখা সারা বিশ্বকে প্রেম, মৈত্রী. করুণা ও অহিংসার আলোকে বিশ্বমানবের মুক্তির ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিয়াছে সেই দীপশিখা নির্বাপিত হইয়া গেল। সমগ্র জাতির পূঞ্জীভূত গ্লানির হলাহল তিনি নীলকণ্ঠের মত পান করিলেন।

তিনি বাঁচিতে চাহেন নাই তিনি এই, অন্ধকার জগতে আর বাঁচিতে চাহেন নাই রেণুকা—এইত সেদিন তিনি বলিয়াছেন "আমি অন্ধকার জগতে আর বাঁচিতে চাহি না।"

যে তাহাকে হত্যা করিয়াছে তাহাকে তিনি ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন—যদি আমাকে কোন পাগলের গুলিতে প্রাণ দিতে হয় আমি যেন তা হাসি মুখে গ্রহণ করি। আমার মনে যেন কিছু মাত্র দ্বেষ না থাকে। (If I am to die by the bullet of a mad man. I must do so smiling, there must be no anger within me)

তুমি কার মৃত্যুতে হাসছ রেণুকা—তুমিত শুধু রেণুকা নও তুমি যে মুক্তির জননী—!

মুক্তির মায়ের চোখে বাণ ডাকিয়াছে।

২৪

গোবর্দ্ধন ও রেণুকা ক্রমশঃ আমার নিকট হইতে যেন দূরে সরিয়া যাইতেছে। প্রয়োজন না হইলে তাহারা বড় একটা আমার মতামত গ্রহণ করে না। যদি বা গ্রহণ করে তবে তাহার মূল্য দেয় না। কেবল মধ্যে মধ্যে জমীদার বাড়ির খবর আনিয়া আমাকে শোনায়। খোকার বাবা কেমন ঘটা করিয়া রায়বাহাদুর পদবী ত্যাগ করিয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ শোনায়, শীঘ্রই গ্রামে নাকি খোকার বাবা হাসপাতাল তৈয়ারী করিয়া দিবে। এবং কোন এক মন্ত্রী আসিয়া তাহার উদ্বোধন করিবে; গান্ধী আশ্রম বলিয়া এক সেবাশ্রম খুলিবারও তাহার নাকি ইচ্ছা আছে এমনি কত কথাই আমাকে শোনায়। জেলা হইতে মেজিষ্ট্রেট প্রভৃতি প্রায়ই জমীদারের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে। অর্থাৎ স্বরাজ লাভ করিবার পরও খোকার বাবা কেমন ধনে মানে বাড়িয়া যাইতেছে তাহার লম্বা ইতিহাস বলিয়া যায়।

সত্যই জমীদার মধুসূদন ভট্টাচার্যের প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িতেছে। গ্রামের সকলেই তাহার দুয়ারে ধর্না দিতেছে। কোন কিছু প্রয়োজন হইলে

সকলে জমীদার বাড়িতে ছুটিয়া যায়। তিনকড়ির মুখে প্রায়ই শোনা যায়—শুধু জেলখাটা লোক নিয়ে দেশের ভাল হ'তে পারে না, 'এরও' প্রয়োজন আছে, এই বলিয়া তর্জনীর ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে টোক্কা মারিয়া দেখাইয়া দেয়। অর্থাৎ সব কাজেই টাকার দরকার, "অতএব খোকার বাবা ছাড়া আর কে এ সব কাজে টাকা দেবে? কার কী আছে শুনি গাঁয়ের? শুধু গলাবাজী ক'রলে ত দেশের ভাল হবে না, এলেম থাকা চাই।"

পশ্চিম গগনে সূর্য্য হেলিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত দিন হরিশপুরে উত্তাপ ছড়াইয়াও তাহার খেদ মেটে নাই তাই যেন সে আবার লাল হইয়া চোখ রাঙ্গাইতেছে—

মুক্তি আমার পায়ের স্যাণ্ডেল জোড়াটা পায়ে দিয়া বলিতেছে—বাবা 'দোতো'—এই বলিয়া তাহার পায়ের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে—রেণুকা কয়েকদিন হইতেই গোবর্দ্ধনকে বলিতেছে—"বোলপুর গেলে একজোড়া মুক্তির জুতো কিনে এনো ত?" এসব কথা রেণুকা আর আমাকে বলে না। মুক্তি আবার বলিতেছে—বাবা দোতো—

আমি বলিলাম—হ্যাঁ মা জুতো আনতে হবে কিনে, তোমার জন্যে।

রেণুকার চাপা হাসি শোনা যাইতেছে, খুব সম্ভব আমার অক্ষমতাই তাহার হাসির কারণ।

মুক্তি আবার বলিতেছে—বাবা দোতো—

আমি বলিলাম—হ্যাঁ মা, তোমার মা এবার জুতো না আনলে আমার কপালে ওটা পড়বে।

রেণুকা অনাবশ্যক ছুটিয়া আসিয়া মুক্তিকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেল—। কানে বাজিতে লাগিল—"কী মুরোদের বাপ পেয়েছিস তাই জুতো চাওয়া হ'চ্ছে। চুপ কর হারামজাদি।"

মুক্তি বলিতেছে—মা দোতো—মা হামাজাদি—

ছটু কয়েকদিন হইল চিঠি দিয়াছে। নৃপেনবাবুর স্বাস্থ্য ভাল নাই তাই তাহাকে কিছুদিন কোথায় চেঞ্জে যাইতে হইবে। আমি যদি দুই মাস নৃপেনবাবুর স্কুলে নৃপেনবাবুর বদলে মাষ্টারী করিয়া দিয়া আসি তাহা হইলে সে ছুটী পায়।

ছটুর কোনদিন কোন সাহায্য করিতে পারি নাই। এই অবস্থায় না যাওয়া ঠিক হইবে না। নৃপেনবাবুর স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, তাহার উপর সমগ্র সংসার নির্ভর করিতেছে। গোবর্দ্ধন ও রেণুকার সহিত যুক্তি করিতে হইবে—রেণুকাকে ডাকিলাম। রেণুকা নাই। গোবর্দ্ধনকে খুঁজিলাম, গোবর্দ্ধন নাই। মনে শঙ্কা হইল, কী যেন তাহারা আমার বিরুদ্ধে কয়েকদিন ধরিয়া ষড়যন্ত্র করিতেছে। উভয়ের চাপা হাসি আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পাগলের মত পথে বাহির হইলাম। দু একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম রেণুকা ও গোবর্দ্ধনকে একসঙ্গে যাইতে দেখিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়াছে, সন্ধ্যাবেলায় তাহারা কোথা যাইতে পারে ভাবিয়া পাইলাম না।

কিছুদূর যাইতেই তিনকড়ি গোমস্তার সঙ্গে দেখা। তিনকড়ি আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল—ও মাণিকবাবু এত সন্ধ্যেবেলায় কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে? বলি এইদিকে এস, একটা কথা আছে। বাধ্য হইয়া দাঁড়াইতে হইল।

তিনকড়ি বলিল—তোমার যে এমন অভাব তা ত জানতুম না বাবু! তোমাদের আবার ভাবনা কী। সরকার জেল-খাটা লোকের জন্য পেনসেন দিচ্ছে। তা তুমি এক কথা মুখ হ'তে খসালেই হ'য়ে যায়। গোবরা ও বৌমা, বাবুর কাছে কদিন থেকে দরবার ক'রছে—তা বাবুর ঐ এক কথা যে তোমাকে নিজে একবার ব'লতে হবে। বাবুর আমার দয়ার শরীর, তুমি এক কথা মুখ হ'তে খসালেই হয়। তুমি ত জান জজ মেজিষ্ট্রেট হ'তে

সকলেই বাবুর হাতের মুঠোর মধ্যে। এক কলম লিখে দিলে ঝাঁ ক'রে তোমার পেনসেনটা হ'য়ে যায়। 'আর তোমারও এত জেদ ভাল নয়। বৌমার যা কষ্ট শুনলুম—ব'লতেই বা দোষ কী, মানি লোকের কাছে দরবার ক'রলে মান যায় না। আরে ভাই ইংরেজ যে রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে গেছে, সে দিয়ে গেছে ত তাদের নিজের লোককে। তোমরা ভাবছ তোমার দাদারা মন্ত্রী হ'য়েছে, তাই ধরাকে সরা দেখছ—আরে ভাই সেই জজ মেজিষ্ট্রেট সব তারাই আছে। বাবুর সঙ্গে আগেও যেমন তাদের দহরম মহরম ছিল—আজও তেমনি আছে। তোমরা ত জান না দাদা, আমি ত বাবুর কাছে সব শুনতে পাই—ওরা বলে—"আরে আমাদিকে ছেড়ে রাজত্ব চালাক্ দেখি—ওদের পেটে যে কত বিদ্যে তাত আমাদের জানতে বাকী নাই। যত সব হাভেতে মুখ্যুর দল, স্বরাজ পেয়ে, লাফাচ্ছে—"

তুমি দাদা আমার কথা শোন। তোমার মানে আর বাবুর মানে এক হবে কী? তুমি যেয়ে একবার দাঁড়ালেই পেনসেনের ব্যবস্থাটা হ'য়ে যায়। যেমন দেশের জন্য ক'রেছ—তেমন আখেরে পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে ব'সে খাও।

তিনু চাটুয্যের কথার উত্তর না দিয়া বাড়ী ফিরিলাম। বুঝিলাম রেণুকা ও গোবর্দ্ধন জমীদার বাড়ীতে ধর্ণা দিয়াছে।

২৪

পথ চলা শেষ হইয়াছে। দীর্ঘপথ বাকী আছে কিন্তু প্রথম জীবনের শিক্ষাগুরু খঞ্জ পণ্ডিতের মতই চলিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। কেমন করিয়া প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খাইয়া অবশেষে আশার রুদ্ধ দুয়ারে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গিয়াছি সে কাহিনীটুকু বলিয়া আমার দীর্ঘ জীবন ইতিহাস সমাপ্ত করিব।...

বহুদিন পরে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলাম। আমি যেন কোন স্বর্গ-

রাজ্যে বাস করিতেছি। আমি সেই শৈশবে ফিরিয়া আসিয়াছি। সারাদিন ছুটোপাটি করায় গুরুজনেরা যেন আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন। আমি তাহাদের তিরস্কারে কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছি। জীবনে কখনও কাঁদি নাই এই যেন প্রথম কাঁদিতেছি। মনোদির কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছি। হঠাৎ দেখি মনোদি মিলাইয়া গেল। মনোদির জায়গায় একটা খুব পরিচিত মুখ ভাসিয়া উঠিল—খুব চেনা অথচ যেন চিনিতে কষ্ট হইতেছে—ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া দেখিলাম বৌদির কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছি।

বৌদিকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম, অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিলাম তোমার কাছে কী ক'রে এলুম বৌদি—আমি ত হরিশপুরে—

বৌদি বলিল—হ্যাঁ হরিশপুরে তুমি অজ্ঞান হ'য়ে যাও। তারপর তোমাকে গোবর ঠাকুরপো কলকাতায় নিয়ে আসে। তোমাকে যে বাঁচাতে পারব এ স্বপ্নেও ভাবি নাই। ও—ঐ হাতটা সরিয়ে দিতে হবে? আচ্ছা দিচ্ছি। বাঁ অঙ্গটা তোমার একদম অবশ হয়ে গেছে ঠাকুরপো। ডাক্তার ব'লছে অনেকদিন পরে সারতে পারে, যদি খুব তদ্বির করা যায়। আচ্ছা কী হ'য়েছিল বল ত ঠাকুরপো—রেণুকা জলে ডুবতে গেল কেন?

কী যেন হইয়াছে. স্মরণ করিতে পারিতেছি না। বৌদির দিকে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া বলিলাম—কার কথা বলছ বৌদি—?

বৌদি বলিল—রেণুকা—মুক্তির মা—মুক্তি—?

স্মরণ হইতেছে। মুক্তি ও মুক্তির মা জলে ডুবিয়াছে—! মৃদুস্বরে বলিলাম—

সে বড় বিষাদময় কাহিনী বৌদি—রেণুকাকে বিয়ে ক'রে আমি বড় ভুল ক'রেছিলুম। ভবানীবাবুর মেয়ে সে—তার বাবা

জোর ক'রে রেণুকাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। বড় দুঃখী ছিল এই পরিবারে তিনটী মানুষ। তাদের দুঃখ মোচন করার ডাক এল। গোবর্দ্ধন আমার এই দুঃখ মোচনের ব্রতর কথা মনে পড়িয়ে দিলে। ভাবলুম জীবনে কারুর দুঃখ যখন ঘোচাতে পারি নি তবে যদি রেণুকার বাবা-মায়ের দুঃখু ঘোচাতে পারি তাই রেণুকাকে বিয়ে ক'রতে রাজী হ'য়েছিলুম। কিন্তু বৌদি একজনের দুঃখুও আমি ঘোচাতে পারলুম না। অভাবের অনটনের সঙ্গে ল'ড়ে ল'ড়ে সে আর পেরে উঠছিল না। তার অসুবিধার কথা সে কোনদিন মুখ ফুটে আমাকে ব'লত না। আমার অক্ষমতার খবর সে পেয়ে গিয়েছিল। গোবর্দ্ধন আমার বোঝা মাথা পেতে নিয়েছিল তাই এতদিন কোনরূপ চালিয়ে আসছিল তারা—কিন্তু আর দিন আমাদের চ'লছিল না। তাই গোবর্দ্ধন ও রেণুকাই যুক্তি ক'রে আমাকে গোপন ক'রে জমীদার ভট্টাচার্যের কাছে সরকারি সাহায্যের জন্য তদ্বির ক'রতে গেছল। এই খবর পেয়ে আমি রাগ ক'রে রেণুকাকে বাড়ীতে একপত্র লিখে রেখে ছটুর বাড়ীতে চ'লে যাই।

পরের দিন গোবর্দ্ধন আমাকে ছটুর বাড়ীতে এসে ফিরিয়ে নিয়ে গেল একরকম জোর ক'রে। পথে কোন কথাই সে বলে নাই। বাড়ী ফিরে এসে দেখি—রেণুকার ও মুক্তির মৃতদেহ খিড়কীর ঘাটে প'ড়ে র'য়েছে। সে কী হৃদয়বিদারক দৃশ্য বৌদি—মুক্তির হাতের মুঠির মধ্যে দুমুঠো পাঁক, অত্যন্ত শক্ত মুঠোয় সে ধ'রে আছে। মুক্তি আমার জলে ডুবে শেষ আশ্রয় খুঁজে অবশেষে দুইমুষ্টি মাটী হাতে নিয়ে পৃথিবীর বুক হ'তে বিদায় নিয়েছে। এদৃশ্য দেখে জ্ঞানহারা হ'য়ে যাই বৌদি—তারপর তোমার কাছে কী ক'রে এলুম তা ত বুঝতে পারছি না!

বৌদি বলিল—সে দুঃখের কথা আর বোলো না ঠাকুরপো খবরের

কাগজে তোমাদের এই দুর্ঘটনার খবর দেখে আমি পাগল হ'য়ে যাবার মত হই। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল—তোমাকে ক'লকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে। সেই খবর দেখে আমি সারা ক'লকাতায় হাসপাতালগুলো তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি—শেষকালে দেখি সুঁড়ো হাসপাতালে তুমি র'য়েছ। সে হাসপাতালে কী ভাল চিকিৎসা হয়, তাই আবার তোমাকে কলকাতার হাসপাতালে কটেজ ভাড়া নিয়ে রেখেছি। কী ক'রে যে আমার দিনরাত্ত কাটছে তা ভগবান জানেন। ভাগ্যিস তোমাকে সুঁড়ো হাসপাতালে সেদিন খুঁজে পেয়েছিলুম, দু একদিন পরে খুঁজে পেলে আর তোমাকে ফিরে পেতুম না। গোবর ঠাকুরপোর যেমন বুদ্ধি—শেষে সুঁড়ো হাসপাতালে এনে ফেলেছে—সেখানে কী ভাল চিকিৎসা হয় ঠাকুরপো ?

গোবর্দ্ধন পায়ের নীচে বসিয়াছিল লক্ষ্য করি নাই—সে বৌদির কথায় জবাব দিল—আমাদের পয়সা আছে কী যে বড বড় হাসপাতালে ভর্তি ক'রব ? না চেনাশোনা কোন বড় ডাক্তার আছে আমাদের, যে বড় বড় হাসপাতালে আমাদের ভর্তি ক'রবে। আমি বুঝি কসুর ক'রেছিনু। শেষকালে আমাকে একজন ব'ললে—"গরীবদের সুঁড়ো হাসপাতালে খুব যত্ন ক'রে দেখে—" তাই ত নিয়ে এলুম !

আমি বৌদির মুখের দিকে চাহিলাম—করুণায় ও মমতায় তাহার চক্ষু দুইটী যেন গলিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

আমি বলিলাম—বৌদি এই অবশ অঙ্গ নিয়ে আমার বেঁচে থাকায় লাভ কী ?

বৌদি হাসিয়া বলিল—সমস্ত সমাজটা একটা অঙ্গ অবশ নিয়ে দিব্বি চ'লছে আর তুমি পারবে না ঠাকুরপো ? ও অঙ্গ তোমাদের আজ নয় চিরদিনই এমনি দুর্বল ছিল, তবে ক্রমশঃ সেটা বাড়ছে এই যা।

আমি বৌদির কথায় তাৎপর্য বুঝিতে পারিলাম না। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার কথা বুঝিতে পারছি না বৌদি।

বৌদি আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—পাখী যে মুক্ত আকাশে ছন্দ রচনা করে, তা কী এমনি করে ঠাকুরপো? তার দুটি পাখায় ভর ক'রে তবে না সে মুক্ত আকাশে বিচরণ করে। একটী পক্ষ যদি তার দুর্বল হয় তবে কেমন ক'রে সে ছন্দ রচনা ক'রবে? দুর্বল পক্ষই তাকে নীচের দিকে টেনে আনবে। আমাদিকে বাদ দিয়ে যদি তোমরা মুক্তিকে উপভোগ ক'রতে যাও তোমাদেরও ঐ দশাই হবে। তাইত ছুটে এসেছি ঠাকুরপো তোমার ঐ দুর্বল অঙ্গের ভার নিতে। দেবে আমাকে সে অধিকার ঠাকুরপো?

আমি বৌদির কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বৌদির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বৌদি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটু উত্তেজিত হইয়া আবার বলিতে লাগিল—আমার কাছে যেতে তোমার ভয় হ'চ্ছে ঠাকুরপো? আমাদের কাছে তোমাদিকে যে আসতেই হবে। সমাজ দেহের অর্দ্ধেক অঙ্গ দুর্বল রেখে তোমরাও ঐ পাখীর মত মুক্তির আনন্দে উড়তে চেয়েছ। তা কী হয় ঠাকুর পো? ঐ দুর্বলপক্ষ বিহঙ্গমের মতই দুবল অঙ্গের জন্য সমগ্র সমাজকে নীচে নেমে আসতে হবে একদিন। মুক্তির আনন্দ মিথ্যে হয়ে যাবে ঠাকুরপো যতদিন না তোমরা দুর্বল অঙ্গকে সুস্থ সবল ক'রে তুলতে পার। একটা অঙ্গকে বাদ দিয়ে হবে না, একে সুস্থ করেই তবে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। এ তোমরা এড়িয়ে যেতে পার না ঠাকুর পো। আজ তুমি কলঙ্কের ভয়ে আমার কাছে আসতে ভয় পাচ্ছ—কিন্তু যে পথে তোমরা চ'লেছ যে পথে তোমাদের সমাজ, তোমাদের জাতি চলেছে এখন হ'তে যদি না ফেরে তবে সমগ্র

সমাজ আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে ঠাকুর পো। তাই বলছিলুম আমার কাছে যেতে কোন ভয় নাই তোমার। তুমি দেখতে পাচ্ছ না সমগ্র সমাজ আমাদের দিকেই ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এতে যদি দেশের লোক বাধা না দেয়, এই পথে এগিয়ে আসতে দেশের লোকের যদি কলঙ্কের ভয় না থাকে, তবে তোমার এত ভয় কেন ঠাকুর পো? তাদের যদি কলঙ্ক স্পর্শ না করে তবে তোমাকেও করবে না।

তোমাকে যে একদিন আমার কাছে আসতে হবে এ জেনেই ত জীবন রেখেছি ঠাকুরপো—বল যাবে আমার ওখানে?

আমি গোবর্দ্ধনের দিকে চাহিয়া বলিলাম—আর গোবরা—?

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল—তুই যে বেশ রে মাণকে! আমি একা হবিশপুর ফিরে গিয়ে খোকার বাবার সঙ্গে ফাইট্ দিতে পারি?—এ আর কেউ নয়রে ভাই—খোকার বাবা—।

গ্রন্থ সমাপ্ত

ছন্দহারা

(১ম পর্ব)

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

বিখ্যাত বামপন্থী নেতা **অধ্যক্ষ ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু**, এম. এ., পি. এইচ. ডি., পি. আর. এস., বলেন :—

আপনার "ছন্দহারা" পড়লাম। বইটা ভাব ও চিত্রের দিক দিয়ে অসামান্য। ছোট ছোট সাধারণ ঘটনা যা প্রত্যেকের জীবনেই আসে, উপেক্ষিত হ'য়ে চলে যায়, তাকে শিল্পী ও ভাবুকেব চোখ দিয়ে দেখা আমাদের সাহিত্যিক শ্রেণীর মধ্যে বিরল। সাধারণ জিনিষকে অপরূপ রূপ দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। সেদিক দিয়ে চার্বাক সার্থক।

* * *

বালক ও কিশোরদের মন আশ্চর্য্যভাবে ধরা পড়েছে। মনোদি ও কনক অন্তরে ছাপ মেরে রাখে! অতি সাধারণ দৈনন্দিনের মধ্যে থেকে তারা অসাধারণ।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসী) বলেন :—

বাংলা সাহিত্যে অনেক কথা ব্রিটিশ আমলে চাপা ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর সে সব কথা ক্রমশঃ গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কাব্যে খোলাখুলি স্থান পেতে আরম্ভ করেছে। লেখক বহু ঘাটে জল খাওয়া অভিজ্ঞ লোক। রাজরোষ ছাড়াও অপরাপর শক্তি ও ব্যক্তির রোষও তাঁর উপর পড়েছে। বেশ গুছিয়ে উপন্যাসের সূত্রে মালা গেঁথে তিনি সে সব কথা পাঠক মহলে উপস্থিত করেছেন। নূতন রকম এবং উপভোগ্য

বই। চার্বাক ঋণ করে ঘি খাওয়ার সমর্থন করে গেছেন। আমাদের এই চার্বাক ঋণ করেছেন মনে হয়, তবে ঘিটা বেশীর ভাগই অপরে খেয়েছে।

দৈনিক বসুমতী বলেন :—

নানা ঘটনার বৈচিত্রে ও ঘাত-প্রতিঘাতে উপন্যাসখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। লেখকের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা সুন্দর।

"দেশ" বলেন :—

এই উপন্যাসখানির লেখক চার্বাক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হইলেও তাঁহার রচনায় প্রচুর সম্ভাবনার পরিচয় আছে। অভিনিবেশ সহকারে উপন্যাস রচনার কৌশল আয়ত্ত. করিতে পারিলে চার্বাক বাংলা কথা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারিবেন বলিয়াই আশা করা যায়। বইখানির প্রথম পর্ব মাত্র পাঠ করিয়া ইহার অধিক মতামত প্রকাশ করিতে বিরত রহিলাম।

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন :—

চার্বাকের 'ছন্দহারা' পাঠকদিগকে রসাবিষ্ট করিবে! লেখকই এই উপন্যাসের নায়ক। শত ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জীবনের আশা ও আশাভঙ্গের কাহিনীগুলিকে লেখক অতি নিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

সংসারের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার বাসনা না রাখিয়া লেখক ব্যথা বেদনার মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছেন। সেই বেদনার সাক্ষীরূপে মনোদি' মণিকারা পথ প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। সৃষ্ট চরিত্রগুলির অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত পাঠক চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। তাহাদের জীবনের গতি প্রকৃতি ও পরিণতিকে কেন্দ্র করিয়া পাঠক সাধারণের কৌতূহল দৃষ্টি সর্বক্ষণ ঘুরিয়া বেড়ায়। তবে একটা বক্তব্য আছে। লেখকের সৃষ্ট

চরিত্রগুলির টাইপ একইরূপ না হইয়া যদি একটু স্বতন্ত্র হইত তাহা হইলে পরিপূর্ণ কৃতিত্বের দাবী করিতে পারিতেন।

যুগান্তর বলেন :—

জীবন যখন বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই চলিতে থাকে এবং একটানা ভাবেই চলিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়, তখন আকস্মিকভাবেই হয়ত' চলার পথে এমন ঘটনা ঘটিয়া যায়, যাহার ফলে হয় ছন্দপতন এবং জীবনটাই যায় বিপর্য্যস্ত হইয়া। ছন্দহারার কাহিনীতে এইরূপ একটা ব্যর্থ করুণ জীবনের ইতিহাস রূপায়িত করিয়াছেন গ্রন্থকার অতি নিপুণভাবে। নায়ক মণিমোহন ওরফে মাণিকের চলার পথে যাহারা ভিড় করিয়াছে তাহারা সকলেই স্বয়ং সম্পূর্ণরূপ লইয়া দেখা দিয়াছে। মনোদি', মণিকা, কানাইদার বৌ, গোবর্ধন প্রত্যেকটা চরিত্রই আমাদের অধিক পরিচিত। তাহাদের জীবনের করুণ কাহিনী যে ব্যথা ও বেদনা লইয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা পাঠক মহলের সহানুভূতি ও সমবেদনা জাগাইবে। চরিত্র চিত্রণে গ্রন্থকার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ছন্দহারা পাঠক-সমাজে আদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।